উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের
চিন্তা-চেতনার ধারা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ডক্টর ওয়াকিল আহমদ
পি-এইচ.ডি. (ঢাকা), ডি-লিট (কলিকাতা)



সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী

প্রকাশক সাহিত্য অকাদেমী
নিউ দিল্লী
মুদ্রক শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

প্রাপ্তিস্থান

বিশ্বভারতী গ্রন্থন-বিভাগ
৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা-১২

লেখকের নিবেদন

'বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যে রচনায় সমকালীন চিন্তার স্বরূপ' (১৮৫৭-১৯০৫) শিরোনামে একটি অভিসন্দর্ভ আমি ১৯৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিই। ১৯৮০ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ডি-লিট. ডিগ্রী প্রদান করে। সিপাহী বিদ্রোহ ও বঙ্গভঙ্গ এই দুটি রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রান্তসীমা হিসাবে ধরেছি, কেননা উভয় ঘটনা বাংলার মানুষের জীবনে গভীর রেখাপাত করে। প্রধানত: উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ আলোচনার লক্ষ্য হলেও ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষার কারণে ঐ শতকের প্রথম ভাগের সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ঘটনাসমূহ বারবার আলোচিত হয়েছে। এরূপ দৃশ্যপট মনে রেখে আমি মুদ্রণের সময় গ্রন্থের বর্তমান শিরোনামটি গ্রহণ করেছি। আশা করি, পাঠকগণ এটি উদারভাবে গ্রহণ করবেন।

যখন গ্রন্থখানির মুদ্রণ চলছিল তখন আমি বিদেশে চলে যাই। এজন্য প্রুফ দেখা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ পাঠকের চক্ষুকে পীড়া দেবে।

দুটি প্রেসে দুটি খণ্ডের মুদ্রণ কাজ একত্রে চলায় পৃষ্ঠার ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়নি। নির্ঘণ্টে তির্যক (/) চিহ্নের পরে দ্বিতীয় খণ্ডের পৃষ্ঠা-সংখ্যা সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে পাঠকের কিছু অসুবিধা হবে। এসব অসুবিধা ও ভুল-ত্রুটি পাঠক ক্ষমার চোখে দেখবেন, এই প্রার্থনা।

চতুর্থ অধ্যায়ে 'রাজনীতি' অংশটি নতুন সংযোজিত হল। গ্রন্থের সমস্ত পরিকল্পনা আমার নিজস্ব। সুতরাং এর যা কিছু দোষত্রুটি তার সবটাই আমার প্রাপ্য। বইখানি সমাজের সামান্য কাজে লাগলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

জনাব আলমগীর জলীলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহার করে আমি কিছু তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। কয়েকটি ছবি সংগ্রহে কবি আবদুল কাদির, জনাব বদিউস সালাম, আবু রশিদ মামুন, তরিকুল ইসলাম আমাকে সাহায্য করেছেন। দুষ্প্রাপ্য ছবিগুলির চিত্র গ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিপ্রোগ্রাফী অফিসার জনাব শামসুল হক এবং সহকারী অফিসার জনাব মিজানুর রহমান সাহায্য করেছেন। গ্রন্থের মুদ্রণের কাজে দীর্ঘকাল ধরে বাংলা একাডেমীর জনাব আবদুর রহমান অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

বাংলার লোক-সংস্কৃতি (পি-এইচ.ডি. থিসিস), ১৯৭৪

বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত, ১৯৭৫

বাংলা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান, ১৯৭০

মুসলিম বাংলায় বিদেশী পর্যটক, ১৯৬৮

সুলতান আমলে বাংলা সাহিত্য, ১৯৬৮

সূচীপত্র

চিত্রসূচী

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, ভাষা ও সাহিত্য, রাজনীতি

সমাজ

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলার মুসলমান সমাজ নানা ভাবদ্বন্দ্বে ও সমস্যা-সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছিল। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করলেও বিচিত্র চিন্তা, মত, বিশ্বাস ও স্বার্থ দ্বারা শ্রেণী, সম্প্রদায়, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইংরেজদের আগমনের ফলে এদেশে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল। এই আধুনিক যুগ যতখানি মনের জগতে ভাববিপ্লব এনেছিল, ততখানি সমাজবিপ্লব আনতে পারেনি। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো ভেঙে ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনীতি ব্যবস্থায় আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামো তৈরি হল। জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়নি, বরং 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' (১৭৯৩) ফলে বংশানুক্রমে জমিদারীস্বত্ব ভোগ করার অধিকার জন্মে। তবে প্রজার উপর জমিদারদের অবাধ কর্তৃত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পায়; সরকারী আইনের দ্বারা (যেমন ১৮৮৫ সালের বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন) ভূমিতে প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়। প্রথম দিকে গ্রামের ভূস্বামী ও শহরে বিত্তবান নিজেরাই সমাজপতি সেজে নেতৃত্ব দিতে থাকেন, কিন্তু কিছুকাল পরে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হলে সমাজের কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে চলে যায়। হিন্দু সমাজের এ ধারাটি খুবই স্পষ্ট: বনেদী ভূস্বামী, রাজা-মহারাজাদের পর নতুন জমিদার ও পুঁজিপতিরা প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' (১৮৩১) গঠন করে তাঁরা সংঘবদ্ধ হন।[১] সরকারের সাথে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই পরিবর্তিত রূপ 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১) জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় সরকারের গোচরীভূত করতেন, সরকারও এসোসিয়েশনের পরামর্শ নিতেন। তাঁরা চাঁদা তুলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছেন, প্রেস ও পত্রিকার পরিচালনা, সম্পাদনা অথবা ব্যয়ভার বহন করেছেন। থিয়েটারাদির প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরাই। ১৮৮৪ সালে 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' স্থাপিত হলে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। সভার বেশীর ভাগ নেতৃবৃন্দ উকিল-ব্যারিস্টার, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথম জাতীয় সভার মর্যাদা লাভ করে। তবে জমিদারদের ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়নি, সারা ব্রিটিশ আমল জমিদারী প্রথা চালু ছিল, কমবেশী জমিদারদের প্রতিপত্তিও বজায় ছিল। আমরা এটাকেই আধা-সামন্ত-

---

১ বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ, পৃঃ ২৪১

তান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার পর দীর্ঘদিন মুসলমানদের সামাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ ছিলেন না। ব্রিটিশ শাসন-নীতির ফলে বড় বড় বনেদী পরিবার ও ভূস্বামী ধ্বংস হয়ে যান, নতুন ভূস্বামী বা ব্যবসায়ী বিত্তবান আবির্ভূত হননি; চাকুরীর সুবিধা হারিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও দুর্বল হয়ে পড়ে; অনেকে বিত্তহীনের শ্রেণীভুক্ত হয়। কলিকাতায় গোটা তিনেক নবাব পরিবার ছিল, সেগুলির প্রধান আর্থিক উৎস ছিল সরকারপ্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তি। গার্ডেনরিচের মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার, টালিগঞ্জের মহী-শূরের রাজ পরিবার এবং মেটিয়াবুরুজের অযোধ্যার নবাব পরিবার সমাজের নেতৃত্ব দেননি। নবাবেরা বাঙালী ছিলেন না; বাংলার সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার মনোভাবও তাঁদের ছিল না, সর্বভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবোধও তখন গড়ে উঠেনি। তাঁরা বৃত্তির টাকায় প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ভোগ-বিলাসে জীবন-যাপন করেছেন। ঢাকার নবাব পরিবার ছিল উঠতি নব্য জমিদার; তাঁরা অর্থের জোরে সমাজে প্রভাব বিস্তার করলেও সমাজের হিতের জন্য বেশী কাজ করেননি। অন্যান্য মুসলমান জমিদার ছিলেন ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিক; তাঁদের সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে নজর ছিল না, বরং উড়ানোর দিকেই নজর ছিল। অতিরিক্ত অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার জন্য অনেকের জমিদারী ধ্বংস হয়ে যায়। যাঁরা নিজেরাই দায়িত্বশীল নন, তাঁরা সমাজকে জাগাবার দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। আর্থিক কারণে সাধারণ মানুষ না শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে, না ব্যবসায়বৃত্তিতে অংশ নিতে পেরেছে। ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেনি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কাল পর্যন্ত মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল এরূপই। তারপর কিছু কিছু লোক লেখাপড়া শিখে চাকুরীতে প্রবেশ করতে থাকেন; ছোটখাট ব্যবসায়ে কিছু লোক নিয়োজিত ছিলেন; এঁদের সমন্বয়ে ক্ষীণকায় নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে সমাজের দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে তিনি উঠতি মধ্যবিত্তের সাথে বেশী সংযোগ স্থাপন না করে, সামন্তশ্রেণীর অভিজাত পরিবারগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েন। যাঁদের 'ওল্ড এলিট' বা পুরানো বুদ্ধিজীবী বলে, তিনি তাঁদের সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যভুক্ত করেন। ফলে সোসাইটির কার্যকলাপে তাঁদের চিন্তা ও স্বার্থের প্রতিফলন হয়। সোসাইটিতে তাঁদেরই ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হয়। তাঁরা বৃহৎ বাংলার সাধারণ শ্রেণীর মানুষের ভালমন্দের কথা ভাবেননি।

সৈয়দ আমীর আলী 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র (১৮৭৮) মাধ্যমে মধ্যবিত্তের 'নিউ এলিট' বা নব্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করেন। মফস্বল শহরে শাখা-এসোসিয়েশন খুলে এর কার্যক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হয়। এসোসিয়েশনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ আনুগত্য মেনে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দাবী এসোসিয়েশন প্রথম উত্থাপন করে। 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬) আসার আগে পর্যন্ত সোসাইটি ও এসোসিয়েশন সমাজের যেটুকু করার করেছে। বলতে গেলে, উনিশ শতক পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও উঠতি মধ্যবিত্তের মিশ্র নেতৃত্ব ছিল ; কোন কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাঁদের যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যেমন স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপন, প্রেস ও পত্রিকা পরিচালনা, সভা-সমিতি গঠন ইত্যাদি। নতুন যুগের নতুন চেতনা ও উপলব্ধির সংঘাতে পুরাতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সামাজিক সংকট ও দ্বন্দ্বগুলি কি, সে-সব নিরূপণ করা এবং সে-সবের সুষ্ঠু সমাধান দেওয়া নব্যপন্থীদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এই দায়িত্ব পালনের সাফল্যের উপরে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি নির্ভর করে। মুসলমান সমাজের কতক রীতিনীতি শাস্ত্র-সম্মত নয়, কতক প্রথা-পদ্ধতি যুগোপযোগী নয়—এই প্রশ্ন উঠেছে, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছে। সমাজের বর্তমান দুর্গতির কথা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনোভাব ও আচরণের কথা আলোচিত হয়েছে। সমাজের অবনতি ও বৈষম্য দূর করে কিভাবে সমাজের উন্নতি সাধন করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সমাজ-সংস্কার ও সমাজোন্নয়নের প্রয়াস থেকেই জেগে উঠেছে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'।

শ্রেণীভেদ

ইসলাম সাম্যবাদ ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতি প্রচার করলেও ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ পুরোপুরি সে শাস্ত্রনির্দেশ মেনে চলেনি। সমাজের রীতিনীতিতে কিছু কিছু দেশাচার থেকেই যায়। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দেশাচার শাস্ত্রাচার থেকেও প্রাধান্য পায়। সমাজে প্রচলিত 'আশরাফ' ও 'আতরাফ' এই ভেদনীতি দূরীভূত হয়নি। সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান—এই চার শ্রেণীর মানুষ নিজেদের উচ্চ বংশজাত বলে মনে করতেন। তাঁরাই হলেন 'আশরাফ' বা অভিজাত শ্রেণী। এর বাইরে যারা আছে, তারা 'আতরাফ' বা অনভিজাত এবং 'আজলাফ' বা ছোটজাত শ্রেণী। সাধারণতঃ ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর ভারতীয়

মুসলমানদের এ-শ্রেণীভুক্ত করা হয়।[১] উভয় শ্রেণীর সম্পর্কে আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল; সামাজিক লেনদেন দূরের কথা, স্বাভাবিক মেলামেশাও ছিল না। বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চা শরীফশ্রেণীর মধ্যে ছিল; আতরাফ শ্রেণীর লোকেরা কায়িকশ্রমে কালাতিপাত করত, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না। সুতরাং ব্যবধান বেড়ে উভয়ের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক দাঁড়ায়। আবার আশরাফ শ্রেণীর মধ্যেও কৌলীন্যভেদ ছিল; তাঁরা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বাছবিচার করতেন এবং মেলামেশায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের যা দোষত্রুটি (অস্পৃশ্যতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বঞ্চনা ইত্যাদি) তা ঐ শ্রেণীভেদেও প্রকটিত হয়েছে। মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল সমাজের ব্যাধি স্বরূপ। নবমূল্যায়নের সময় মুসলমান সমাজে জাতিভেদের নিন্দা করা হয়। সংস্কারকগণ একে শরিয়ত বিরোধী প্রথা বলে চিহ্নিত করেন এবং একটা কৃত্রিম বেড়া রচনা করে সমাজের গতি রুদ্ধ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা এ প্রথার বিলোপ কামনা করেছেন।

ইসলাম-প্রচারকে 'সমাজ কালিমা' নামে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, "কালক্রমে মুসলমানদিগের মধ্যেও জাত্যাভিমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ...ভারতীয় মুসলমানগণ হিন্দুদের নিকট হইতে অনেক আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'কুলীন' আছেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ 'শরীফ' আছেন। আজকাল বঙ্গদেশের অনেক স্থলে এইরূপ শরীফদিগের অন্যায় ব্যবহার চরমে উঠিয়াছে। ...এই সকল হীনচেতা শরীফ মহোদয়গণ মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, নীচ শ্রেণীর মধ্যে কন্যার বিবাহ দিতে বা কৃষক শ্রেণীর লোকের কন্যা গ্রহণ করিবার সময় 'বিবাহের পণ' দাবী করিয়া বসেন। ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হইতে দুশ-পাঁচশ বা হাজার টাকা পর্যন্ত একটি মেয়ে বা ছেলের দর হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসায় মুসলমান ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।"[২] বিশ শতকের দুই দশকে ঐ একই অভিযোগ করেছেন মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী। তিনি আল-এসলামে 'সমাজ-সংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন, "শরিফ রজিল বা আশরাফ আতরাফের পার্থক্য বঙ্গদেশীয় মোসলমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল। পূর্ববঙ্গের মধ্যে চট্টগ্রামে কেবল মাত্র বরাতের মজলিসে শরিফ বেশরিফ বলিয়া পার্থক্য করা হয়, এমন কি আসন

১ প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে

২ ইসলাম-প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

গ্রহণের মতভেদ ও উচ্চ নীচ আসনের তারতম্য হেতু সময় সময় ২।১ দিন কেবল তর্ক বিতর্কেই কাটিয়া যায়। স্থান বিশেষে এই আসন গ্রহণের তর্কে আহার করাও হয় না, পরন্তু বিবাহ পর্যন্ত পণ্ড হইয়া যায়।...পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের অংশ বিশেষে শরাফতের দাবীদাওয়াটা খুব বেশী। তত্রত্য তথাকথিত শরিফগণ অশরিফগণকে কুকুর, শৃগাল হইতেও অধম বলিয়া জ্ঞান করে। ...উত্তর বঙ্গে 'বাদিয়া' 'নিকারী' ও আসামে 'মাটিয়া' উপাধি বিশিষ্ট মোসলমানগণ এক সঙ্গে অন্য মোসলমানের সহিত আহার করা দূরে থাকুক, এক মসজিদে, এক ঈদগাহ বা মাঠে নমাজ পড়িতেও পারে না। সালাম আদান-প্রদানের অধিকারীও নহে।...মধ্যবঙ্গে নদীয়া, ২৪ পরগণা অঞ্চলে কোন নীচ জাতীয় হিন্দু মোসলমান হইলে তাহাকে সমাজে নেওয়া হয় না, জুমা জামাতে শরিক করা হয় না।"[১] মীর মশাররফ হোসেন পিতামহের আমলে সমাজে প্রচলিত শ্রেণীভেদের উল্লেখ করে বলেছেন, "...সে সময় উঠা বসা খাদ্য খাওয়া সম্বন্ধে বড়ই বাদ-বিচার ছিল। জাতীয় গৌরব, বংশ মর্যাদা ঘরাণার গৌরব---বড়ই কঠিনভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল।"[২] মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জাম হোসেন বৃদ্ধ বয়সে জোলা শ্রেণীভুক্ত এক 'মলঙ্গ ফকীরে'র বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন, মেয়ে ছোট জাতের বলে মীর পরিবারে অশান্তি ও মনোমালিন্য দেখা দেয়। জাতবিচার ও অসম বিবাহ সম্পর্কে সেকালের লোকের মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মশাররফ হোসেন লিখেছেন, "স্বসমাজ ভিন্ন অসমাজে বিবাহ হওয়া সে সময় বড়ই দোষের কথা ছিল। যদি এরূপ ঘটনা কার্যে দাঁড়াইত, তাহা হইলে সে---যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর সঙ্গে আহার বসা উঠা করিতে হইত। উচ্চ সমাজে কখনই মিশিতেও পারিত না। কেহ মিশিতেও ইচ্ছা করিত না।"[৩] আশরাফ-আতরাফ ভেদজ্ঞান সমাজ জীবনে কিরূপ ক্ষতির কারণ হয়েছে তার উপর আলোকপাত করে জনৈক প্রবন্ধকার লিখেছেন, "বাঙ্গালার মুসলমানের অধঃপতনের যতগুলি কারণ আছে, তার মধ্যে 'আশরাফ-আতরাফ'কে একটা প্রধানতম কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই 'আশরাফ-আতরাফ' প্রভেদ জ্ঞান ঘুণধরা বাঁশের মতই সমাজকে ভিতরে ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র করিয়া চলিয়াছে, আর তার পরিণাম ফলে সমাজ ছত্রভঙ্গ

---

১ আল-এসলাম, অগ্রহায়ণ ১৩২৬

২ আমার জীবনী, পৃঃ ১৫

৩ ঐ, পৃঃ ৪৮

হইয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশের 'আশরাফ' মনে করে যে, নিজে মেহনত করিয়া উপার্জন করাটাই একটা হেয় কাজ। 'আশরাফ' নামধারী এই সমস্ত জীব এই ভেদনীতির সৃষ্টি করিয়া শুধু ইসলামকেই হেয় করিয়াছে তাহা নহে তাহারা খোদার আদেশকে ও হজরতের আদর্শকেও খর্ব করিতে ছাড়ে নাই।"[১] এখানে শ্রেণীভেদ প্রথাকে 'সমাজের কালিমা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা প্রতিকারের স্বরও উঠেছে। ইসলামে মানুষের সম মর্যাদার স্বীকৃতি আছে; এজন্য তাঁরা ধর্মকে সহজেই ব্যবহার করতে পেরেছেন।

পর্দা ও অবরোধ প্রথা

পর্দা ও অবরোধ প্রথা সমাজে নারীমুক্তির ও উন্নতির অন্তরায় এরূপ চেতনা থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়।[২] আন্দোলনের অগ্রদূতী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাননি, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষিত ভ্রাতার কাছে আধুনিক শিক্ষার স্বাদ পান। তারপর নিজ চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করেন। ভাগলপুর নিবাসী সাখাওয়াত হোসেনের (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) সহধর্মিনী হিসাবে স্বামীর সহায়তায় তাঁর জ্ঞানচর্চা প্রসারিত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা দূরের কথা, গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা শিক্ষা করার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী করিমুন্নেসা চৌধুরানী সমাজের পক্ষ থেকে কিরূপ বাধা পেয়েছিলেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বিবাহিত জীবনে অবরোধ প্রথার নিষ্ঠুর রূপটি উপলব্ধি করেন। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী অন্তঃপুরে ধর্মের নামে প্রায় বন্দীদশায় বাস করেন। বেগম রোকেয়া এটাকে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া অবিচার বলেছেন। নারী বাইরের মুক্ত আলো-বাতাসে চলাফেরা করতে পারেন না বলে শারীরিক দিক থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হন, আবার মানসিক দিক থেকে পরিণতি লাভ করতে পারেন না। তাঁরা পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল হয়ে জীবনপাত করেন। তিনি দেখলেন,

১ এ. এম. তোরাব আলী—আশরাফ-আতরাফ, সওগাত, শ্রাবণ ১৩৩৫

২ পর্দা প্রথা ও অবরোধ প্রথা এক শ্রেণীর নয়: যথাবিধি পর্দা বা বোরখা পরিধান করে নারী বাইরের সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন; অবরোধ প্রথার কঠোর নিয়ম—নারী কোন অবস্থাতে পুরুষ সমাজের মধ্যে বা বহির্জগতে আসতে পারেন না; অসূর্যম্পশ্যা নারীর মতই তিনি গৃহে আজীবন বন্দিনী থাকেন।

স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে সমাজে নারীরও করণীয় আছে। নারী ন্যায্য অধিকার পেলে চিন্তাশক্তি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সমাজের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সমাজপতিদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সেযুগের পত্র-পত্রিকায় অনেক মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর 'মতিচূর' (১খণ্ড ১৯০৪) প্রবন্ধ গ্রন্থে এরই সাক্ষর আছে। পর্দা ও অবরোধ প্রথা দূর করে নারীমুক্তি আনতে হলে প্রথম দরকার নারীর আধুনিক শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে নারী-ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। শিক্ষা এবং তার সঙ্গে বাইরে কাজ করার সুযোগ পেলে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসবে। তিনি 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে নারীমুক্তির অন্যতম উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। কলিকাতায় 'সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১) তাঁর উদ্যোগ ও উৎসাহের ফল। নারীশিক্ষা ও মুক্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি সমাজের চক্ষে নিন্দার ভাগী হয়েছেন। তাঁর লেখার প্রতিবাদ হয়েছে। তিনি নবনূরে 'আমাদের অবনতি' নামে প্রবন্ধ লিখেন: বর্তমান সমাজে নারীর স্থান 'দাসী-তুল্য' বলে অভিযোগ ও অনুশোচনা করেছেন। তিনি নারী সমাজকে জেগে উঠার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "প্রথমে জাগিয়ে উঠা সহজ নহে, সমাজ গোলমাল বাধাইবে,...ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল'-এর বিধান দিবেন,...কিন্তু সমাজের কল্যাণ নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।"[১] তিনি নবনূরে 'বোরখা', 'অর্ধাঙ্গী' প্রভৃতি প্রবন্ধে লেখেন যেখানে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ আছে। তিনি বোরখা প্রবন্ধে কৃত্রিম পর্দার নবীকরণ চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠনসহ মাঠে ময়দানে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই।"[২] তাঁর লেখা নিয়ে সমাজে প্রতিক্রিয়া হয়। এস. এ. আল মুসভী 'অবনতি প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেন, "নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না—তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচারণ করা হইবে।"[৩] নওশের আলী খান ইউসফজয়ী 'একেই কি বলে অবনতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলেন, "আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"[৪] 'মিহির ও সুধাকরে' জনৈক লেখক উক্ত প্রবন্ধের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন, "তিনি উচ্চ শিক্ষার

১ নবনূর, ভাদ্র ১৩১১
২ ঐ, বৈশাখ ১৩১১, পৃঃ ১৯
৩ ঐ, আশ্বিন ১৩১১
৪ ঐ, কার্তিক ১৩১১

ফলে সনাতন মুসলমান ধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে যেরূপ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে ধর্মই একেবারে ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। তিনি ধর্মগ্রন্থগুলিকে মনুষ্য রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।...তিনি যদি তাঁহার মত অভ্রান্ত মনে করেন, তবে জানিলাম তাঁহার দ্বারা এ পোড়া সমাজের বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত হইবার আশা নাই।...আমি বলি, যে শিক্ষার ধর্মের প্রতি অনাস্থা জন্মে ও তাহার বন্ধন শিথিল করে, তাহার প্রচলন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"[১]

ইসলাম-প্রচারকে 'অবরোধ-প্রথা' নিয়ে সম্ভবতঃ প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'অতীত কাহিনী' নামে একটি কবিতা ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশ করেন। ঐ কবিতার ৩০ স্তবকের পাদটীকায় কবি মন্তব্য করেন "ভারতবর্ষে নানা জাতীয় বিধর্মীর বাস এবং স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা, পুরুষগণও চরিত্রবিষয়ে মুসলমানোচিত নহে, তদ্ব্যতীত সর্বত্রই পাপদৃশ্য, কুৎসিত বাক্য, অশ্লীল সঙ্গীত, কুলটা লম্পট যুগের সাতিশয় আবির্ভাব। অধিকন্তু পরিচ্ছেদ-আদিও মুসলমান সভ্যতানুযায়ী নহে। এজন্য পর্দার একান্ত আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়।"[২] পত্রিকার সম্পাদক কবির সহিত একমত হতে না পেরে 'অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন' আছে বলে মন্তব্য করেন।[৩]

শ্যামাসুন্দরী দেবী 'সাবিত্রী প্রবন্ধাবলী'তে 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করলে ইসলাম-প্রচারকে তার প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখা হয়। শ্যামাসুন্দরী দেবী তাঁর প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথাকে 'কারাবাসে'র সাথে তুলনা করেন। আলাউদ্দীন আহমদ 'ইসলাম দর্শন' প্রবন্ধে এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, "পরদার ব্যবস্থা কেবল এই অভিপ্রায়ে নহে যে, পবিত্রতা ও শুদ্ধচারিতা স্থাপিত হয়, বরং বংশগত মর্যাদা এবং গৃহকার্যের শৃঙ্খলা ইত্যাদি যাহা কেবল স্ত্রীলোকদের হস্তে ন্যস্ত থাকে ; তাহা তাহাদের গৃহে থাকায়, সাধিত হয়, ইহাও পরদার অন্যতম উদ্দেশ্য।...এমন সুন্দর ও প্রশংসনীয় অবরোধ প্রথাকে কারাবাসের সহিত তুলনা করা সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা....স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষা বলিয়া যে চীৎকার করা হইতেছে এবং অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে নানা কথা প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাকে পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?"[৪]

১ মিহির ও সুধাকর, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃঃ ৪-৫

২ ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০০, পৃঃ ৩৩

৩ ঐ, পৃঃ ৩৩

৪ ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩, পৃঃ ৬৮

১৯০৩ সালে দিল্লীতে 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা সুলতান মোহাম্মদ আগা খান সভাপতির ভাষণে পর্দা-প্রথা সমাজের পক্ষে 'অতিশয় অনিষ্টজনক' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদে মোহাম্মদ করম চাঁদ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর প্রবন্ধের নাম 'হেজাবয়োসা বা মোসলেম রমণীর পর্দা'। তিনি পর্দার সপক্ষে ঐ প্রবন্ধে বলেন, "হজরত মোহাম্মদের সময়ে, ইসলামানুমোদিত যেরূপ সরল ও তাঁহার উদার ভাবের অবরোধ প্রথা (হেজাবের) প্রচলন ছিল, বর্তমান যুগে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন ধরনের পর্দার যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ একণে ধর্ম ও নীতিবিবর্জিত নাস্তিক ভাবের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় সমাজবন্ধনও ক্রমান্বয়ে শিথিল হইয়া যাইতেছে।"[১] মোহাম্মদ করম চাঁদের প্রবন্ধের সমর্থনে পত্রিকার সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ লেখেন, "ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে পর্দার যে অতিরিক্ত বাঁধুনীটুকু আছে, যেটুকু না থাকিলে বর্তমান সময়ে এ বিধর্মী প্লাবিত দেশে, নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আনলে, মুসলমানদিগের ধর্ম ও সুনীতি রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার...সকল দেখিয়া শুনিয়া সকল বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা ভারতীয় মুসলমানদিগের বর্তমান অবরোধ প্রথার সমর্থন করিতেছি।"[২] এস. এ. আল মুসভী, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, আলাউদ্দীন আহমদ, করম চাঁদ এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ পর্দা প্রথা ও অবরোধ প্রথার সপক্ষে মত দিয়েছেন; যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ-বন্ধন অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁরা ঐ মত দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল রক্ষণশীল। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে শ্যামাসুন্দরী দেবীর অভিমত নব্যশিক্ষিত কাজী ইমদাদুল হকও সমর্থন করেননি। তিনি 'হিন্দু নারীর মুসলমান ঘৃণা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলেন, "স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিতে গেলে শুধু রাস্তায় বাহির হইয়া পাউডার বিলেপিত মুখশ্রী এবং আঁটসাঁট অঙ্গরাখা দ্বারা কঠিনরূপে আবদ্ধ দেহযষ্টির ভঙ্গিমা দেখাইয়া বেড়ানই যে স্বাধীনতা কোন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি একথা মনেও করিবেন না।"[৩] অবরোধ প্রথা লোপ তথা স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ বিশ দশক পর্যন্ত চলেছিল। ত্রিশ দশকের কাছাকাছি সময়ে 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' পুরুষ লেখকগণ প্রথম পর্দাপ্রথা ও অবরোধ প্রথার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৪]

---

১ ইসলাম-প্রচারক, ৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১৩১৪

২ ঐ, ৮বর্ষ ১০ সংখ্যা ১৩১৪

৩ নবনূর, বৈশাখ ১৩১০

৪ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৯১, ৯৩

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা ও বাঁদী প্রথা

পর্দা ও অবরোধ প্রথার মত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা, বাঁদী প্রথা ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক সমস্যা। সতীদাহ রোধ বা বিধবাবিবাহ প্রচলন, গৌরীদান প্রথা ও কুলীনপ্রথার সংস্কার বিষয়ে হিন্দু সমাজকে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ, বাল্য-বিবাহ কোন ধর্মগত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত ছিল না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চারটি পর্যন্ত বিবাহ করা যায় বলে ইসলামে বিধান আছে।[১] ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা না দিয়ে কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারেন না। সাবালক অর্থাৎ যৌবনপ্রাপ্ত হলে ছেলে-মেয়ে বিবাহের যোগ্য পাত্র-পাত্রী বিবেচিত হয়। বন্ধ্যাত্ব, সৌন্দর্যহীনতা, চরিত্রহীনতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, উন্মাদগ্রস্ততা বা অন্য কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে যে-কোন পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এটি 'তালাকপ্রথা' নামে পরিচিত। বিবাহের এসব নিয়মকানুন সম্বন্ধে ব্যবহারশাস্ত্রে পরিষ্কার নির্দেশ থাকলেও বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে শাস্ত্রবিরোধী কিছু রীতিনীতি পালিত হয়, যেগুলিকে দেশাচার বলা যায়। বহুবিবাহ ও তালাকপ্রথার কঠোর নির্দেশ যথাযথ পালন না করে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সংস্কার ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুসলমান সমাজে এসেছে। মুসলমান সমাজের পক্ষে এগুলি একান্তভাবে কৃত্রিম সমস্যা ছিল, তথাপি এসব বিধিনিষেধ সমাজ জীবনে কালো ছায়া ফেলেছিল। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বক্তব্য তুলে ধরেন মুনশী মেহেরুল্লা। 'বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' (১৮৯৪) গ্রন্থে তিনি কয়েকজন বিধবা নারীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বৈধব্য জীবনের প্রতি ধিক্কার লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার চিত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের অভিশপ্ত এই রীতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার অনেক মুসলমান

১ পবিত্র কোরানে সূরা নেসার ২য় আয়াতে আছে, "তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পানি গ্রহণ করিতে পার ; পরন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে।" ঐ সূরায় আরও বলা হয়েছে, "সকলের সহিত সমান ব্যবহার কর এবং কথোপকথনকালে সকলের সহিত সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিত।"
ইসলাম-প্রচারক, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩, পৃঃ ২৭৭-৭৮

গৃহে বিধবাবিবাহ দেওয়া হয় না। বিধবাবিবাহ না হওয়ায় সমাজে ব্যভিচার বাড়ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন ঐ গ্রন্থে।[১] মোহাম্মদ কফিলউদ্দীন আহমদ 'তারাবতী-মনোহর' (১৮৯৬) উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহের সমস্যার কথা বলেন। তিনি উভয় সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে মত দিয়েছেন। মুনশী মেহেরুল্লাকে অনুসরণ করে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কোহিনুরে 'মোসলেম সমাজ সংস্কার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এতে তিনি মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ দৃঢ়ভাবে শিকড় বিস্তার করেছে, সে-বিষয়ে ইঙ্গিত করেন।[২] তিনি লিখেছেন, "ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থা-নুসারে 'বিধবাবিবাহ' একটি গুরুতর কর্তব্য কার্য। আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ স্বয়ং বিধবাবিবাহ করিয়া স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।...পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, কলিকাতার পশ্চিম প্রান্ত প্রবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিমতট হইতে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের অনেক স্থানেই মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। বাংলা দেশের মধ্যে বর্ধমান বিভাগস্থ কয়েকটি জেলাতেই উপরোক্তরূপ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ঘৃণিত নিয়ম দৃঢ়রূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দেশাচার এমন একটি জিনিস যে, সহজে ইহার সুদৃঢ় প্রাকার ভগ্ন করা যায় না। এই হিন্দু প্রথাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, অনেকে বিধবাবিবাহ দেওয়া বা বিধবাকে বিবাহ করা নিতান্ত অবজ্ঞাজনক কার্য মনে করেন।"[৩] তিনি আরও বলেন যে পাঞ্জাব প্রদেশের 'জীবন্ত মুসলমানগণ' সভার আয়োজন করে ঐ প্রথার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

শেখ জমিরুদ্দীন ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী-জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' নামে একটি প্রবন্ধে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে আলোক-পাত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, "সুবিশাল বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। এই তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় দশ পনের লক্ষ মুসলমানের কেহ

১ মোহাম্মদ মেহেরুল্লা—বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার, যশোহর, ১৩৭৫ (৭সং), পৃঃ ৶৹।

২ ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় বাংলার মুসলিম পরিবারে ৪ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত বিধবার সংখ্যা ছিল ১৭,২১,৩৯০।
Census Report of India, 1891, Vol. IV. (The Lower Province of Bengal), **p. 178**

৩ কোহিনূর, আষাঢ় ১৩০৫, পৃঃ ২৬-২৭
উল্লেখযোগ্য যে, হজরত মহম্মদের ১৩ জন স্ত্রীর মধ্যে কেবল আয়েষার কুমারী অবস্থায় বিবাহ হয়, অন্যরা সবাই বিধবা ছিলেন।

দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার বিবাহ করিয়া একজনকে বিবি ও অপরকে তাহার বাঁদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে। কত সময়ে কত সরলা, অবলা বালা, কুলমহিলা নির্মম, অত্যাচারী পাষণ্ড স্বামীর অসহনীয় যাতনা ও কুলকলঙ্কিনী নরপিশাচিনী সতীনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ হলাহল পান, কেহ গলে রজ্জু, কেহ বা আফিং সেবন, কেহ বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ বিসর্জন দিতেছে। ...বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ যে বহু বিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা কেবল রিপু পূজার জন্য কেবল কামপ্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য। ...বর্তমান বহুবিবাহে রাজনৈতিক উপকার কিছুই নাই...দিন দিন ব্যয়াধিক্য বশতঃ দীনহীন কাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হইতেছে। তাহারা অর্থাভাবে মূর্খ ও অসভ্য হইয়া সমাজের ঘোর পতন সাধন করিতেছে, তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম কলঙ্কিত হইতেছে।"[১]

কাজী ইমদাদুল হক নবনূরে 'বহুবিবাহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি বহুবিবাহ যে বাঁদীপ্রথার নামান্তর সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেন। তিনি লিখেছেন, "সাধারণ (মুসলমান) সমাজে যে অদ্যাপি বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তি শাস্ত্রবিধান নহে। শাস্ত্রবিধান সমূহের বিকৃত অর্থকারী একদল স্বার্থপর পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত ধর্মের নামে সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া বহুকালাবধি আপন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া আসিতেছেন।...আমাদের সমাজে যে বাঁদী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাঁহাদেরই সৃষ্টি, এবং যে বহু বিবাহের অযথা প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও তাঁহাদের স্বার্থ সমুদ্ভূত।... ইউরোপের অনুকরণে এক-বিবাহ প্রথা কঠোর অনুশাসনের দ্বারা আমাদের সমাজে বিধিবদ্ধ না করিলে আমাদের আর উদ্ধারের আশা নাই।"[২] 'তালাক-প্রথা'র অপব্যবহার করে সমাজে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়, সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোহাম্মদ করম চাঁদ লেখেন, "আধুনিক মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী এক প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিলেও হয়।... অধিকাংশ স্থলেই ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত এইরূপ কুরীতি অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয় এই সকল ঘৃণিত ঘটনা অধিক পরিমাণে নিম্নশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত অশিক্ষিত বা অজ্ঞ মুসলমানদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। ...কিন্তু এরূপ কুরীতি যে ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ বা কোরান, হাদিস ও ফেকা

১ ইসলাম-প্রচারক, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩, পৃঃ ১৮১-৮৫

২ নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১২, পৃঃ ৩৪২-৪৩

শাস্ত্র বহির্ভূত, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।"[১] 'বাল্যবিবাহের' কুফল ছিল অধিক। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে এ রীতির প্রচলন ছিল। সমাজে নানা ভাবে এর কুফল ফলত। কলিকাতায় 'হরিমোহন-ফুলমণি' নবদম্পতির একটি ঘটনা ঘটে, অপরিণত বয়সে বিবাহ ও স্বামী সহবাসের ফলে ফুলমণির মৃত্যু হয়। ঘটনাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্যার এণ্ড্রু স্কোবল সরকারের পক্ষ থেকে 'এজ অব কনসেন্ট এ্যাকট' বা 'সহবাস-সম্মতি আইন' প্রথমে বিল-আকারে উত্থাপন করেন (জানুয়ারী ১৮৯১), পরে এটি আইনে পরিণত হয় (মার্চ ১৮৯১)। এতে ১২ বছরের পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী সহবাস করলে ধর্ষণের অভিযোগে দণ্ডিত হবে। হিন্দু-মুসলমান উভয় ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য ছিল। কলিকাতায় এর প্রতিক্রিয়া কম হয়, কিন্তু ঢাকায় এর বিরুদ্ধে বেশ আন্দোলন হয়। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আর 'ঢাকা প্রকাশ' তাঁর মত প্রচারের বাহন হয়। তিনি একাধিক সভা করে সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি মৌলভী-মোল্লাদেরও সমর্থন লাভ করেন। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল: উক্ত আইনের ফলে নারীর পর্দানশীলতা ও মান-সম্ভ্রমের হানি হবে। শত্রুভাবাপন্ন লোকেরা আইনের আশ্রয় নিয়ে অত্যাচার ও অপদস্থ করার সুযোগ পাবে।[২]

সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেহেরুল্লা 'বাল্যবিবাহের বিষময় ফল' (১৯০৯) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাল্যবিবাহের বিষময় পরিণতির কথা উল্লেখ করে ঐ প্রথার অবসান কামনা করেছেন।

মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে 'দাসী-বাঁদী'র উল্লেখ করেছেন; বাল্যকালে তিনি নিজ পরিবারে ত্রিশ-বত্রিশ জন দাসী-বাঁদী দেখেছেন, যাদের অনেককে রংপুর থেকে ক্রয় করে আনা হয়েছিল। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দাসী-বাঁদীর ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। অনেক সময় বাঁদীরা গৃহস্বামীর উপপত্নী রূপে ব্যবহৃত হত। বাঁদী-পুত্র 'গোলাম' বা গৃহভৃত্যের কাজ করত।[৩]

১ মোহাম্মদ কে. চাঁদ—তালাক বা মোসলেম স্ত্রী বর্জন, ইসলাম-প্রচারক, ৮বর্ষ ১২ সংখ্যা, ১৩১৪

২ পরবর্তীকালে ত্রিশ দশক পর্যন্ত এ নিয়ে বাদবিতণ্ডা চলে। 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা' কর্তৃক ১ এপ্রিল ১৯৩০ 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' পাশ হয়। ছেলের ১৮ বছর ও মেয়ের ১৪ বছরের কমে বিবাহ দিলে আইনতঃ দণ্ডণীয় হবে বলে ঐ আইনে ঘোষণা করা হয়। এটি 'সারদার সর্দা আইন' নামে খ্যাত।

৩ মীর মোশাররফের গদ্য রচনা, পৃঃ ১৫৭-৫৮

পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের 'বান্দীপ্রথা'র নিন্দা করেছেন।[১] আফতাবউদ্দীন আহমদ বলেছেন যে, বান্দীপ্রথা শাস্ত্রানুমোদিত কোন রীতি নয়, ধনীরা নিজগৃহে অসংখ্য দাসদাসী রাখেন, এটি তারই ফল।[২]

সমাজের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় চিন্তা

পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমানরা শাসক শ্রেণী থেকে শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। রাজনীতির সহিত যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের পতন সঙ্গে সঙ্গেই হয়, যেমন নবাব, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর লোক ইত্যাদি। সাধারণ কর্মচারী, জমিদার, নিষ্কর সম্পত্তির মালিকগণ এবং শিক্ষিত শ্রেণীর পতন ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন হয়। সূর্যাস্ত আইন, পাঁচশালা-দশশালা আইন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি রাজস্ব নীতির ফলে বনেদী মুসলমানরা জমিদারী হারাতে থাকেন, নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনের ফলে ছোটখাট অসংখ্য ধর্মসেবক ও বুদ্ধিজীবীর আয়ের উৎস বন্ধ হয়। রাজভাষা হিসাবে ফারসী রহিত হয়ে ইংরাজীর প্রচলন হলে রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষা বিভাগে যাঁরা কর্মরত ছিলেন, তাঁদের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে। কলিকাতা শহরের নব্য বিত্তবানরা জমিদারী কিনে ভূস্বামী হন এবং ইংরেজী শিক্ষিত শ্রেণী সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করে আমলাশ্রেণী গড়ে তোলেন। উভয় ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুগণ সুবিধা করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও তাঁদের প্রাধান্য বজায় থাকে। ক্ষেত-খামারে চাষবাস ও অন্যান্য কায়িকশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন ছাড়া মুসলমানদের আর উপায় ছিল না। অর্থাৎ তারা বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। বণিক শাসনের প্রথম একশো বছরের মধ্যে একাজটি সম্পন্ন হয়। উইলিয়ম উইলসন হান্টার এরূপ অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করেই 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' (১৮৭১) গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে, একশো বছর আগে কোন মুসলমান ভদ্র পরিবার দরিদ্র ছিল একথা ভাবা যেত না, এখন তার ধনী হিসাবে টিকে থাকা সম্পূর্ণ দায় হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের চরম দুর্যোগ ও দুর্ভোগ,[৩] অজস্র বাধাবিপত্তির স্তূপ ঠেলে মুসলমান সমাজকে জাগতে হয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী;

১ ভারতী, শ্রাবণ ১৩১০
২ নবনূর, পৌষ ১৩১০
৩ ব্রাডলি বার্ট বলেছেন, এ সময় মুসলমান সমাজ 'অবনতি ও অবক্ষয়ের গভীরতম স্তরে' পৌঁছেছিল।
Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century, p. 11

তাঁরা দণ্ড-মুণ্ডের মালিক, তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে জাতির উন্নতি-অবনতি। বিদেশী শাসকের অধীনে সুখ-দুঃখের সমভাগী হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ কিছুটা নিজেদের চেষ্টায়, কিছুটা শাসক শ্রেণীর শুভদৃষ্টিতে সুবিধা লাভ করে উপরে উঠে এসেছেন, তাঁরা নবচেতনায়, নব-আদর্শে, নব শিক্ষায়, নব অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তুলেছেন; তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জীবনে ও জীবিকায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে আছে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ, ভ্রান্তি-মোহ, জড়তা-জটিলতা, আশঙ্কা-সন্দেহ। অর্থাৎ সমাজের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ত্রিশঙ্কুর মুখে। সুতরাং যাঁরা সমাজের কথা ভেবেছেন, তাঁরা সমাজের এই অবনতির ও অধঃপতনের কথাই বলেছেন, তাঁদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হয়েছে সমাজ জীবনের পশ্চাদপদতার দিকগুলি নির্ণয় করা এবং সেগুলি নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা। সমাজসেবী, চিন্তাবিদ ও লেখকদের কর্মের ও মননের একটা বড় অংশে সমাজের এই সমস্যা স্থান পেয়েছে। আবদুল লতিফ চেয়েছেন ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রসার, আমীর আলী চেয়েছেন ইংরাজী বিদ্যা ও রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার, সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, মীর্জা সুজাত আলী বেগ চেয়েছেন আধুনিক শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম চেয়েছেন মাতৃভাষা বাংলার প্রচলন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী চেয়েছেন ইসলামী ঐতিহ্যের বিকাশ, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মুনশী মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান চেয়েছেন ধর্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষাব উন্নতি, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, কাজী ইমদাদুল হক, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চেয়েছেন প্রচলিত রীতিনীতির সংস্কার সাধন করে সমাজের মুক্তি। তাঁদের সবার লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা, লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং সমাজের মানুষকে মুক্তি ও উন্নতির পথের সন্ধান দেওয়া।

হান্টারের মতে বাংলার মুসলমানদের অবনতির কারণ ছিল নিম্নরূপ:

(ক) রাজ্য হারিয়ে মুসলমানরা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে; এর পিছনে ব্রিটিশ সরকারের নীতি কাজ করেছে।

(খ) শাসকশ্রেণী হিসাবে নিষ্ফল অহংকার, যার ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ-খাওয়াতে পারেনি।

(গ) রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষা না করায় তারা সরকারী-সওদাগরী চাকুরীর সুযোগ হারিয়েছে।

(ঘ) ধনীদের কাছ থেকে উৎকোচ, ভেট, অত্যধিক কর নিয়ে ইংরাজরা মূলধন আত্মসাৎ করেছেন। ফলে তারা দরিদ্র-দশায় পতিত হয়েছে।

(ঙ) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বাঙালী হিন্দুদের কাছে পরাজিত হয়েছে।

(চ) জনশিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার স্থান না থাকায় তারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়েছে।[১]

সৈয়দ আমীর আলী 'স্মারকপত্রে' (১৮৮২) বলেছেন, ইংরাজ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পরেও কিছুকাল রাজনৈতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল বটে, কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিশের রাজস্বনীতি ও লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসননীতির ফলে ভূসম্পত্তি, রাজস্ববিভাগ ও বিচার বিভাগের চাকুরী থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়। একাধারে দারিদ্র্য ও অন্যধারে সরকারের শিক্ষানীতির ফলে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ফারসী রহিত করা হয় বটে, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত মুন্সেফগিরী ও উকিলগিরী পরীক্ষা উর্দু অথবা ইংরাজীতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ফলে ইংরাজী শিক্ষার তাগিদ কমই ছিল। ইংরাজী ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার অভাবে চাকুরীর ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে পারেনি তারা; কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমলাদের ষড়যন্ত্রের ফলে চাকুরী লাভে বঞ্চিত হয়।[২]

খোন্দকার ফজলে রাব্বি 'দি অরিজিন অব মহামেডানস্ অব বেঙ্গল' (১৮৯৫) গ্রন্থে মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইংরাজী ভাষার প্রবর্তন ও সেই ভাষার বিরুদ্ধে অন্ধভাবে পোষিত মুসলমানদের কুসংস্কার এবং সরকারী চাকুরীর নতুন বিধিব্যবস্থায় পূর্বের পদ মর্যাদা থেকে অপসারণের ফলে তারা দারিদ্র্য ও বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।[৩]

'মোসলেম ক্রনিকলে' জনৈক প্রবন্ধলেখক মুসলমানদের পতনের কারণ ব্যাখ্যা

1 *The Indian Mussalmans*. See chapter 4.

2 *Memorial of the National Mahomedan Association*, Calcutta, 1882

3 *The Origin of Mahomedans of Bengal*, Calcutta, 1895

করেন এভাবে :

(ক) মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে 'ভাববাদী' হয়ে উঠে, তারা অতীতের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং তার গৌরবের কথা ভেবে দুঃখ প্রকাশ করত; ইংরাজদের প্রভু বলে স্বীকার করতে পারেনি, ফলে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে দেরী হয়ে যায়।

(খ) চাকরী-বাকরী হারিয়ে যারা কৃষিকার্য গ্রহণ করেছিল, তারা অদক্ষতার কারণে কৃষিতে উন্নতি করতে পারেনি।

(গ) অর্থকরী ব্যবসায়ে তারা অমনোযোগী ছিল। সুদের ব্যবসায় 'হারাম' (নিষিদ্ধ) বলে মহাজনী করতে বিরত হয়।

(ঘ) বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য গরীব হয়ে পড়ে।

(ঙ) ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, ফলে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থেকে দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনে।

(চ) সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে।[১]

দেলওয়ার হোসেন আহমদ 'ল অব সাক্সেশন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মুসলমানের উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টনের ফলে সমাজ দারিদ্রে পরিণত হয় বলে উল্লেখ করেন এবং ঐ আইনের সংশোধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। একিনুদ্দীন আহমদ ও কতিপয় লেখক ঐ মতের বিরোধিতা করেন এবং সম্পত্তি বাড়াতে না পারা মানুষেরই অক্ষমতা—এই যুক্তিতে শাস্ত্রীয় আইনের অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করেন।[২]

'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) পুস্তকে শেখ মহদোম সোবহান বাংলার মুসলমান জমিদারদের পতনের কারণ হিসাবে তাদের বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা, দায়িত্বহীনতা ও শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতার কথা বলেছেন। আমলার উপর জমিদারীর দায়িত্ব দিয়ে মোসাহেব-চাটুকার পরিবৃত হয়ে বাইজী-বেশ্যা-খেমটা, নাচ-গানে অথবা মোরগ-লড়াই, কবুতর উড়ান ইত্যাদি কুক্রীড়ায় কালাতিপাত করেন। তাঁরা আধুনিক শিক্ষা ও যুগের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। তাঁদের অযোগ্যতার ও অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে অসৎ আমলারা জমিদারী উৎসন্নে দেয়। তিনি মুসলমান জমিদারদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "এখনও কি বিলাস করিবার আমিরী করিবার দিবারাত্রি পড়িয়া পড়িয়া নিদ্রা যাইবার সময় আছে?...মোরগ

১ *The Moslem Chronicle*, 23 May 1896 (Supplementary).
২ ঐ।

লড়ান কবুতর উড়ান ইত্যাদি কুক্রীড়া সকল ত্যাগ করুন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, বুঝিতে পারিবেন, আপনি এত ঋণী কেন। ...গাঁজা, আফিম, মদ, বেশ্যা যদি কিছু অভ্যাস করিয়া থাকেন, শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগ করিয়া, বিষয় কার্য্যে মন দিউন, ...অশিক্ষিত মূর্খ মদ্যপায়ী, বিলাসী, লম্পট, মোসাহেব ইয়ার, পূর্ণ অসভ্য, পূর্ণ চাষা, খানসামা, খেদমতগার লাঠিয়াল ত্যাগ করুন। কুলোকের সংসর্গে আলাপে মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া যায়। ...পরিশ্রম করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব বাঙ্গালা শিক্ষা করুন এবং পরিবারস্থ ছেলে-পিলেদিগকে জাতীয় বিদ্যা এবং রাজভাষার (ইংরাজির) সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষা দিউন।"[১] নওশের আলী খান ইউসফজয়ী 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯০) গ্রন্থে বাংলার মুসলমান জমিদারদের অকর্মণ্যতা, ভোগবিলাসিতা, আভিজাত্যগর্ব ও শিক্ষাবিমুখতার কথা উল্লেখ করে তাঁদের পতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এর সঙ্গে জমিদারদের অনুগ্রহভাজন, করুণাপ্রার্থী, ব্যক্তিত্বহীন 'মোসাহেব' শ্রেণীকেও কটাক্ষ করেছেন। এরা কৃষকের শ্রমোপার্জিত অন্নে ভাগ বসায়, কিন্তু প্রতিদানে সমাজকে কিছুই দেয় না।[২]

ইসলাম-প্রচারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বর্তমান অবনতির কথা বলা হয় এবং তৎসঙ্গে উন্নতির উপায় সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়। 'জাতীয় উন্নতি বিধানের উপায়' (সম্পাদক), 'মুসলমান জাতির অবস্থা' (ইসমাইল হোসেন শিরাজী), 'আমাদের কর্তব্য' (আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ), 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব' (সৈয়দ এমদাদ আলী), 'উন্নতির উপায় কি?' (শেখ ফজলল করিম), 'আমাদের কি করা উচিত?' (এবনে মাআজ), 'আমাদের অধঃপতন' (সম্পাদক ও মোজাম্মেল হক) ইত্যাদি রচনায় এ-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বলেছেন, বাঙালী মুসলমান রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাদপদ। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ, দূরত্ব এবং সহানুভূতিহীনতার জন্য সমাজের দুর্গতি বাড়ছে। তিনি বলেছেন, "আমাদের একজন আত্মীয় দৈববশে দরিদ্রদশা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর না করিলে কোন রূপেই চলে না; কাজে কাজেই তাহাকে কোন হীনবৃত্তি অথবা সর্বশেষ সম্বল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়।"[৩] ঐক্য ও সহযোগিতা দ্বারা কার্যোদ্ধার সম্ভব—

১ হিন্দু মোসলমান, পৃঃ ৭৮-৯৭

২ বঙ্গীয় মুসলমান, পৃঃ ৬-৮, ২৪-২৫

৩ ইসলাম-প্রচারক, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩

"আমাদের সকলের ক্ষমতা একক হিসাবে সামান্য হউক না কেন, একত্রীভূত হইলে তদ্দ্বারা মহৎ কার্যের সমাধানও সহজ হইবে।"[১]

সৈয়দ এমদাদ আলী আদর্শবান নেতার অভাব, সমাজের মানুষের অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা, ধর্মহীনতা, ভোগাসক্তি, অন্তর্বিবাদ ইত্যাদিকে মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। "বাঙ্গালার জলবায়ু, মুসলমান জাতির হৃদয়ে তেজ হরণ পূর্বক তাহাদের একতার বন্ধন ছিন্ন এবং ধর্মভাব শিথিল করিয়া দিয়াছিল, তাই তাহাদের পতন হইয়াছে।"[২] 'বাঙ্গালী মুসলমানগণ পারেন অন্যায় বিবাদ বিসম্বাদে প্রমত্ত হইয়া আদালতের দ্বারে অর্থের অঞ্জলি দিয়া নিঃস্ব হইতে, তাঁহারা পারেন মূর্খতা ও অজ্ঞানতাকে প্রিয় সাথী করিয়া দুর্বহ জীবনকে আরও দুর্বহ করিতে। শিক্ষার অভাবে তাহারা দিন দিন পশুর অধম হইয়া যাইতেছে।"[৩] তাঁর মতে, সমাজের অবনতির গতিরোধ করার একমাত্র উপায় যোগ্য ও আদর্শবান নেতার নেতৃত্ব—"প্রকৃত নেতার অভ্যুদয় ব্যতীত কোনও পতিত জাতির বা সমাজের উন্নতি হইতে পারে না।"[৪] সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'বিলাপ' নামে একটি কবিতায় বিশ্ব মুসলিম সমাজের যে অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন, তা বাংলার মুসলমান সমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য; তাঁর মতে, দারিদ্র্য, অনৈক্য ও অন্তর্কলহ, রিপুপূজা, মূর্খতা, ধর্মহীনতা, অকর্মণ্যতা, নেতৃত্বের অভাব, পরাধীনতা, নীতিহীনতা ও হীনমন্যতা বোধ সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। এগুলি দূর করতে না পারলে সমাজের উন্নতি অসম্ভব।[৫] 'মোল্লা-চিত্র' নামক একটি কবিতায় ইসমাইল হোসেন শিরাজী বাংলার মোল্লাকুলকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি কবিতার 'পাদটীকা'য় বলেছেন, "মাদ্রাসাসমূহের অপূর্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্তমান যুগের অনুপযুক্ত মৌলবীগণ, গ্রাম্য ভুয়া উপাধিধারী নকল মৌলবী ও মোল্লাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।"[৬] তিনি তাঁদের ধর্মান্ধ, অজ্ঞানী, প্রবঞ্চক, কলহপরায়ণ, পরবিদ্বেষী, প্রতিক্রিয়াশীল বলে উল্লেখ করেছেন।

১ ইসলাম-প্রচারক, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩
২ ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩
৩ ঐ
৪ ঐ
৫ ঐ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০৩
৬ ঐ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১

মোল্লাশ্রেণীচরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে কাজী ইমদাদুল হক একটি প্রবন্ধে বলেন, "ইসলামের মূলতত্ত্বগুলির সরল অর্থ আজকাল শিক্ষার অভাবে আর কাহারো বোধগম্য হয় না। তাই 'ফতওয়া' ও 'মসলাতলবে'র এত ছড়াছড়ি। মূলধর্ম এই সকল মসলার ও দপ্তরবাহী ছাত্র পরিবেষ্টিত বিপথ পরিচালক মসলা প্রদানকারী মুসল্লিগণের গোলক ধাঁধার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর।"[১]

সমাজে যোগ্য ব্যক্তির অভাব কায়কোবাদ অনুভব করেছিলেন। 'মহা-শ্মশান' (১৯০৪) উৎসর্গ করবেন, এমন বিজ্ঞজন বা শ্রদ্ধার পাত্র তিনি খুঁজে পাননি। তিনি লিখেছেন, "এই সুবিশাল বঙ্গভূমির যেদিকেই চক্ষু সঞ্চালন করি, সেই দিকে সেই একই দৃশ্য।—সকলেই নিজকে নিজে লইয়া ব্যস্ত; কেহই পরের দিকে—পরের অশ্রুসিক্ত মলিন মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না, দেখিয়াও দেখে না, সেই হা-হুতাশপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াও শোনে না। হায়, দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নিরাশার তীব্র নিষ্পেষণে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু একটি লোকও আমার মনের মত মিলিল না। দুঃখ হইল, ঘৃণা জন্মিল; বাঙ্গালী জন্মে ধিক্কার দিয়া আমার এই ভগ্ন হৃদয় শান্তি লাভ করিল।"[২]

"পতিত মুসলমান নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই পাইয়াছি। কবির কাব্যে, বক্তার গলাবাজিতে, লেখকের মসীলেপনের আড়ম্বরে; এবং সমাজের সাধারণ অবস্থা পর্যালোচনা করিতে করিতে ধারণাটাও জমিয়া গিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে—এ 'পতিত' নামটা আর কতদিন থাকিবে?"[৩] শেখ ফজলল করিম এরূপ প্রশ্ন তুলে সমাজের উন্নতির উপায় অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষার অভাবে লোকের রুচি, সভ্যতা ও অবস্থা এত অধোগামী হইয়াছে যে, আমরা এই দেশের সিংহাসন হইতে নামিয়া এই দেশেই মজুরি খাটিতেছি। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অশিক্ষা, ধর্মহীনতা ও আদর্শের অভাবে আমাদের এই কুফল ফলিয়াছে।"[৪] সমাজে যা আছে, তা খল-নেতৃত্ব, তিনি সৎ নেতার নেতৃত্ব চান—"আমরা অকূল সমুদ্রের মধ্যে কর্ণধারহীন জীবন-

১ নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

২ কায়কোবাদ রচিত মহাশ্মশান কাব্যের 'উৎসর্গপত্র' দ্রষ্টব্য। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কাব্যখানির ১ম খণ্ড 'ধনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'কে উৎসর্গ করেন।

৩ ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩

৪ ঐ

তরীর অলক্ষ্য পরিচালনা করিতেছি। আমাদের অবলম্বন কিছুই নাই। আমরা চাই সহৃদয়তা সাহায্য উপদেশ, আমরা চাই প্রতিকারের ঔষধ।"[১] বলবীর্যহীন মানুষ হীনমন্যতায় ভুগছে; ঐতিহ্যের মোহে জাতি ডুবে আছে, ঐতিহ্যকে প্রেরণার উৎস রূপে গ্রহণ করতে অক্ষম; অলসতা, বিলাসিতা ও ধর্মবিগর্হিত কার্যকলাপের দিকে সমাজের মানুষের দৃষ্টি। তিনি বলেছেন, "জাতীয় একতার অভাবে সামাজিক বীর্যে যে তিমিরাবরণ পড়িয়াছে তাহা আমাদের পাণ্ডু কলুষিত নেত্রের পক্ষে কম কুহেলিকাচ্ছন্ন নহে। আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া জাগিয়া উঠি—কর্মসাধনের পথের কঠোর বিপত্তিরাশি অতিক্রমের জন্য সচেষ্ট হই, তবে উন্নতি কত দূরে?"[২]

'ধর্মের উষ্ণ রক্তস্রোত' সমাজ দেহে প্রবাহিত করার কথা যেমন শেখ ফজলল করিম বলেছেন, তেমনি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদও বলেছেন। তার বক্তব্য, "বঙ্গীয় মুসলমানগণ ইসলামের পবিত্রসীমা বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যাওয়াতেই আজ তাহাদের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দশা।... ফলতঃ কোনও জাতির অধঃপতন যতদূর হইতে পারে, আমাদের তাহাই হইয়াছে।...আমাদিগকে ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া আমাদিগের হৃত সম্পত্তি পুনরায়নের চেষ্টা করিতে হইবে।"[৩]

'নবনূর' পত্রিকায় জাতির অবনতি সমস্যাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পত্রিকার 'সূচনা'তে সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন, "আমরা দেখিতেছি, মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে।...পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।"[৪] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সাথে নবজাগরণের যে যোগসূত্র আছে, মুসলমান সমাজ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অল্প শিক্ষিত মোল্লাদের ধর্মান্ধতা সমাজের সর্বনাশ সাধন করছে বলে কাজী ইমদাদুল হক মন্তব্য করেন। "ধর্মের মূল সত্য উপেক্ষা করিয়া, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা হারাইয়া শুধু কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্য ভিত্তির উপর ততোধিক অন্তঃসারশূন্য ধর্মের অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া কি আজ আমরা সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতেছি না?"[৫]

১ ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩
২ ঐ
৩ ইসলাম-প্রচারক, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩
৪ নবনূর, বৈশাখ ১৩১০
৫ ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

শিক্ষার অভাবে 'ধর্মজ্ঞান, কর্মজ্ঞান-সর্বজ্ঞান হারা' হয়ে জাতি অদৃষ্টনির্ভর হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে, আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাই মুক্তির পথ—"যে শিক্ষার স্রোতে আজ পৃথিবী প্লাবিত তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সভ্যতার সমীর হিল্লোল নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে কেন আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না ?"[১] ঐ প্রসঙ্গে 'মুসলমানের সর্বনাশ' নামে একটি প্রবন্ধে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা রাজনীতি সম্পর্কে মুসলমানদের উদাসীনতার প্রতি দোষারোপ করেছেন।[২]

এসব আলোচনা থেকে বুঝা যায় লেখকগণ সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং সমাজের খুঁটি-নাটি দোষত্রুটি নির্দ্বিধায় উত্থাপন করেছেন, তাঁদের লক্ষ্য স্থির—পতনশীল সমাজের উন্নতি বিধান; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে আন্দোলনের রূপ দিতে পারেননি। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চেয়েছেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষাও বজায় রাখতে চেয়েছেন। দারিদ্র্য মোচনের উপায় সরকারী চাকরি বলে মনে করেছেন, কেউ কেউ কারিগরি-কৃষি-শিল্প শিক্ষার কথাও বলেছেন। পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করেছেন, আবার কেউ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে বলেছেন; কিন্তু সে রাজনীতির কোন ব্যাখ্যা আরোপ করেননি। ভোগমত্ত জমিদার, ভণ্ড মোল্লা, এমন কি আত্ম-সুখসর্বস্ব নব্যশিক্ষিতদের সমালোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ আত্মসমালোচনা করেছেন তাঁরা। কিন্তু এতসব প্রয়াস আশানুরূপ ফল আনতে পারেনি। যে কঠিন দারিদ্র্য সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, সেটাকে নড়াবার ও সরাবার উপায় তাঁদের জানা ছিল না। সরকারের কাছে আবেদন করে এবং কিছু সুবিধালাভ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে এবং সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে সমাজের মানুষের মনে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন, তাতেই তাঁদের আংশিক সাফল্য। সমাজে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন নেতার অভাব ছিল; আবার 'ইয়ং-বেঙ্গলে'র মত ধর্ম ও সমাজের অচলায়তন বন্ধনগুলি ভেঙে দেওয়ার মত কোন নব্যদলেরও আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং পাশ্চাত্য প্রভাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হিন্দু সমাজের একটি অংশ যেভাবে নিকষিত হেমরূপ লাভ করেছিল, মুসলমান সমাজের বিশুদ্ধীকরণ ঐভাবে সম্পন্ন হয়নি। সমাজের নব্য চেতনার বীজ অতি মন্থরগতিতে সঞ্চারিত হয়েছে। সমাজের ত্রিশঙ্কু

১ নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

২ ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩১২

অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য যেরূপ ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণের প্রয়োজন ছিল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেরূপ শক্তির অধিকারী হতে পারেননি।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক

হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিচিত্র মতাবলম্বী, বহুদেবতাবাদে বিশ্বাসী, মূর্তি পূজারী হিন্দুগণের হাত থেকে রাজক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তানের মুসলমানগণ এদেশের শাসকশ্রেণীতে পরিণত হন। বিশাল ভারতবর্ষে এই ক্ষমতার রদবদল যেমন একদিনে হয়নি, তেমনি বিনা রক্তপাতেও সম্পন্ন হয়নি। শক্তির দ্বন্দ্বে পরাভূত হয়ে হিন্দুগণ মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করলেও উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তিরোহিত হতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজ গঠনেরও গোড়াপত্তন হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তির চত্রচ্ছায়ায় নবোত্থিত সমাজ, বিজিত সমাজ অপেক্ষা বেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কেবল রাজ্য জয়ে সব কিছুর শেষ হয়নি, ক্ষমতামদমত্ত রাজতন্ত্রের যা কিছু কুফল তা ভারতবাসীর সমাজজীবনেও বর্ষিত হয়। তাঁদের শোষণ-শাসন, দমন-দলন, গর্জন-তর্জন, অবিচার-অত্যাচার যা সে যুগের রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের ধর্ম ছিল, তা পূর্ণ মাত্রায় বহাল থাকে। কোন কোন খামখেয়ালী, অত্যাচারী, ধর্মদ্বেষী রাজার আচরণ সীমা অতিক্রম করে যায়। সুতরাং যাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে অত্যাচার নিপীড়নের ভাগীদার হলেন, তাঁরা শাসক শ্রেণীর নামে তাঁদের অন্ধ স্তাবক এবং বশংবদ অনুগামী হবেন না। স্বার্থ যাঁদের ক্ষুণ্ণ হল, তাঁরা বিষপান করে 'নীলকণ্ঠ' হলেন। এর প্রতিক্রিয়া হবেই। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষবহ্নি নির্বাপিত হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকেও কলুষিত করেছে। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস মুসলমান শাসক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আওরঙ্গজেব মথুরার মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে লাভের চেষ্টা করে হিন্দু পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করেন। একটি জাতির ইতিহাসের এরূপ অভিজ্ঞতা কোন দিন মধুর হতে পারে না। ঐতিহ্য সচেতন জাতির কাছে তা মর্মদাহের কারণ হতে বাধ্য। ধর্মের আদর্শ ও আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে হিন্দু-ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশেষ করে, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে হজরত মহম্মদ নিরাকার একেশ্বরের উপাসনা প্রচলন করেছিলেন। হিন্দুগণ মৃন্ময়-মূর্তির পশ্চাতে চিন্ময় পরমেশ্বরকে দেখেন—তত্ত্বের এই গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করলে অবশ্য সে-ভেদ

থাকে না। ঈশ্বর, আল্লাহ, মন্দির, মসজিদ, ব্রত-উপবাস, রোজা-নামাজ, পূজা-পার্বণ, ঈদ-পরব, বলি-কোরবান ইত্যাদিতে তত্ত্বগত প্রভেদ কোথায়? প্রভেদটা এসেছে বাইরের আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে। হিন্দুগণ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা করেন, মুসলমানগণের ধর্মকর্মে বাদ্য নিষিদ্ধ। হিন্দুর বলির পশু ও মুসলমানের কোরবানির পশু এক নয়। উভয়ের মধ্যে কতক খাদ্য-দ্রব্যের বাছ-বিচার আছে। সুতরাং এসব নিয়েই হিন্দু-মুসলমানে মতভেদ এবং তা থেকে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রভাবিত মধ্যযুগে ধর্মসংঘাত ছিল না, একপ ভাবা যায় না। প্রচারশীল ইসলামধর্মের সাথে সনাতন হিন্দুধর্মের দ্বন্দ্ব ছিল বলেই বারবার আপোস বা ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা ভারতভূমিতে হয়েছে। স্বয়ং বাদশাহ আকবর 'দীন-ই-এলাহি' (১৫৮২) প্রচার করেছিলেন।[১] কবীর, নানক, দাদু, রজব, চৈতন্যদেব, লালন এই ধর্ম সমন্বয়ের সাধক ছিলেন। দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের এসব ঐতিহ্য নিয়েই এদেশের হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। তখন বিজয়ী ইংরাজ শাসক হন, হিন্দু-মুসলমান শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হন। মুসলমানগণ ভারতে সমাজপত্তন করে এদেশের নাগরিক হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা আরব-ইরান-তুরস্ককে 'হোম' মনে করেননি। ইংরাজগণ ভারতকে পুরোপুরি উপনিবেশ হিসাবে গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁদের শাসন ও শোষণনীতিতে ঔপনিবেশিক ছাপ পড়েছিল। হিন্দু-মুসলমান দুই বিবদমান-শক্তিকে তাঁরা রাজ্যজয়ের কাজে ব্যবহার করেছিলেন, রাজ্য শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন না এরূপ হতে পারে না। হিন্দুর প্রভুর বদল হয়, মুসলমানের প্রভুত্ব যায়। প্রভুত্ব ও ক্ষমতা হারানর বেদনা তাঁদের চিত্তকে বিক্ষুদ্ধ করে তোলে। ইংরাজদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে হিন্দুগণ অগ্রগামী ও মুসলমানগণ পশ্চাদবর্তী হলেন। তাঁরা বিক্ষুব্ধ মুসলমান অপেক্ষা প্রলুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায়কে অধিক নির্বিষ, বিশ্বস্ত ও অনুগত মনে করলেন। ইংরাজদের শাসন ও শোষণ নীতির চক্রান্তে পরাভূত ও নিঃস্ব হয়ে মুসলমানরা পশ্চাদনুসরণ করে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেন, খুব স্বাভাবিকভাবে হিন্দুগণ নবোত্থিত শ্রেণী হিসাবে সে স্থান দখল করে বসেন। উপরন্তু নতুন শাসননীতি ও অর্থনীতিতে,

১ "ইসলাম, খ্রীস্ট ও ইহুদী ধর্মের একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম, জরথুস্ত্র ধর্মের অগ্নি উপাসনা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও সুফীবাদের মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ইত্যাদি দীন-ই-ইলাহির প্রধান উপাদান। বিবিধ ধর্মের সংশ্লেষ ও সমন্বয় ছিল আকবরের উদ্দেশ্য।" ভারতকোষ, ১ খণ্ড, পৃঃ ২০৩

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ব্যবস্থায় যে সুযোগ-সুবিধা এসেছিল হিন্দুগণই সে সবের সিংহভাগের অধিকারী হলেন। শাসন ও বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার উঠ্তি মধ্যবিত্তের মধ্যে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন। ভূমি, ব্যবসায়, রাজস্ব, প্রশাসন, বিচার, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হল, অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়ের মতি ও গতি হল দ্বিমুখী---একটির উন্নতি, অপরটির ধ্বংস; একটির বিকাশ, অপরটির বিনাশ; একটির নবজীবন, অপরটির অবক্ষয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একশ' বছর হিন্দুগণ নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করে উপরে উঠে এসেছেন, মুসলমানগণ হতাশা ও ব্যর্থতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছেন। আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। শহরের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে মুসলমানের সংখ্যা খুবই নগণ্য, অতি মুষ্টিমেয় মুসলমান অভিজাত শ্রেণী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিলেন; নীচের তলার বৃহত্তর জনগণ আধুনিক শিক্ষা ও আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ দুর্দশা, কুসংস্কার, অনাচার অসদাচারের মধ্যে পতিত হয়। নিম্নশ্রেণীভুক্ত হিন্দু সমাজেরও ঐ একই অবস্থা। দেশের আলোকপ্রাপ্ত নব্য-গঠিত মধ্য ও উচ্চবিত্তের সাথে এ শ্রেণীর যোগসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে তারা শহরের 'ভদ্রলোকে'র কাছে 'ম্লেচ্ছ', 'চাষা', 'অভদ্র', 'নীচ', 'ছোটলোক' শ্রেণীতে পরিণত হয়। সেযুগে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, মুসলমান কেউ ছিলেন না। গ্রামে থেকে মজনু শাহ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লা, দুদুমিয়া ফকির বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন ও ফারায়েজী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা সমর্থন করেনি। 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করে মধ্যযুগীয় ভঙ্গিতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সাফল্য আসতে পারে না, তা তাঁরা জানতেন। তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহকেও সমর্থন দেননি, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের মূলে যে সামন্তচেতনা কাজ করেছিল, তার লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন দেওয়ার অর্থ হবে মুসলমান যুগের অত্যাচার-নির্যাতনের ভাগী হওয়া। সুতরাং চেতনা ও মনোভাবের দিক থেকেও দুটি সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজের অসম বিকাশের ফলেই এরূপটি হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ সময় হিন্দু নেতাগণ ব্রিটিশ শাসন ও ইংরাজ সংস্রবকে দেখলেন উন্নতির সোপান, মুক্তির দিশারী রূপে। ইংরাজ সুসভ্যজাতি, তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি

উন্নত। অতএব সমাজের পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য ব্রিটিশ শাসনকে টিকিয়ে রাখা দরকার। এজন্য তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী কোন আন্দোলনে যোগদান করেননি, বরং সভা করে ও চাঁদা তুলে সরকারকে সমর্থন ও সাহায্য দান করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলরা ইউরোপ বলতে অজ্ঞান ছিল, পাশ্চাত্যের যা কিছু, তাই উত্তম, প্রাচ্যের সবকিছু নিকৃষ্ট এরূপ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তারা আহারে-বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, কথা-বার্তায়, আদব-কায়দায় ইংরাজদের অনুসরণ ও নকল করত। সমাজের অজস্র গ্লানি, মানুষের বদ্ধদশা হতে মুক্তি লাভের উপায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা। এজন্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন কেউই ব্রিটিশ শাসনের অবসান চান নি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চিন্তার মুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ দ্বারা অধিকার সচেতনতা না জন্মিলে রাজনৈতিক মুক্তিতে ফল হবে না বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ব্রিটিশ শাসনে সুফল তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আইন শৃঙ্খলার উন্নতিতে, সমাজজীবনে ধর্মে কর্মে স্বাধীনতায়, জানমালের নিরাপত্তায়, শ্রেণী বিশেষের অর্থাগম ও বিত্ত সঞ্চয়ের অভূতপূর্ব সুযোগ লাভে আর পাশ্চাত্য বিদ্যায় মানসিক জগতের পরি-পরিবর্তনে। তাঁদের ধারণা, পূর্বের রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরে স্বৈরাচার শাসনের অবসানের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

ব্রিটিশ রাজের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে নব্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন করেন। তাঁরা প্রথমে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদের আদর্শে ভারতের ইতিহাস রচনা শুরু করেন। এই সময় ইংরাজ পণ্ডিত ও গবেষকগণ মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের উপর আলোক-পাত করে মুসলমানদের বিদেশী আক্রমণকারী ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী অত্যাচারী শাসকরূপে চিত্রিত করেন। এটা তাঁদের স্বার্থেই করেছিলেন; স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরা দেশে সুশাসন, শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি এনেছেন, এটাই প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। দেশীয় লেখক-গবেষক তাঁদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁদের অনুসরণে ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য রচনা করেন। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র (১৮৫৮) উপাদান সংগ্রহ করেন টডের রাজস্থানের পুরাকাহিনী থেকে। সিরাজদ্দৌলাকে দুশ্চরিত্র, লম্পট, অত্যাচারী রূপে ইংরাজরাই প্রথম চিত্রিত করেন। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) ইংরাজদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি ইংরাজদের পরিবেশিত তথ্যকে অনুসরণ করে রচনা করেন। এজন্য কোন কোন মুসলমান চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে এবং

মুসলমানদের হীন করে দেখান হয়েছে। আলোর মহিমা দেখাতে হলে অন্ধকারের কালিমাকে আনতে হয়, সেরূপ একের গৌরব দেখাতে গিয়ে অপরের অগৌরবকে বর্ণনা করতে হয়েছে—প্রধানতঃ এরূপ নীতির বশেই হিন্দুর পুনরুত্থানের যুগে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের জীবনে ও চরিত্রে মসীলেপন করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে অত্যাচারী ইংরাজকে সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৭৮) নাটকে শুভসিংহের উক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ব্যবহৃত হয়ঃ "ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক, আমরা গাব না।" নাটকে কবিতাটি ব্যবহারের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ব্রিটিশে'র স্থলে 'মোগল' শব্দ বসিয়েছিলেন, ইংরাজদের কোপানল থেকে বাঁচবার জন্য। তাঁরা বিদেশী শাসকের কোপানল থেকে বাঁচলেন সত্য। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিলেন, এটাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল হয়ে গেল। ঐতিহাসিক কারণ যাই থাক, মুসলমানদের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষালাভের পর যখনই তাঁরা নিজেদের কথা ভাবতে শিখেছেন, তখনই হিন্দু সমাজের এরূপ মনোভাবের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের প্রতিবাদের মাধ্যম সভাসমিতি, সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নয়; বিপরীত ভাবের কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার দ্বারা প্রতি-আক্রমণ করেছেন তাঁরা। দেশের ও জাতির সাধারণ শত্রু যে ইংরাজ শাসক সেটি চিহ্নিত না করে বরং তাঁদেরই পক্ষপুটে থেকে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে মসী ধারণ করেন। তাঁরা গো-হত্যা, মসজিদ, মন্দির নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামায় অসি ধারণও করেছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে সাময়িকপত্রে কিরূপ বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল, তার আলোচনা করলে উভয়ের দ্বন্দ্ব-কলহের স্বরূপ জানা যাবে। মিহির ও সুধাকর, ইসলাম-প্রচারক, কোহিনুর, নবনূর, হাফেজ প্রভৃতি পত্রিকা মুসলমানদের প্রতি হিন্দু লেখক ও রাজনীতিবিদের বিরূপ মনোভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রতিবাদী সুর তুলেছে। পত্রিকাগুলিতে কেবল বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়নি, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। নবনূর পত্রের সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী 'মাসিক সাহিত্য' সমালোচনা প্রসঙ্গে একাধিক রচনার প্রতিবাদ করেছেন। 'ভারতী'তে (চৈত্র ১৩০১) ভূতনাথ ভাদুড়ী 'শক্তিসাধনা ও তাহার পরিণাম' প্রবন্ধে এক জায়গায় মন্তব্য করেন যে, ইসলাম ধর্ম শক্তিস্বরূপিনী রমণিগণকে বিলাসের

উপাদান মাত্রে পরিণত করেছিল। এমদাদ আলী এর সমালোচনা করে বলেন, "ইহা তো প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান নহে, ইহা মুসলমানের দেহে ইচ্ছাকৃত অস্ত্রাঘাত। লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি মুসলমান ধর্মের শ্লেষপূর্ণ সমালোচনায় অপব্যয় করিয়াছেন। ...ইসলাম রমণীদিগকে যেসব অধিকার প্রদান করিয়াছে, অন্য কোন ধর্ম তাহা করিয়াছে কি? আমাদের পরিতাপের বিষয় এই যে, লেখক কিছু না জানিয়াও সব জানিবার ভান করিয়াছেন।"[১] ইসলাম ধর্মে 'কাফের নাশকে এবং কাফেরের প্রতি অত্যাচারকে পূর্ণকর্ম বলিয়া পরিগণিত এবং স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত করিতে হইয়াছিল' ভূতনাথ ভাদুড়ীর এরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি বলেন কোরানের অথবা মহম্মদের এরূপ নির্দেশ কোথাও নেই।[২] 'ভারতী'-তে (আশ্বিন ১৩১০) প্রকাশিত 'রাজসেবায় হিন্দু ও মুসলমান' প্রবন্ধে পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, মুসলমানগণ সরকারী চাকুরী পান না শিক্ষাগত অযোগ্যতার কারণে, যাঁরা কর্মরত আছেন, তাঁরা রাজানুগ্রহেই আছেন। নবনূর-সম্পাদক এর উত্তরে বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে অযোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু সে সঙ্গে হিন্দু-আমলারও বঞ্চনা আছে। তিনি লিখেছেন, "আজকাল বহু কার্য্যেই হিন্দু সমান শিক্ষিত মুসলমান কর্মপ্রার্থী উপস্থিত হন, কিন্তু এসব বিষয়ে লক্ষ্মী হিন্দুর প্রতি প্রসন্না। রেড ট্যাপিজম-এর প্রতাপ যথায় অক্ষুণ্ন আছে, সেরূপ স্থলে সাদা মানুষ কর্মদাতা হইলেও মুসলমানের দাবী শূন্যে পর্যবসিত হয়।...স্বজাতীয় বাৎসল্যরূপ অন্যায়টা হিন্দু রাজপুরুষগণই বেশী করিয়া থাকেন।"[৩] তিনি আরও বলেছেন যে, মুসলমান জমিদারদের বিষয়কর্মে অযোগ্যতা ও ভোগবিলাস মত্ততার সুযোগ নিয়ে হিন্দু আমলাগণ ষড়যন্ত্র করে জমিদারী হস্তগত করছেন, মামলা-মোকদ্দমা অথবা ঋণজালে জড়িত হয়ে জমিদারগণ অল্পদিনের মধ্যে পথের ভিখারীতে পরিণত হন।[৪] শেখ আবদোস সোবহান 'হিন্দু-মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থে একই অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বঙ্গদেশে যে কতকঘর মোসলমান জমিদার আছেন সকল ঘরই হিন্দু আমলায় আবৃত। প্যাদা, খানসামা, হুকা বরদার, ছাতি বরদার, বাবুর্চি

১ নবনূর, বৈশাখ ১৩১০, পৃঃ ৩৮

২ ঐ, পৃঃ ৩৯

৩ নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃঃ ৩১০
উল্লেখযোগ্য যে সৈয়দ আমীর আলী লর্ড রিপনকে প্রদত্ত 'স্মারকলিপি'তে (১৮৮২) অনুরূপ অভিযোগ করেছেন।

৪ ঐ, পৃঃ ৩১১

এসব পদের চাকুরীগুলি বরং মোসলমানগণই পাইয়া থাকে। কিন্তু মুহুরি, নায়েব, দেওয়ান, খাজাঞ্চী, সেরেস্তাদার, পেস্কাব, পরিদর্শক, ম্যানেজার এসবই হিন্দু। ইহারা জমিদারীতে এত আধিপত্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে যে প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইহারাই জমিদার। মোসলমান জমিদারগণ পেন্সনভোগী সাক্ষীগোপাল মাত্র।"[১]

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষে' (১৫শ ভাগ) 'মুসলমান' ও 'মুসলমান ধর্ম' শিরোনামে মুসলমান সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই আলোচনা তথ্যের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং বক্তব্যের দিক থেকে আপত্তিকর বিবেচনায় মোহাম্মদ ইসহাক এর প্রতিবাদ স্বরূপ 'বিশ্বকোষে বসুজ্ঞ' প্রবন্ধ লেখেন। তিনি প্রথমেই অভিযোগ করে বলেন, "তিনি (নগেন্দ্রনাথ) কতক ইসলামদ্বেষী খৃষ্টান ইতিহাসবেত্তাদের, কতক অজ্ঞ গ্রাম্য কাটমোল্লাদের, কতক লা-মজহাবীদের ও কতক সিয়াদের মত সংগ্রহ করিয়া তৎসহ স্বকপোলকল্পিত ঘৃণিত মত মিশাইয়া ইসলাম ধর্মকে একটি কদর্য পদার্থে পরিণত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।"[২] মোহাম্মদ ইসহাক বিশ্বকোষের যেসব উক্তিকে ত্রুটিপূর্ণ ও আপত্তিজনক মনে করেছেন, সেগুলি এরূপ:

> "ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় হাবশী, খাণ্ডার, নেড়ে, পাঠান, মোগল, তাতার, পারসী, আরবী ও তুর্কী ইত্যাদি নামে কথিত হয়।" (পৃষ্ঠা ২৪২)
>
> "সিয়া ও সুন্নি ব্যতীত এখানে হানিফী, সফাই, সিদ্দিকি ও হম্বলী নামে আরও চারিটি নূতন ধর্মমত দেখা যায়।" (পৃষ্ঠা ২৬৩)

---

১ হিন্দু মোসলমান, পৃঃ ৪৩-৪৪
মীর মশাররফ হোসেনের পিতামহ মীর এব্রাহিম হোসেন কুষ্টিয়ার দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া আনার খাতুনের যে জমিদারীর মালিক হন তার 'প্রধান কার্যকারক' ছিলেন শীতলচন্দ্র দত্ত। (আমার জীবনী, পৃঃ ২৬)। মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেনের জমিদারীর প্রধান কার্যকারক ছিলেন দেবীপ্রসাদ। তাঁর সহযোগিতায় মীরের 'ভাইজি জামাতা' শাহ গোলাম জান 'অসিয়তনামা' (দলিল) তৈরী করে বিষয়সম্পত্তি হস্তগত করেন। (উদাসীন পথিকের মনের কথা, 'পঞ্চবিংশতি তরঙ্গ' দ্রষ্টব্য)।
'নবনূরে' প্রেরিত একটি পত্রে জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "হিন্দু কর্মচারীগণ যে মুসলমান জমিদারের সম্পত্তি কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এরূপ দু' একটি ঘটনা আমি জানি এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করি। তবে যে সকল জমিদারের সম্পত্তি এরূপে হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাঁহাদের বিলাসলিপ্সা এবং বিষয়কার্যে অমনোযোগও তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী।" —নবনূর, ফাল্গুন ১৩১০, পৃঃ ৪১৭

২ নবনূর, আষাঢ় ১৩১০, পৃঃ ১১০

"সুন্নিগণ বলেন যে তাঁহারাই মহম্মদের প্রকৃত উপাসক। ইঁহারা আবুবকর, ওমর এবং ওসমানকে প্যাগম্বর স্বীকার করেন।" (পৃষ্ঠা ২৬০)

মোহাম্মদ ইসহাক বলেছেন, 'নেড়ে' জাতিবাচক শব্দ নয়, এটি হিন্দুদের গালিবাচক শব্দ। মুসলমান সম্প্রদায় সিয়া-সুন্নিতে বিভক্ত: সুন্নিদের চারটি মজহব—হানাফী, সাফী, মালেকী ও হাম্বেলী। সুতরাং চারটি মজহব কোন 'নতুন ধর্মমত' নয়। সুন্নিগণ কখনই মহম্মদকে 'উপাসক' মনে করেন না। 'এক ঈশ্বর ব্যতীত মুসলমানের দ্বিতীয় উপাস্য নাই।' আবুবকর, ওমর, ওসমান খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র, তাঁরা 'পয়গম্বর' (প্রেরিতপুরুষ) নন।[১]

মুসলমানের পতন সম্পর্কে বিশ্বকোষে লক্ষ্য ভ্রষ্টতা, উদ্যমশূন্যতা, সুখানুষ্ঠান, পরকালে সুখ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহকালে নারী ও মদ্য ভোগাসক্তি, কাফের দলন ও ধর্মান্তরীকরণ ইত্যাদি কারণের কথা বলা হয়। প্রবন্ধকার এগুলির প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হয়নি, ধর্মের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যরাশিই ইসলামের সাফল্যের কারণ।[২] নগেন্দ্রনাথ বসু একটি পত্রে তথ্যগত ত্রুটির কারণে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ইংরাজী বই-এর অনুসরণ এই ভুলের কারণ, তিনি তা সংশোধন করবেন। তিনি বলেন, "হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিদ্বেষ বিদ্যমান আছে বলিয়া আমার জানা নাই, সাহিত্যের যে অংশ জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি বা পোষণ করে, তাহা আমার ঘৃণ্যই। মুসলমান সম্প্রদায়কে আমি সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। তাহাদের অপ্রীতি ভাজন হওয়া আমার পক্ষে প্রীতিকর।"[৩]

শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভারতী'র ১৩১১ সনের কার্তিক সংখ্যায় 'অনুকরণ ও অনুসরণ' প্রবন্ধ লিখেন। সেখানে তিনি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। তাঁর একটি উক্তি এরূপ: "তাঁহার (মহম্মদের) শিষ্যগণ যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছেন, তখন এই বলিয়া বাহির হইয়াছেন যে জগতের সকল জাতিকে এক ছাঁচে ঢালিব। অপরের যাহা কিছু, তাহা বিনষ্ট করিতে হইবে, কোরানে যাহা আছে, তাহাই প্রবর্তিত করিতে হইবে। এই আধ্যাত্মিক

১ নবনূর, আষাঢ় ১৩১০, পৃ: ১১১-১২
২ ঐ, পৃ: ১১৩-১৪
৩ ঐ, শ্রাবণ ১৩১১, পৃ: ১৭৯

সংকীর্ণতা বশতঃই মহম্মদীয় শাসনশক্তি জগতে দাঁড়াইল না।"[১] ইমদাদুল হক 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' নামে একটি প্রবন্ধে ইসলামের 'আধ্যাত্মিক সংকীর্ণতা'র অভিযোগটি মানতে পারেননি। তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিক নীতিসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত অভিযোগের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ধর্ম প্রচার সম্পর্কে কোরানের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা ইসলাম প্রচারের নির্দেশ কোরানে নেই।[২]

হিন্দু প্রণীত গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য ইত্যাদি রচনায় যেসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছেন মুসলমান লেখকগণ। মুসলমান চরিত্রকে কলুষিত ও মুসলমান সমাজকে অপমানিত করে লিখিত এসব রচনার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করেছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন, তাঁদের মতে মিলনের উপায়, এরূপ অপপ্রচার থেকে বিরত হওয়া। ১৮৯৯ সালের মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'বাংলার মাতৃভাষা শিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধে বাংলার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে তিনি হিন্দুগণের মুসলিম বিদ্বেষের একটি চিত্র তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, ঐ সভায় 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে' একটি প্রস্তাবও পাশ করেন। তিনি তাঁর লেখায় রামগতি ন্যায়রত্ন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র, হারানচন্দ্র রক্ষিত, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকের মুসলমান বিদ্বেষমূলক রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন।[৩] উল্লেখযোগ্য যে, এগুলির অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি বলেন, এসব রচনা পাঠ করে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দু ছাত্রদের বিরূপ ধারণা

১ নবনূর, মাঘ ১৩১১, পৃঃ ৪৬৮
ইসলামের প্রতি সংকীর্ণতার অভিযোগ 'সোমপ্রকাশে'ও (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮) তোলা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "এক হস্তে কোরান অপর হস্তে তলয়ার এটী মুসলমান ধর্ম প্রচারের মূল নিয়ম। গোঁড়াদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এধর্মে ঔদার্য্য ও নিরপেক্ষতা নাই।"—সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫), পৃঃ ২০৫

২ "বল 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিবে ?' ইহাতে যদি সে গ্রহণ করে, সে সুপথ প্রাপ্ত হইবে : কিন্তু যদি প্রত্যাখান করে, তবে তোমার কর্তব্য শুধুই প্রচার করা। সকলের প্রতি ঈশ্বরের সমদৃষ্টি।"—৩ সূরা ১৯ আয়াত। নবনূর, মাঘ ১৩১১, পৃঃ ৪৬৭

৩ *Vernacular Education in Bengal.* pp. 3-4, 46-47

জন্যে, আবার মুসলমান ছাত্রদেরও স্বসমাজের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব জাগে।[১] সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর এই চেতনা সমকালীন পত্র-পত্রিকায় সম্প্রচারিত হয়। এ ব্যাপারে নবনূর নেতৃত্ব দেয়। 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন, "বঙ্কিমবাবু সর্বপ্রথম মুসলমান সমাজের দেহে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহা সত্য। অনেক কংগ্রেস ভক্ত লেখককে যখন আমরা মুসলমান সমাজের আদর্শ খর্ব করিয়া গল্প ও গাথা রচনা করিতে দেখি, তখন কি আমাদের মুসলমানীয় গর্বে একটুও আঘাত অনুভব করি না?"[২] তিনি আরও বলেন, "কেবল এক রিজিয়া নাটক কেন, আজকাল নাট্যমঞ্চে অভিনীয় বহুনাটকের মধ্যেই মুসলমানের প্রতি অজস্র বিষদগ্ধ বাক্য বর্ষিত হইতে দেখা যায়। যে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কংগ্রেস করেন, কনফারেন্স করেন এবং বক্তৃতামঞ্চে মুসলমানকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই আবার গৃহে আসিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন।"[৩] সৈয়দ এমদাদ আলীর মতে, এরূপ ক্রিয়াকলাপ হিন্দু-মুসলমানের

---

১ পরে লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (কার্তিক ১৩০৭) তার সমালোচনা করেন। তিনি একস্থলে বলেন, "স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয়ের সাধু দৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধু দৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্য ধার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।...বাঙালী হিন্দু ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভাল করিয়া পালন করিতে পারিবে না।" (পৃ. ৬২৪) বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের গলদ থেকে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিদ্বেষভাবের উদয় হয় বলে অভিযোগ করেছেন হাতেমউল্লা। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থে ইসলাম ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মোহাম্মদ মুসলমান ধর্মের সংস্থাপক। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা বল দ্বারা প্রচার করাও বিধেয়, এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বদেশীয়দিগকে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন।" হাতেমউল্লা বলেছেন, "বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি মুসলমান ছাত্রের একরূপ কালস্বরূপ হইয়া দাড়াইয়াছে। ...হিন্দু ছাত্রগণ তাহাদের স্বজাতীয় লোকদিগের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে নানাবিধ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জাতিকে একান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতে শিখিয়া থাকে।'—কোহিনুর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩, পৃঃ ৪৩

২ নবনূর, পৌষ ১৩১০, পৃঃ ৩৫০

৩ ঐ, পৃঃ ৩৫০

মিলনের পথে অন্তরায়। তিনি বলেছেন, "যদি তাহা (পরস্পরের মিলন) অসম্ভব হয় তবে কংগ্রেস, কনফারেন্স সবই বৃথা, সবই বালকের ক্রীড়ামাত্র—তাহা দেশের দুই বিভিন্ন জাতির পুরাতন সখ্যভাব সংহার করিয়া শত্রুতা বৃদ্ধি করিবার যন্ত্র বিশেষ মাত্র।"[১]

'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার' প্রবন্ধে 'কেনচিৎ মর্মাহতেন হিতকামনা' ছদ্মনামে জনৈক লেখক বলেন যে, হিন্দু লেখকগণ সাহিত্য ও ইতিহাসে মুসলমান-চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করে মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, 'বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া পুরাতন বৈরী নির্যাতনের বাসনায়' হিন্দুগণ এরূপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সাহিত্যরথী বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুঁটিরাম পর্যন্ত মুসলমান সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎ সমাজকে চির কলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী হইয়াছে এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা?... মুসলমানের নামে কুৎসা রটনা করিতে না পারিলে কি ঐতিহাসিক, কবি বা নাট্যকার হওয়া যায় না?"[২] তিনি হিন্দু লেখকগণের এরূপ মনোভাবকে 'বিষকুম্ভম' বলে চিহ্নিত করেছেন। লেখকের বিক্ষুব্ধ মনে প্রতিকার কল্পনা জেগেছে এভাবে: "সাহিত্য রাজ্যে ঘুসির বদলে ঘুসি যদি আমরাও দিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভারত ইতিহাসে ইসলাম-মস্তকের এমন শোচনীয় চর্বন কদাচ দেখিতে হইত না।"[৩] অবশ্য লেখক হিন্দু-মুসলমানের মিলনই কামনা করেন। তাঁর বক্তব্য, "বস্তুত আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত একতারই আকাঙ্ক্ষা করি, কারণ তদ্ভিন্ন বর্তমান অবস্থায় ভারতের মঙ্গল নাই।"[৪] মনোমোহন গোস্বামী 'শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, "ন্যায়

১ নবনূর, পৌষ ১৩১০ পৃঃ ৩৫৩

২ ঐ, ভাদ্র ১৩১০, পৃঃ ১৬৮

এরূপ প্রতিক্রিয়াজাত আক্রমণাত্মক মনোভাব আরও অনেকের কণ্ঠে শোনা যায়: মোহাম্মদ ইসহাক বলেন, "যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে মুসলমানেরাও পাল্টা গীত গাহিতে আরম্ভ না করিলে আর সমাজের মঙ্গল নাই, দেখিতেছি।"—নবনূর, আষাঢ় ১৩১০, পৃঃ ১১১

ওসমান আলী লিখেছেন, "মানবের হস্তে তুলিকা থাকিলে সিংহের চিত্র এইরূপেই অঙ্কিত হয়। কিন্তু সিংহও লেখনী ধরিতে শিখিয়াছে, একথা যেন স্মরণ থাকে।" —নবনূর, ফাল্গুন ১৩১০, পৃঃ ১২৫

৩ নবনূর, ভাদ্র ১৩১০, পৃঃ ১৭৪

৪ ঐ, পৃঃ ১৭৩

পরায়ণ সর্বধর্ম প্রতিপালক সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে যাঁহারা পুত্রকলত্রবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে মুসলমান অত্যাচারের চিত্র স্থাপন করাও পুস্তকখানির অন্যতম উদ্দেশ্য।......এই গ্রন্থ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষ জ্বালাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে।" আওরঙ্গজেব দুহিতা রোশিনারার সঙ্গে শিবাজীর প্রণয় কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু। ইমদাদুল হক এরূপ উদ্দেশ্যপূর্ণ নাটকটির বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং নাট্যকারের মনোভাবের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'নাটক রচনা স্থলে সাক্ষাৎ ইতিহাসের উপর ক্রিমিনাল এ্যাসালট করিয়া এবং কমনসেন্স মাথাটি চিবাইয়া খাইয়া' 'আপন প্রতিবেশীর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ' করা হয়েছে। নাটকটি অভিনীত হতে দেখে তিনি মন্তব্য করেন, "আমাদিগেরই সম সুখদুঃখভোগী হিন্দুগণ আজ ঘরের পয়সা খরচ করিয়া সানন্দে প্রতিবেশী ঘৃণাবিদ্বেষ ক্রয় করিতেছেন।"[১] গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে ক্ষীরোদ প্রসাদ রচিত 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) অভিনয় দেখেও ইমদাদুল হকের মনে প্রতিক্রিয়া হয়। নাটকে মৌলভী তোরাপ ও সুবেদার শের খাঁর চরিত্রকে হীন করে আঁকা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে মুসলমান সমাজকে হেয় করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন যে, হীন বা খল চরিত্র মুসলমান সমাজে থাকতে পারে এবং তাতে মুসলমানের ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়, ক্ষোভের কারণ তখনই দাঁড়ায় যখন ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করে সমাজের আদর্শকে ছোট করা হয়। তাঁর বক্তব্য, 'একের হীন আদর্শ শুধু অন্যের আদর্শের উচ্চতা প্রদর্শন করিবার জন্যই অঙ্কিত' হলে সেখানে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। তিনি উভয়ের মধ্যে মিলনের আশা কামনা করে বলেছেন, "যখন এত বড় বড় রাজনৈতিক বজ্র আমাদের উভয়ের মাথার উপর পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তখন আমাদের যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্ধিত হয়, তজ্জন্য অতীত ইতিহাসের ভাল অংশের যথাসাধ্য আলোচনা করা এবং উভয়ের জাতীয় ও সামাজিক আদর্শ যাহাতে উভয়ের নিকট যথারীতি সম্মান লাভ করিতে পারে তাহার উপর বিধান করা কি কর্তব্য নহে?"[২] ওসমান আলী কোহিনুরে 'হিন্দু মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' শিরোনামে মোট চার সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মগত ও জাতিগত পার্থক্য ছাড়াও 'ইংরাজজাতির ভেদনীতি' ও 'হিন্দুর জাতীয়তার পুনরুত্থান'কে বিরোধ সৃষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গ্রামের সাধারণ

১ নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃঃ ৭২
২ ঐ, আশ্বিন ১৩১২, পৃঃ ২৬৮

মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই, বিরোধের জন্মদাতা শহরের শিক্ষিত মানুষেরা। তিনি বলেন যে, হিন্দু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ ইংরাজের লিখিত পুস্তক থেকে তথ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন, তাঁরা তথ্যের সত্যাসত্য বিচার করে দেখেন না। ফলে তাঁদের হাতে মুসলমানরা "দুর্দান্ত, নৃশংস অত্যাচারী, জাতিধর্মনাশকারী, দুরন্ত যবন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতে লাগিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ প্রথমে ধূমায়িত হইয়া পরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।"[১]

সাহিত্যের রাজ্যে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, তা কোন কোন উদারচেতা ও সমন্বয়বাদী হিন্দু লেখকও স্বীকার করেছেন। কেবল সাহিত্যের রাজ্যে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা বিভেদের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় নির্ধারণ করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মনে করেন 'প্রভুশক্তির অপব্যবহার' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব' হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে। হিন্দু রচিত সাহিত্যে কেন মুসলমান চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে, তার জবাবে তিনি ঐরূপ যুক্তি দেখান।[২] তিনি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কামনা করেন না, তিনি সমন্বয় কামনা করেন। তিনি বলেন, "আজ আমরা নিরীহ প্রতিবেশী গলায় গলায় ধরিয়া পরস্পরের দুঃখ-সুখ বাঁটিয়া লইবার অবস্থায় আসিয়াছি, হিন্দু মুসলমান পুরাতন আগুন উস্কাইয়া তুলিতে গেলে নিজেরাই জ্বলিয়া মরিব। আমাদের যে সময়, তাহাতে কেহ কাহারও তীব্র আক্রমণ করা নিতান্ত অন্যায়। কেবল বন্ধুর মত, সংযত আলোচনায় পরস্পরের ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই কর্তব্য।"[৩] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ 'প্রীতির অভাব'। এর জন্য তিনি স্বসমাজকে দোষারোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদিগের প্রতি এখনও প্রাণমন খুলিয়া ভালবাসা জানাইতে শিখে নাই;

১ কোহিনুর, মাঘ ১৩১০, পৃঃ ২৩১

২ অতীতের তিক্ত স্মৃতির প্রতিক্রিয়া থেকে হিন্দু লেখকগণ গল্প-উপন্যাস-নাটকে মুসলমানকে আক্রমণ করেন বলে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা 'বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, "গত সময় হিন্দু ললনাগণ মুসলমানের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিলেন বলিয়া বর্তমান সময়ে শিক্ষানবিশ হিন্দু লেখকগণ আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিতেন এবং তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে এইরূপ নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি।" নবনূর, কার্তিক ১৩১১, পৃঃ ৩১১। মজুমদার বাবু কথিত, 'প্রভুশক্তির অপব্যবহারে'র এটি একটি নমুনা ছিল।

৩ নবনূর, আষাঢ় ১৩১০, পৃঃ ৮৮-৮৯

মুসলমান সমাজও কাজে বাজেই ততটা মিশামিশি করেন না। ভালবাসার বদলে ভালবাসা মিলে।"[১] তিনি ধর্মভেদকে 'একতার অসম্ভব' ঘটাবার কারণ বলে মনে করেন না; তিনি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিদ্বেষকে অহেতুক বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি উভয়ের সম্প্রীতি কামনা করে বলেছেন, "অতীত কাহিনীর পুনরুল্লেখ দ্বারা ঈর্ষা ও দ্বেষের সৃষ্টি করিতে যাঁহারা প্রয়াসী তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই সমাজের বিপ্লবকারী ও দেশের শত্রু।...উভয়ের মধ্য হইতে মনোমালিন্যের কালো মেঘটুকু দূরীভূত হইয়া গেলেই স্বদেশহিতৈষী ইউনিটেড ইণ্ডিয়ার সুখ স্বপ্ন ফলিবে।"[২] রামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন, "বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতদ্বৈধই আমাদের মধ্যে অসদ্ভাবের মধ্যে প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।"[৩] কংগ্রেস ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান; কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে মুসলমান সমাজে মতদ্বৈত ছিল, মুসলমানরা কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন, এজন্য এই মত-দ্বৈততা। রামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন, "হিন্দু লেখকগণ অনেক সময় মুসলমানের অযথা নিন্দা করিয়া লেখনির অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চারিদিকে বিদ্বেষের আগুন আপনাদিগকে উত্তাপিত করিতেছে, ইহা প্রেমের বারিসিঞ্চনে নির্বাপিত করিতে হইবে। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ইহা আমার 'জীবন-স্বপ্ন।"[৪] নির্মলচন্দ্র ঘোষের ধারণা হল, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সৃষ্টির মূল কারণের মধ্যে 'প্রধান কারণ অস্মদেশীয় এক শ্রেণীর গ্রন্থকার।' তিনি বলেছেন, "সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে মধু ধারার সহিত এমন এক বিষধারা চালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে কতিপয় নিমগ্রাহী শিষ্য মুসলমানদ্বেষে অন্ধ হইয়া নির্ভয়ে ইতিহাসের সোনার অঙ্গে পদাঘাত করিতেছেন।...গুরুদেব কেবল উপন্যাস রচনা করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, শিষ্যসমাজের উপন্যাস ত আছেই আছে, তাহা ছাড়া তাঁহারা 'ঐতিহাসিকতত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক আবিষ্কার', 'ঐতিহাসিক চিত্রোদ্ধার' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাম দিয়া কল্পিত উপন্যাসে মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন।...এ সময় সুফলপ্রসূ তরুর অঙ্কুরকালে ঐ সকল লেখকের বিদ্বেষবহ্নি বিবেকবারিতে সুশীতল হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়।"[৫] ধর্মগত, প্রকৃতিগত ও ভাবগত

১ নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১, পৃঃ ১৭৭
২ ঐ, পৃঃ ১৭৮
৩ ঐ, আশ্বিন ১৩১০, পৃঃ ২৩৬
৪ ঐ, পৃঃ ৩৫-৩৭
৫ ঐ, মাঘ ১৩২০, পৃঃ ৩৬৯

পার্থক্যের জন্যই হিন্দু-মুসলমানের মিলন ব্যাহত হচ্ছে বলে জীবেন্দ্রকুমার দত্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, আকাঙ্ক্ষিত মিলনের জন্য পরস্পরকে কিছু স্বার্থ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। উভয়ের রাজনৈতিক স্বার্থ এক—স্বাধিকার অর্জন ও ঔপনিবেশিক শোষণ রোধ। এক্ষেত্রে উভয়ের দায়িত্ব সমান, এ দায়িত্ব সম্পাদন মিলনেই সম্ভব, সংঘর্ষে নয়।[১]

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে মন্তব্য করেন, "বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দাই তাহা সমালোচক কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোন সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।"[২] অনুমান ফলতে দেরী হয়নি। 'সাহিত্য-রাজ্যে ঘুসির বদলে ঘুসি' শুরু হয়। খুব সম্ভব, আর্জুমন্দ আলীর 'প্রেমদর্পণে' (১৮৯৯) সর্বপ্রথম মুসলমান যুবককে নায়ক ও হিন্দু-বালিকাকে নায়িকা করে সামাজিক উপন্যাস লেখা হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরীর বার্ষিক রিপোর্টে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, "হিন্দু যোদ্ধাগণের সঙ্গে মুসলমান যুবতীর প্রেম নিয়ে হিন্দু লেখকগণ দীর্ঘ দিন যাবৎ উপন্যাস লেখার সুবিধা পেয়ে আসছেন। এখন মুসলমান লেখকগণ মুসলমান ভদ্র সন্তানের সহিত হিন্দু যুবতীর প্রেম ও ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে উপন্যাস লিখেছেন। আর্জুমন্দ আলীর 'প্রেমদর্পণ' এরূপ একটি দৃষ্টান্ত।"[৩] হিন্দু লেখকের বিভিন্ন রচনা নিয়ে 'নবনূরে' যখন বাদানুবাদ চলছিল তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী 'বিমলা' নামে ছোটগল্প লেখেন; এতে হিন্দু বালিকা ও মুসলমান যুবকের প্রণয় চিত্র আছে। দীনেশচন্দ্র সেন 'মিহির ও সুধাকরে' একটি চিঠির মাধ্যমে 'বিমলা' গল্প সম্পর্কে আপত্তি তোলেন এই বলে যে, এতে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাকে অপমান করা হয়েছে।[৪] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিবাদে ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'রায়নন্দিনী' (১৯১৫) ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তিনি 'উপক্রমণিকা'য় স্বীকার করেছেন, "বাঙ্গালী লেখকগণ তাঁহাদের মোসলেম কুৎসাপূর্ণ উপন্যাসগুলির পরিবর্তন করিয়া সুমতির পরিচয় দিবেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানের বীর্যপুষ্ট

১ নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১১, পৃঃ ৭৪-৭৫

২ ভারতী, কার্তিক ১৩০৭, পৃঃ ৬২৩-২৪

৩ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত—প্রেমদর্পণ, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃঃ ।০ (ভূমিকা)।

৪ মিহির ও সুধাকর, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০

গৌরব বিমণ্ডিত আদর্শ-চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টিত হইবেন।"[১] তাঁর 'তারাবাঈ', 'নূরউদ্দীন' (১৯২৩) উপন্যাসেও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

গো-হত্যা

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিভেদের কতগুলি কারণ আছে, সেগুলির মধ্যে গো-হত্যার ও গো-রক্ষার সমস্যাটি ছিল সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং সবচেয়ে মারাত্মক। গো-হত্যা নিয়ে দাঙ্গা, খুন, মোকদ্দমা সবই সংঘটিত হয়েছে। মুসলমানরা গো-হত্যা করে ও গো-মাংস ভক্ষণ করে। তারা 'ঈদুল আজহা' বা কোরবানি উৎসবে ছাগ, মেষ, মহিষ, উট, দুম্বার সঙ্গে গরুও কোরবান করে।[২] এটি ধর্মপালনের অঙ্গ; তবে ধর্মোৎসব ছাড়াও বিবাহাদি সামাজিক উৎসবে এবং উৎসব ব্যতিরেকে গো-মাংস ভক্ষণ উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা গরু হত্যা করে থাকে। এদিকে হিন্দুগণ গরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, সেই সূত্রে তাদের কাছে গো-হত্যা মহাপাপ।[৩] দুই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধধর্মী ধর্মনীতির কারণে গো-হত্যা ও গো-রক্ষা নিয়ে সহজেই কলহ-বিবাদ বেধেছে। এ সমস্যাটি ভারতব্যাপী ছড়িয়ে ছিল। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গো-হত্যা নিবারণী সভা' স্থাপন করে গো-রক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন। সভার সদস্য ভ্রাম্যমান সাধুগণ বক্তৃতা, পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র প্রভৃতির সাহায্যে গো-রক্ষার আদর্শ প্রচার করতেন। এক সময় ভারতীয় কংগ্রেসকে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়ান হয়। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজের বার্ষিক অধিবেশনে রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার শশিশেখর রায় গো-হত্যা বন্ধের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৯১ সালে নাগপুরের অধিবেশনে গো-রক্ষিণী সভার সদস্যগণ কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে সভা

---

১ শিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড), পৃঃ ৫

২ 'কোরবান' (∠ আরবী কুর্বান) শব্দের অর্থ উৎসর্গ; হজরত ইব্রাহিম ঈশ্বরের নিকট স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিজ পুত্র ইসমাইলকে উপাস্যের নামে কোরবান করতে উদ্যত হলে ঈশ্বরের মহিমায় তার প্রাণ রক্ষা পায়, ইসমাইলের পরিবর্তে দুম্বা জবেহ হয়। সেই ঘটনার পর থেকে কোরবানির রীতি চলে আসছে: হজরত মহম্মদ একে ইসলাম ধর্মের অঙ্গীভূত করেন।

৩ বেদে বা উপনিষদে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নয়। প্রাচীন আর্য সমাজে গোমাংস দ্বারা অতিথি আপ্যায়নের রীতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে গোহত্যা ও গোমাংস নিষিদ্ধ নয়। পুরাণে আছে, পৃথু বা বিশ্বপতির নির্দেশে পৃথিবীর ছদ্মরূপ ধারিণী গাভী নিজ দুগ্ধে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করেন, এজন্য বিশ্বমাতা ও গোমাতা অভিন্না। ঐরূপ বিশ্বাস থেকে গরু দেবতারূপে পূজ্য হয়ে আসছে।

করার ও চাঁদা তোলার অনুমতি পান।[১] গো-রক্ষিণী সভার ফরিদপুর শাখার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য 'কসাই-এর গো-হত্যা' শিরোনামে প্রচারপত্র বিলি করে জনমত তৈরি করেন। প্রচারপত্রে হিন্দু জনসাধারণকে হাটে-বাজারে মুসলমান কসাই-এর কাছে গরু বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়, ঐ সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের নিজ নিজ জমিদারীতে গো-হত্যা বন্ধ করার আবেদন জানান হয়। ফরিদপুরের 'আঞ্জুমনে ইসলাম' মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করে জেলা-প্রশাসকের কাছে আবেদন পত্র প্রেরণ করে। ঐ আবেদনপত্রে বলা হয় যে, গো-হত্যার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষ বাধে; বিহার ও উত্তর প্রদেশে এ নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে; পূর্ববঙ্গে পূর্বে কোন বিবাদ ছিল না, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রচারণার ফলে হিন্দুগণ গো-হত্যা বন্ধ করতে বদ্ধ পরিকর। মুসলমানেরা এটি মেনে নিতে পারে না, ফলে শান্তি বিঘ্ন হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। জেলা-প্রশাসক যাতে ঐরূপ প্রচারণা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন, ঐ পত্রে তার আবেদন জানান হয়েছে।[২]

গোরক্ষিণী সভার পরেই জমিদারদের স্থান। অনেক জমিদার মুসলমান প্রজাদের ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানি অথবা বিবাহ উপলক্ষে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ আত্মকথায় ('আমার সংসার জীবন') লিখেছেন, "গোবিন্দপুর, হরিশঙ্করপুর, সনাতনী, গোপীনগর, আমলা, গোসাঞী পুকুর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম একজন প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত বড় হিন্দু-জমিদারের জমিদারীভুক্ত; সেখানকার মুসলমানগণ বহুকাল অবধি গরু কোরবানী করিতে বা গরু জবে ও উহার মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না। কেহ করিলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। জমিদার কাছারীর দুর্দান্ত হিন্দু নায়েবগণ কোরবানীদাতা ও গরুহত্যাকারীকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার ও নানা প্রকার অপমান করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিত। সুতরাং তাহাদের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল হইতে গো-কোরবানী প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল।"[৩] তিনি আরও বলেছেন, হিন্দু প্রজাগণ এ ব্যাপারে জমিদারকে সমর্থন দিত। তিনি বলেন, সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে মুসলমানগণ পরিশেষে সাবধানতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে গো-কোরবানের সুবিধা পায়। 'মোসলেম ক্রনিকলে' একাধিক সংখ্যায় গো-হত্যা সমস্যার সংবাদ প্রকাশ করা হয়। ১৭ মার্চ ১৮৯৫ সালে

১ *Muslim Community in Bengal,* p. 199

২ *The Moslem Chronicle,* 4 April 1895, p. 138

৩ **ইসলাম-প্রচারক, ৮বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১৩১৪, পৃ: ২৭৫**

লেখা হয়, রাজশাহী বিভাগের খোকসার অন্তর্ভুক্ত পানানগর ও অন্যান্য গ্রামের মুসলমানদের প্রতি গো-হত্যার জন্য দুর্ব্যবহার করা হয়। কমিশনারের রিপোর্টে ঐরূপ গো-হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণে জমিদারের হস্তক্ষেপের উল্লেখ আছে।[১] ময়মনসিংহের অম্বরিয়া, মুক্তাগাছা ও সন্তোষের জমিদারগণ কয়েকজন গ্রামবাসীকে গো-কোরবানীর জন্য জরিমানা করেছিলেন।[২] ১৩০২ সনের ৫ জ্যৈষ্ঠ মিহির ও সুধাকর 'গরুজবাই' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদে বলা হয় যে, চাঁদপুরের কতিপয় মুসলমান ঈদ উপলক্ষে গরু কোরবান দিলে গোপালচন্দ্র মজুমদার নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী নালিশ করেন; প্রকাশ্য রাস্তায় গরু জবাই করেছে এবং বদ্ধ জলে মাংস ধৌত করে জল অপবিত্র করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনা হয়। জেলা-হাকিম জগদীশচন্দ্র সেন সরজমিনে তদন্ত না করে একজনকে এক মাস কারাদণ্ড, একজনকে ৫০৲ টাকা ও অপরজনকে ১৫৲ টাকা অর্থদণ্ড করেন।[৩]

সাহিত্যের ক্ষেত্রে গো-হত্যা সমস্যা সবচেয়ে গুরুত্ব পায় টাঙ্গাইলের 'আহমদী'তে (১ শ্রাবণ ১২৯৫) প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। মশাররফ হোসেন ছিলেন উদারপন্থী এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সমন্বয়বাদী। তিনি প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, "ভারতের অনেক গো-বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভাসমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গালা সংবাদপত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধে সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।"[৪] গো-হত্যা উভয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরায় বলে তিনি মুসলমানদের গো-কোরবানি বন্ধ ও গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করতে বলেন। তিনি বলেছেন, "এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক—সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই,

১ *The Moslem Chronicle*, 17 March 1895, p. 16
২ *Ibid*, 20 May 1895, p. 235
৩ *Ibid*, 16 May 1896, p. 224
৪ মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৩১৫

রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?"[১] টাঙ্গাইলের অপর পত্রিকা 'আখবারে এসলামীয়া' মশাররফ হোসেনের বক্তব্যের প্রথম প্রতিবাদ করে; পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন ছিলেন গোঁড়াপন্থী। তিনি ধর্ম সভায় বক্তৃতার ও পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে মশাররফের প্রতিবাদ করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'আখবারে এসলামীয়া'য় (শ্রাবণ ১২৯৫) প্রথম প্রতিবাদ হয় জনৈক ব্যক্তির প্রেরিত একটি পত্রে।[২] পত্রে ২১টি পরিচ্ছেদে মশাররফের যুক্তি খণ্ডন করা হয়। পত্র শেষে উপদেশ দিয়ে বলা হয়, "সমাজের গ্রন্থি অতিশয় দৃঢ়, একটুক সাবধান হইয়া লিখনি ধরিবেন; সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। উপসংহারকালে একটি হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনি তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে আপনার মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই।"[৩] দ্বিতীয় প্রস্তাব 'গোধন কি সামান্য ধন'-এ (শ্রাবণ ১২৯৫) মশাররফ হোসেন বলেন, "মোসলমান শাস্ত্রে গোজাতির গুণের ব্যাখ্যা নাই—সুতরাং সাধারণ পশুর মধ্যে পরিগণিত।... অত্রস্থ কোন মোলবী মহাশয়ের কথার আভাসে বুঝিয়াছি যে, ঐ কথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোন কথা নাই। ঐ কথাটুকু আশ্রয় করিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধ্য। ...কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভাসমিতির ভয়ে, এ অত্যাচার, অন্যায়াচার, হৃদয় বিদারক, মর্মাহত ভীষণ ব্যাপার স্বরূপ গো-হত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধমের লিখনি ক্ষান্ত হইবে না।"[৪] 'আহমদী'র সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী মশাররফের সমর্থনে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। ২ ভাদ্র, ১২৯৫ তারিখে টাঙ্গাইলে ধর্মসভা হয়, সেখানে টাঙ্গাইলের অবৈতনিক কাজী ও নঈমুদ্দীনের সহযোগী মৌলবী সুলতান আহমদ "মোসলমান ধর্মসভার সভ্যগণের সম্মুখে গোকুল নির্মূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখককে (মশাররফকে) 'কাফের' এবং 'স্ত্রী হারাম' হওয়া সাব্যস্ত করিয়া উপস্থিত

১ মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৩১৯

২ সম্পাদক মন্তব্য করেন, "আহমদীতে গোকুল নির্মূল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না। আল্লা চাহে এ সম্বন্ধে পৃথকরূপে লিখিব, এবার এসলামীয়ার একটি প্রিয় বন্ধুর প্রেরিত প্রবন্ধটা প্রকাশ করিলাম।"—মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৩৩৯-৪০

৩ ঐ, পৃঃ ৩৪৯-৫০

৪ ঐ, পৃঃ ৩২৮

সভ্যগণকে বুঝাইয়া সমস্ত ব্যক্ত করেন।"[১] মোহাম্মদ নইমুদ্দীন 'ভারতে গোবধ' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে মশাররফ হোসেন ও আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর লেখার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি গো-হত্যা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে গবর্নমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন। সরল মনে বন্ধুভাবে একথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায়, আইন কানূন ও জোরজবরদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়। ওরূপ কথা শুনিলে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কারণই—আর কিছুই নহে।"[২] তিনি ধর্মসভার প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, "এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি (মশাররফ) খোদাতালার সত্য-ধর্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করতঃ নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন।"[৩] তাঁর অপর বক্তব্যে প্রাণনাশের হুমকি আছে, "এসলামী ধর্ম বিগর্হিত অন্যায় কথা শুনিয়া কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে? ...অধিক কি বলিব ধর্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে ইহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল।"[৪] 'কাফের' এবং 'স্ত্রী হারাম' এরূপ ফতোয়ার বিরুদ্ধে মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের মুন্সেফ আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেন। 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা', 'গোধন কি সামান্য ধন', 'গোমাংস' ও 'গোদুগ্ধ' প্রবন্ধ চতুষ্টয় এবং 'আখবারে এসলামীয়া'র প্রকাশিত একটি প্রতিবাদপত্র ও একটি প্রবন্ধ একত্র করে মশাররফ হোসেন 'গোজীবন' (১৫ ফাল্গুন ১২৯৫) প্রকাশ করেন। তিনি এলাহাবাদের 'গোরক্ষিনী সভা' হতে লিখিত শ্রী শ্রীমান স্বামীর একটি পত্র (১০ জানুয়ারী ১৮৮৯) 'সাধারণের বিদিতার্থে গো-জীবনের মুখবন্ধ স্বরূপ' গ্রন্থের পুরোভাগে প্রকাশ করেন। শ্রীমান স্বামী এলাহাবাদস্থিত 'কাও মেমোরিয়াল ফাণ্ডে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পত্রটি এরূপ : "মহাশয়। আপনার ২১শে পৌষ তারিখের পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সুখলাভ করিলাম। আপনার প্রস্তাবগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে আমার নিকট পাঠাইয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনার 'গো-মাংস' বিষয়ক প্রস্তাবটি

১ মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৩৬৭
২ ঐ, পৃঃ ৩৫২
৩ ঐ, পৃঃ ৩৫৫
৪ ঐ, পৃঃ ৩৫৬

যাহা শীঘ্রই প্রেরণ করিবেন লিখিয়াছেন পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইব। মহাশয়ের ন্যায় সজ্জান লোকের দ্বারা দেশের যথেষ্ট উপকার হইতেছে, তাহা আমার মত ক্ষুদ্রজনের বলা বাহুল্য মাত্র। ভরসা করি আপনি মধ্যে মধ্যে গো-হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়া আমার উপদেশকের পদ গ্রহণ করিবেন।"[১] গ্রন্থের শেষে মোশাররফ হোসেন বলেন, "দয়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো-জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দু এবং হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্র ধাম মক্কা মোয়াজ্জামায়, পুণ্যক্ষেত্র বোগদাদে, মোসলমান রাজ-প্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লীতে এবং আজমীর শরিফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী, মৌলানা, মহামতীগণের মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সত্বর হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে।"[২] গো-জীবনের 'দুই হাজার কাপী বিনামূল্যে বিতরিত হইবে' বলে ঘোষণা করা হয়।

সম্ভবতঃ 'গো-জীবনে'র এসব বক্তব্য গো-হত্যার সমর্থকগণের শিরঃপীড়া আরও বৃদ্ধি করে। টাঙ্গাইলের সীমানা ছাড়িয়ে এ দ্বন্দ্ব ঢাকা, কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপ্ত হবে পড়ে। কলিকাতার 'সুধাকর' সাপ্তাহিক (১৮৮৯) 'আখবারে এসলামীয়া'কে সমর্থন দিয়ে প্রচার আরম্ভ করে। সুধাকরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শেখ আবদুল রহিম ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। রেয়াজুদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক। তিনি অল্পকথায় লিখেছেন, "যখন প্রধান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন সাহেব 'গো-জীবন' নামক পুস্তক লিখিয়া মুসলমানদিগের গো-মাংস ভক্ষণ ও গো-কোরবাণীর বিরুদ্ধে অন্যায় দোষারোপপূর্বক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তদুত্তরে অন্যতম সাহিত্যিক ও ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা 'আখবারে এসলামীয়া'র সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীন সাহেব এরূপ গ্রন্থ লেখক মুসলমানের উপর কাফেরী ফৎওয়া দিয়া 'আখবারে এসলামীয়া'য় উহা প্রকাশ করেন এবং মীর সাহেব মৌলবী সাহেবের নামে মানহানির মামলা দায়ের করেন, তখন আমরা 'সুধাকরে' অবশ্যই মৌলবী সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী সাহেবও এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া ধর্মের পবিত্র মর্যাদা রক্ষা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।"[৩] 'সুধাকরে' বিভিন্ন স্থানের সভাসমিতির

১ মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৩৭৯

২ ঐ, পৃঃ ৩৬৯

৩ আবদুল কাদির—মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬, পঃ ৪৫

বক্তব্য ও প্রেরিতপত্র ছাপা হত। টাঙ্গাইলের মামলার বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা হয়, এমন কি 'অতিরিক্ত পত্রে' কলিকাতা-হুগলী মাদ্রাসার মৌলবীদিগের সাক্ষ্য ও মতামত ছাপা হয়।[১]

ঢাকার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঢাকা মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক ওয়ারেস আলী সুধাকরে একটি পত্র (৯ নভেম্বর ১৮৮৯) প্রেরণ করেন। তিনি ঐ পত্রে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় মুসলমান ছাত্রদের একটি বিরাট সভা এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিবরণ দেন। তাঁর মতে সভাটি হয় মৌলবী নইমুদ্দীনের প্রতি সহানুভূতি জানাবার উদ্দেশ্যে। নইমুদ্দীন তখন টাঙ্গাইলের মুন্সেফ কোর্টে মানহানির মামলায় জড়িত ছিলেন। ঢাকা কলেজ, মাদ্রাসা, পোগোজ, জুবিলী, জগন্নাথ ইনস্টিটিউশন, সার্ভে, মেডিকেল ও নর্মাল স্কুল এবং মক্তব ও পাঠশালার ছাত্রগণ সভায় যোগদান করে। মাদ্রাসার অধ্যাপক আবুল ওফা, শিক্ষক হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বিএ অলিওর রহমান বিএ, জহিরুল হক, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক আহমদ বিএ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার আরবী অধ্যাপক মৌলবী হাফেজ আবদুল্লা সভাপতিত্ব করেন। পত্রলেখকের ভাষায় সভাপতির একটি বক্তব্য ছিল এরূপ: "কোন মুসলমান নামধারী যদি ছলচক্রে বিধর্মীর মনস্তুষ্টি ও বন্ধুতাপ্রার্থী হইয়া এসলামধর্মের বিরুদ্ধে কূট অসি সঞ্চালন করে, তদবস্থায় স্বধর্মানুরাগী প্রকৃত বিশ্বাসী কোন মহোদয় যদি এসলামধর্ম রক্ষার্থী হইয়া বিপদগ্রস্ত হন, তবে সে বিপদ যে জাতীয় এবং ঐ বিপদমুক্তির জন্য সাহায্য করা যে সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য, ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।"[২] "গো-জীবনের প্রতি মৌলবী নইমউদ্দীন সাহেব সরাসঙ্গতরূপে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন অত্রসভা সেই সকল প্রতিবাদ যথার্থ ও শাস্ত্রীয় বলিয়া সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে।"—এটি ছিল সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাব।[৩]

'সুধাকরে'র ১২৯৬ সনের ২২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কুমিল্লার প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পরিবেশন করে বলা হয় যে, কুমিল্লার জমিদার মুন্সী আলি করিমের গৃহে একটি সভা হয়, আশরফউদ্দীন আহমদ সভাপতি হন। নইমুদ্দীন সাহেবের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সভার প্রস্তাবে নইমুদ্দীন সাহেবকে সহানুভূতি ও সমর্থন জানান হয়।[৪] নোয়াখালীর মুসলমান প্রেরিত

১ সুধাকর, ৬ ও ১৩ পৌষ ১২৯৬

২ ঐ, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৬, পৃ: ১৯

৩ ঐ, ২২ অগ্রহায়ণ ১২৯৬, পৃ: ৩৫

৪ ঐ, ১৩ পৌষ ১২৯৬, পৃ: ৬৩

একটি পত্রে (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৯) 'নোয়াখালী এসলামীয়া সভা'র ১ ডিসেম্বর (১৮৮৯) অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনের বিবরণ সুধাকরে প্রকাশিত হয়। সভায় মৌলবী নইমুদ্দীনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং তাঁর সাহায্যার্থে প্রয়োজনবোধে চাঁদা প্রদানের প্রস্তাব নেওয়া হয়। গোবধ নিবারণ আন্দোলনের অযৌক্তিকতা দেখিয়ে মুন্সী ওছাজুদ্দীন আহমদ যে প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেটি সভার ব্যয়ে পুস্তকাকারে ছাপিয়ে চার হাজার কপি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১] কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' মীর মশাররফ হোসেনকে সমর্থন দিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ২০ পৌষ ১২৯৬ সন সুলভ সমাচার এরূপ একটি লেখায় মীরের উদারতা ও সুযুক্তির প্রশংসা করে। 'সুধাকর' সমাচারের 'অনধিকারচর্চা'র প্রতিবাদ করে।[২]

মশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের মামলায় পরস্পরের অভিযোগগুলি যাচাই করার জন্য আদালত একটি কমিশনের মাধ্যমে মোট ৩১টি প্রশ্নমালা তৈরি করে ৫ জন বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করেন। 'সুধাকর' ১২৯৬ সনের ৬ ও ১৩ পৌষ অতিরিক্ত পত্রে ঐ মতামত প্রকাশ করে। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মৌলবী আবুল খায়ের, হুগলী মাদ্রাসার প্রধান মদারেস গোলাম সলমানী, ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, ঢাকা কলেজের আরবী ও ফারসীর অধ্যাপক আবদুল মনায়েম এবং মাদ্রাসা আলিয়ার তৃতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ এসমাইল লিখিত ভাবে তাঁদের মতামত জানিয়ে ঐ প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। পত্রিকার ভাষায় কয়েকটি প্রশ্ন ছিল এরূপ[৩]:

০ 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাব যাহা বিগত ১২৯৫ সনে টাঙ্গাইলে 'আহমদী' পত্রিকায় তৎপর আখবারে এসলামীয়ায়, তৎপর 'গো-জীবনে', তৎপর 'গো-কাণ্ডে' প্রকাশ হইয়াছে উহা আপনি দেখিয়াছেন কিনা, যদি না দেখিয়া থাকেন তবে অত্রসহ যে গো-জীবন পাঠান হইল তাহা পাঠ করুন।(১)

১ সুধাকর, ১৩ পৌষ ১২৯৬, পৃঃ ৩৫

২ ঐ, ২৭ পৌষ ১২৯৬, পৃঃ ৭৯

৩ গোজীবনের শেষ দিকে মশাররফ হোসেন লিখেন, "এইক্ষণে লিখক এসলামীয়া সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীন ও তাঁহার বহুরূপী বন্ধু এবং অবৈতনিক কাজী সুলতান আহমদ খাঁ সাহেবকে এতদ্বারা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাঁহার গো-জীবনের কোন ২ প্রস্তাবের কোন ২ শব্দে লিখককে কাফের ও তাঁহার স্ত্রী হারাম হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই

০ ঐ 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাব সকল মুসলমানী ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ও মুসলমান সমাজের অহিত অনিষ্টকর হইয়াছে কিনা? (২)

০ ঐ প্রবন্ধ সকলের স্থানে স্থানে মুসলমানী ধর্মকে এস্তেহজা (বিদ্রূপ ও নিন্দা) এবং কোরানের হুকুমকে রদ্দ করা হইয়াছে কিনা? (৩)

০ ঐ 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাবে মুসলমান সমাজের মনে আঘাত লাগিয়াছে কিনা? (৪)

০ উক্ত 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধের প্রতিবাদে মুসলমানী ধর্মের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করা ও মুসলমান সমাজের হিতার্থে উহা প্রচার করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য কার্য্য কিনা? (৭)

০ মুসলমানী ধর্ম্ম বিরুদ্ধ প্রস্তাব শুনিয়া ধর্মের ও সমাজের হিতার্থে উহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকিলে মুসলমান আলেমগণ পাপী হইবেন কিনা? (৮)

০ উক্ত 'গোকুল নির্ম্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাবে বরাহ খাইলে নরক জাহান্নাম, তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে একথা কোরানে আছে কিনা? না থাকিলে কোরানের প্রতি এফতেরা (অপবাদ) করা হইয়াছে কিনা? (১১)

টাঙ্গাইলের উক্ত মামলা শেষ পর্যন্ত আপোষে নিষ্পত্তি হয়। মশাররফ হোসেন গো-জীবনের আর মুদ্রণ করবেন না এবং মুদ্রিত সংখ্যাগুলি প্রচারে বিরত হবেন, এরূপ শর্তে নিষ্পত্তি হয়।

মোশাররফ-নইমুদ্দীনের মামলার নিষ্পত্তি হলেও গো-হত্যা সমস্যা দূরীভূত হয়নি; বাদ-প্রতিবাদমূলক বই-পুস্তক রচনাধারা অব্যাহত থাকে। 'গো-জীবনে'র পর গো-হত্যা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত নিম্নের বইগুলি উল্লেখযোগ্য:

গো-কাণ্ড (১৮৮৯)—মোহাম্মদ নইমুদ্দীন
অগ্নি-কুক্কুট (১৮৯০)—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী
গোবধে আপত্তি কেন (১৯০০)—ওহাজুদ্দীন আহমদ

২ স্থানে সেই ২ শব্দ বা উক্তি বিশেষ রূপে নির্দিষ্ট করিয়া অদ্য হইতে (২৫ ফাল্গুন ১২৯৫) ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখকের প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মুন্সেফী আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় নিকট প্রেরণ করুন এবং এসলামীয়া পত্রিকায় প্রকাশ করুন।" সম্ভবতঃ ঐ প্রশ্নমালা মশাররফের উক্তি ও নইমুদ্দীন প্রমুখের আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে রচিত হয়।

গোকুল নির্মূল আশঙ্কায় ভারতবাসীর নিকট ফকীর দীন মোহাম্মদের আবেদন (১৯০৪)—দীন মোহাম্মদ

কলিকাতার গো-কোরবানী হাঙ্গামা (১৯১১)—ঐ।

এগুলির মধ্যে 'অগ্নিকুক্কুটে'র লেখক রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী সুধাকরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন; কমিশনের প্রশ্নমালার উত্তরদাতাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন। অগ্নিকুক্কুটের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সুধাকরে লেখা হয়, "গরু কোরবানী ও গো-মাংসভক্ষণ মোসলমানের সামাজিক কার্য, উহা লইয়া হিন্দুগণ মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার করেন, তাহার কারণ কি এবং সে অত্যাচার নিবারণের উপায় কি, তৎসমুদয় এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। ইহার প্রথম অংশে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ, দ্বিতীয় অংশে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ ও তৃতীয় ভাগে হিন্দুদিগের বেদ-সংহিতার ভুরিভুরি প্রমাণে পরিপূর্ণ।"[১] পূর্ববঙ্গের কোন কোন জমিদার মুসলমান প্রজাদের গো-হত্যায় বাধা দেন এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তিনি সরকারের কাছে একটি 'তদন্ত কমিশনে'র দাবী করেছেন যাতে কৃষকেরা এরূপ বাধা ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়।[২] মশাররফের 'গো-জীবন'কে লক্ষ্য করেই দীন মোহাম্মদ প্রথম গ্রন্থ লেখেন; দ্বিতীয় গ্রন্থটি কলিকাতার ১৯১১ সালের গো-কোরবানী উপলক্ষে হাঙ্গামার ঘটনা নিয়ে রচিত। সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেহেরুল্লার 'শ্লোকমালা', ফজলুর রহমানের 'গো-কোরবানী' মোহাম্মদ মোহসেনুল্লাহর 'রুধির স্রোত', আইনুল ইসলাম খোন্দকারের 'গরু ও হিন্দু-মুসলমান' (১৯১১) প্রভৃতি গ্রন্থেও উক্ত সমস্যা স্থান পেয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক একটি বহুমাত্রিক সমস্যায় আন্দোলিত হয়েছিল। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের, 'কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিবেশী জনগণের স্বার্থ রক্ষার এবং 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য সম্পর্ক উন্নয়নের কথা প্রচার করেছে। সভ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ ছিল না, কিন্তু সমিতির উদ্যোক্তা ও সভ্য সংখ্যার প্রাধান্য অনুযায়ী সেগুলির কর্মসূচী নিয়ন্ত্রিত হত। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' এবং 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭) নামেও যেমন, তেমনি কামেও

১ সুধাকর, ৩ ফাল্গুন ১২৯৬, পৃঃ ১১৩

২ *Muslim Community in Bengal*, p. 363

আপন আপন সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখতো। ফলে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব, পৃথক স্বার্থ, পৃথক মতিগতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যুগ, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমকালীন সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। মুসলমানের জাত্যাভিমান, হিন্দুর আর্যাভিমান, মুসলমানের প্রভুশক্তির অপব্যবহার, নব্যহিন্দুর ধনগর্ব ও শিক্ষা-অহংকার, মুসলমানের পশ্চাদ-বর্তিতা, হিন্দুর অগ্রগামিতা, মুসলমানের বঞ্চনা, হিন্দুর সুবিধাভোগ, ইংরাজদের 'সুয়োরানী-দুয়োরানী ভেদনীতি', হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়কে উভয়ের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়। গ্রামে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কোন সময় বড় আকারে দেখা দেয়নি, বরং নানাভাবে পরস্পরের স্বার্থে তারা মিলেমিশে বসবাস করেছে। গ্রামের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে পুরুষানুক্রমে যারা একত্রে বাস করেছে, তারা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বিভেদের উৎস আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কোম্পানীর রাজত্বে শহরের দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নের ফলে বিপুলকায় নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা গ্রাম থেকে এলেও ক্রমে পেশায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও সম্পদে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্বাধীন আর্থিক বুনিয়াদ না থাকায় এদের একটি আলাদা শ্রেণী-স্বার্থ দাঁড়িয়ে যায়। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন ধ্বংস হওয়ায় এদেরকে শাসক-শ্রেণীর অনুগ্রহভাজন হয়ে চাকুরীকেই জীবিকার প্রধান উৎস মনে করতে হয়েছে। ক্ষমতালিপ্সু ও উপনিবেশবাদী ইংরাজগণ কখনই নিজ স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে এদেশের মানুষের উন্নতি দেখবেন না। ঐতিহাসিক কারণে আধুনিক নগরী কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখ্য রূপকার হলেন হিন্দু সম্পদায়। মুসলমান সম্প্রদায় বিত্ত ও বিদ্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সর্বহারার শ্রেণীভুক্ত হলেন। উভয় সমাজের এই অসম বিকাশই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে দূরত্ব রচনা করেছে। এর সঙ্গে নবোত্থিত মধ্যবিত্তের অন্তর্নিহিত শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণী-স্বার্থ কাজ করেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-উৎপত্তির কাল ও পাত্র বিচার করলে দেখা যায় যে, শহরে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের কণ্ঠ উচ্চারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তেমন বিরোধ ছিল না। যখন মুসলমানরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের দাবী-দাওয়া ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে, তখনই স্বার্থের দ্বন্দ্ব বেধেছে। শ্রেণী-চরিত্রের সাধারণ ধর্ম হল এই যে, তা স্থানচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত হতে চায় না। স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থ-বৃদ্ধির প্রয়াস থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-মূলের উৎপত্তি হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। এই কায়েমীস্বার্থ

থেকে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সংস্কৃতিভেদ ইত্যাদি বোধ ও বুদ্ধির উদয় হয়। উপর তলার শ্রেণী নীচ তলার শ্রেণীকে ব্যবহার করে। শাসক ইংরাজ ব্যবহার করেছে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামের কৃষক-শ্রমিককে। বিরোধের গতি এ পথেই অগ্রসর হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা এই দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করেছেন। তাঁরা অনেকেই মিলন কামনা করেছেন, কিন্তু বিরোধের মূল কারণ ধরে অগ্রসর হননি বলে সফল হতে পারেননি।

ধর্ম

খ্রীস্টীয় সাত শতকে হজরত মহম্মদ (৫৭০--৬৩২) আরব ভূমিতে ইসলামধর্মের প্রবর্তন করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মূর্তিপূজক ছিলেন। বহুদেবতা-বাদী পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেই একেশ্বরবাদী ইসলামধর্মের উদ্ভব। এই ধর্ম কালক্রমে আরব থেকে ইরান, তুরস্ক, মিসর, স্পেন, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ ও দূর প্রাচ্যদেশসমূহে বিস্তার লাভ করে। অষ্টম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইসলামধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ঐ সময় ও তারপর থেকে বাংলায় ইসলামধর্ম আরব বণিক ও ধর্মপ্রচারকগণের মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর ধর্ম প্রচারের পথ সুগম ও প্রশস্ত হয়। বাংলা-দেশে ইসলামধর্ম প্রচার ও বিস্তারের সাথে সাথে মুসলমান সমাজের পত্তন ও বিকাশ কিভাবে হয়েছে, তা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মুখ্যভাবে 'সুন্নি' ও 'শিয়া' এই দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ে মুসলমান সমাজ বিভক্ত। সুন্নিগণ হজরত মহম্মদকে আল্লাহর প্রেরিত 'নবী' বলে মনে করেন এবং তাঁর প্রচারিত কোরান-হাদিসের অনুসরণ করে ধর্মকর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি পালন করেন। শিয়া সম্প্রদায় হজরত মহম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা 'খলিফায়ে রাশেদীন' বা খলিফা চতুষ্টয়ের (হজরত আবু বকর, ওমর ফারুক, ওসমান ও মোয়াবিয়া) কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না; হজরত মহম্মদের জামাতা কোরেশ বংশীয় আলীকে (৬৫৬-৬১) একমাত্র খলিফা বলে স্বীকার করেন। হজরত ওসমানের (৬৪৪-৫৬) মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা নির্বাচন নিয়ে আলী ও মোয়াবিয়ার সমর্থকগণের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। উক্ত দ্বন্দ্বের ফলে আলী আততায়ীর হাতে নিহত হন। মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেনকে কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধে নিহত করেন। এই কারবালার নির্মম শোকাবহ ঘটনাকে স্মরণ করে শিয়ারা মহরম উৎসব পালন করেন। সুন্নিগণ মহরম উৎসবের আতিশয্য পছন্দ করেন না, বরং কতক আচরণ, যথা জারি বা মর্সিয়া গাওয়া, তাজিয়া, দুলদুল, দরগাহ বানান, শোকমিছিল বের করা, ঢোলবাদ্য সহকারে লাঠিখেলা ও নর্তনকুর্দন করা

ইত্যাদি বেদাত কার্য বলে মনে করেন। তাঁরা মহরম উপলক্ষে দোয়াদরূদ পড়া, রোজা রাখা ও সুন্নত নামাজ পড়া এবং কাঙালিভোজন করান সমর্থন করেন। ইসলাম শরীয়ত মতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও কলেমা—এই পাঁচটি হল ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রত্যেক সাবালক, সক্ষম ও সমর্থ নারী-পুরুষ এগুলি পালন করবেন, পালন না করলে তাঁদের মুসলমানিত্ব থাকে না; 'কাফের' বা বিধর্মীতে পরিণত হন। শিয়ারা নামাজ পাঠের ক্ষেত্রে কোরান-হাদিসের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করেন না, তাঁরা দৈনিক পাঁচবার নামাজের স্থলে দু'বার নামাজ জায়েজ বলে মনে করেন এবং তদনুযায়ী নামাজ পড়েন। শিয়া-সুন্নির এরূপ মতপার্থক্য নিয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয়েছে। আরবে সুন্নি সম্প্রদায় ও পারস্যে শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশী। বাংলাদেশে প্রথমাবধি আরব বণিক ও পীর-দরবেশ কর্তৃক ধর্ম প্রচারিত এবং তুর্কী-আফগান শাসকগণ কর্তৃক দেশশাসিত হওয়ায় সুন্নি মতাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মোঘল বাদশাহ হুমায়ুনের আমলে ভারতবর্ষে প্রথম শিয়াদের প্রভাব পড়ে। তিনি পারস্য সম্রাটের সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সতের শতকে ঢাকার শাসনকর্তা মুকরম খানের (১৬২৬-২৭) সময় বাংলাদেশে শিয়াদের আগমন ঘটে; তিনি ঘটা করে খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে 'বেরা ভাসান উৎসব' পালন করেন। মহরম উৎসবের প্রচলনও ঐ সময় থেকে আরম্ভ হয়। ১৮৮১ সালের আদম-শুমারীতে মূল বাংলার বিভাগ ভিত্তিক শিয়া-সুন্নির সংখ্যা ছিল একরূপ[১]:

বিভাগ	সুন্নি	শিয়া
বর্ধমান	৯,২১,০০৬	২৮,২৭২
প্রেসিডেন্সী	৩৯,৬৪,৪৬৯	৪৭,৮৬৩
রাজশাহী	৪৭,৩৯,২৯৩	৮৫,২৫৯
ঢাকা	৫৫,০২,২৩২	২০,৭৭৯
চট্টগ্রাম	২৪,০৭,৭১২	৯,৯৬৬
	১,৭৫,৩৪,৭১২	১.৯২,১৩৯

ধর্মমত ও তত্ত্বের দিক থেকে সুন্নিদের মধ্যে শরীয়ত ও মারিফত এ-দুটি ধারা আছে। শরীয়তপন্থীরা পিউরিটান মনোভাবাপন্ন, তাঁরা কোরান-হাদিসকে একমাত্র দিগদর্শন মনে করেন এবং তদনুসারে ধর্মীয় আচার-আচরণ পালন করেন।

১ *Report on the census of Bengal,* 1881, Vol 12, p·44
এ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, রংপুরে শিয়াদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক—৩৯,৫৪০ জন, দিনাজপুরে ছিল ২৬,৪৪৮ জন, মুর্শিদাবাদে ছিল ১৪,৫৪০ জন, হুগলিতে ছিল ১০,১৪৬ জন। পাবনায় শিয়ার সংখ্যা সর্বনিম্ন ছিল—২৪ জন মাত্র।

তাঁরা শুদ্ধ জ্ঞানাচারী। মারিফতপন্থীরা অধ্যাত্মবাদী, তাঁরা প্রেম-ভক্তির মাধ্যমে আল্লার জিকির বা ভজন করেন।[১] হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর আরব ভূমিতেই ইসলামের এই মরমিয়া ভক্তিবাদ বা সুফীবাদের উদ্ভব হয়, তবে পারস্য ভূমিতে এর বিকাশ ও প্রসার ঘটে।[২] সুফীরা বিশ্বাস করেন, হজরত মহম্মদ আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্তজ্ঞান দিয়ে যান। সেই তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে সুফীমতের উদ্ভব হয়।[৩] সুফীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য দেখেন না, এ অর্থে তাঁরা অদ্বৈত-বাদী।[৪] শরীয়তপন্থীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভিন্ন মনে করেন না। সুফীমত ও শরীয়তমতের এটাই মৌলিক পার্থক্য। পীর-মুর্শিদকে মধ্যস্থ হিসাবে মেনে সুফীরা মওলা তথা পরমেশ্বরের সাধনা করেন। "সুফীরা আল্লাহর ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে পীরের চেহারা ধ্যান শুরু করেন। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাতে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থা 'ফানাফিশ শেখ', দ্বিতীয় অবস্থা 'ফানাফিল্লাহ'। প্রথমটি রাবিতা বা গুরু সংযোগ, দ্বিতীয়টি মুরাকিবাহ বা আল্লার ধ্যান।"[৫] বৌদ্ধ থেরবাদ ও তান্ত্রিক গুরুবাদের সঙ্গে সুফীর পীরবাদের মিল আছে। ভারতবর্ষে প্রথম থেকে পীরদরবেশ, অলী-আউলিয়া দ্বারা ধর্ম প্রচারিত হয়, এজন্য এদেশে সুফীমতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এক একজন সুফী দরবেশের 'তরিকা' (পথ) অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে চিশতীয়া, নকসবন্দীয়া, কাদেরীয়া, সোহ্‌রাওয়ার্দীয়া, মাদারীয়া, পাঁচ পীরিয়া প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশেও এসব মতবাদের অনুসারীরা আছেন; বাংলাদেশকে 'পীর-আউলিয়া'রই দেশ বলা হয়, চট্টগ্রামকে 'বার আউলিয়া'র অঞ্চল বলা হয়। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন পীরের নামে অসংখ্য মাজার, আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ ও মকবরা আছে। পীরের মাজার দর্শন, কবর

---

১ কোরআনের ৮৮ সুরার ২২ আয়াতে আছে, "অতএব (আল্লাহকে) স্মরণ কর, কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র। সুফীরা এরূপ ইঙ্গিত থেকে জিকির বা জবা করার নির্দেশ পায়। আহমদ শরীফ, ডক্টর—বাংলায় সুফী প্রভাব, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬, পৃঃ ৭৯

২ মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর—বঙ্গে সুফী প্রভাব।

৩ পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৭৬, পৃঃ ৭৯

৪ আল্লাহ মানুষের ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে আছেন—কোরআনের (সুরা ৫০ আয়াত ১৬) এরূপ ইঙ্গিত থেকে সুফীরা অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব গ্রহণ করেন। ঐ, পৃঃ ৭৯

৫ ঐ, পৃঃ ৮১

পূজা, মানত মানা, বাতি দেওয়া ইত্যাদি আচার ভক্তরা পালন করে। কোথাও কোথাও সামা-হল্‌কা (নাচ-গান), দারা-জিকির, সাকি-ইশক প্রভৃতির রেওয়াজ আছে। শরীয়তপন্থীরা এগুলিকে অনৈসলামিক আচার বলে মনে করেন; এসব নিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাধে। মনসুর হল্লাজ 'আনাল হক' তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন বলে পারস্য সম্রাট কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুন্নি মজহাব বা সম্প্রদায়ের 'হানাফী' ও 'মহম্মদী' নামে দুটি মুখ্য বিভাগ আছে। হানাফীরা চার ইমামের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন—তাঁরা হলেন হানাফী, শাফী, মালেকী ও হাম্বেলী। ইমাম বা ধর্মীয় ব্যবস্থাকার হিসাবে তাঁরা ইসলাম ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁদের নির্দেশাবলী 'ফিকাহ', 'তফসির' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। চারজনের যে-কোন একজনকে অনুসরণ করে হানাফী সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায়; কারণ তাঁদের শাস্ত্র ব্যাখ্যার মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। মহম্মদীরা কোরান ও হাদিসের নির্দেশকে সর্বস্ব জ্ঞান করে। কোরান অপৌরুষেয় তথা আল্লাহর বাণী, হাদিস হজরত মহম্মদের উপদেশ সম্বলিত বাণী। কোরান ও হাদিসকে একান্তভাবে অনুসরণ করার পক্ষপাতী বলে তাঁদের অপর নাম 'আহ্‌লে হাদিস'। সুফী মতের সাথে হানাফী মতের তেমন বিরোধ নেই; পীরভক্তরা নিজেদের হানাফী বলেই পরিচয় দেন, কিন্তু আহ্‌লে হাদিস সম্প্রদায়ের সাথে হানাফী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট মত-বিরোধ আছে। বাংলাদেশে এ নিয়ে অনেক 'বাহাস' বা বিতর্ক, বাদানুবাদ ও সংঘর্ষ হয়েছে, দ্বন্দ্ব-কলহের এক পর্যায়ে হানাফীরা আহ্‌লে হাদিস সম্প্রদায়কে 'লা-মজহাব' বা ধর্মহীন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেন।[১] আরবে মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব (১৭০৩-৮৭) অনৈসলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেছিলেন। কোরান ও হাদিসের আক্ষরিক অর্থ ধরে যে ধর্মাদর্শ ও সমাজনীতি পাওয়া যায়, তিনি সেরূপ বিধি প্রচার করেন। তিনি গুহ্যতত্ত্ব বা অধ্যাত্মতত্ত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর আন্দোলন 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত। গোঁড়া ওয়াহাবীরা মদিনায় হজরত মহম্মদের কবর পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিলেন।[২] দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০৩-৬৩) মাধ্যমে ওয়াহাবী আদর্শে ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, ওয়ালিউল্লাহর পুত্র আবদুল

১ প্রচারকে (চৈত্র ১৩০৭) লেখা হয়—"মুসলমানদিগের মধ্যে কতক লোক এমন আছেন যাঁহারা চারি মজহাবের কোন কোন মজহাবই মানেন না, অবস্থাভেদে ইহারা আহলে হাদিস, গায়র মোকল্লেদ, লা-মজাহাবী ও অহাবী নামে অভিহিত।"

২ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃঃ ১১৮

আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩) এবং তৎশিষ্য সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) দ্বারা এ ধারার আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলার হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮৩-১৮৪০) এবং তৎপুত্র দুধু মিঞা (১৮১৯-৬০) ঐ একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ফারায়েজী আন্দোলন' করেছিলেন। ফারায়েজী আন্দোলন মূলতঃ অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও, ধর্মপ্রভাব মুক্ত ছিল না। এটি শেষ পর্যন্ত ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ত্রিমুখী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

শিয়া-সুন্নি, হানাফী-মোহাম্মদী প্রভৃতি ধর্মীয় অন্তর্বিরোধের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতাদর্শ ও আচরণের সাথে ইসলামের বহির্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। আলোচ্য যুগে খ্রীস্টধর্মের সাথে বিরোধ তীব্র হয়। 'গো-হত্যা' নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের মনোমালিন্য তীব্রতর হয়। হিন্দু-ধর্মের নানা রকম আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে, ধর্ম প্রচারকগণ সেগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রভাবের বিরুদ্ধেও তাঁদের সোচ্চার হতে দেখা যায়। স্বধর্মের নীতি, আদর্শ ও আচরণবিধি নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্যধর্মের প্রভাব, প্রচার ও আক্রমণ নিয়ে যে বহির্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, এখন সে বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

বহির্দ্বন্দ্ব ঃ ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম

ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম উভয়ই প্রচারশীল। মিশনারীর মাধ্যমে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা সারা বিশ্বে আছে। ইসলাম প্রচারের জন্য এরূপ সুশৃঙ্খল মিশন পদ্ধতি বিশ্বের কোন মুসলিম রাষ্ট্রে ছিল না। খ্রীস্টান মিশনারীগণ রীতিমত দীক্ষা নিয়ে ধর্মপ্রচারে নামতেন। তাঁরা শহর-গ্রাম-গঞ্জে মিশন খুলে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে ধর্মপ্রচার করতেন। মিশনের সঙ্গে থাকত দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, সেবাশ্রম ইত্যাদি। তাঁরা স্থানীয় ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা মুদ্রিত করে বিনা মূল্যে বিতরণ করতেন। এগুলিতে খ্রীস্টধর্মের মহিমা ও পর ধর্মের নিন্দার কথা থাকত। তাছাড়া, হাট-বাজার জনবহুল স্থানে তাঁরা বক্তৃতা দিয়েও খ্রীস্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। মিশন-তহবিল থেকে দীন-দরিদ্রদের অর্থ সাহায্য দানেরও ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ মানুষ সহজে তাঁদের শিকারে পরিণত হত।[১] বাংলাদেশে ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার প্রভৃতি

১ রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে (সেপ্টেম্বর ১৮২১) লিখেছেন, "ইদানিন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোসলমানকে ব্যক্তরূপে তাহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত খ্রীস্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার

ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন মিশনারী ছিল। ১৮৫০ সালে কলিকাতা ও আশপাশের জেলাগুলিতে খ্রীস্টান মিশনারীর সংখ্যা ছিল ৭১টি; ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটি, প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারী, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি, চার্চ মিশনারী সোসাইটি, ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড, সেন্ট পল ক্যাথলিক মিশন প্রভৃতি নামের মিশনগুলি কর্মরত ছিল।[১] কলিকাতায় মিশনের সংখ্যা ছিল ৩০টি। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলায় হিন্দুর বসবাস বেশী ছিল, এজন্য মিশনারীদের দৃষ্টি হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর পড়ে। হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথা ছাড়াও আরও কতকগুলি ধর্মীয় সামাজিক প্রথা ছিল যা মিশনারীদের ধর্মীয় চিন্তাদর্শনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল; গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়া, সতীদাহ প্রথা, অন্তর্জলি প্রথা, বাণফোঁড় প্রথা প্রভৃতি। উইলিম কেরী, উইলিয়ম এ্যাডাম প্রমুখের ধারণা হয়েছিল, হিন্দুদের ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তাদের মধ্য থেকে ধর্মসংস্কারগুলি তিরোহিত হবে এবং সেই সূত্রে খ্রীস্টধর্ম প্রচারও সুবিধা হবে। চাকুরী, শিক্ষা, অর্থের লোভ দেখিয়ে তাঁরা কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করতে সফল হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্বোধিত করা অংশতঃ মিশনারীদের চিন্তাধারার ফল। শুধু নিম্নবর্ণের নয়, উচ্চবর্ণের সন্তানেরা খ্রীস্টধর্মে আকৃষ্ট হন। মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৩২), গোপীনাথ নন্দী (ঐ), লালবিহারী দে (১৮৪৩), জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৫১) খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ সালের মধ্যে দশ জন হিন্দু কলেজের ছাত্র দীক্ষা নেন। মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজে পড়ার সময় খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা নেন (১৮৪৩)।[২] হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রতিক্রিয়া হয়। রাধাকান্ত দেবের মত গোঁড়াপন্থী এবং রামমোহনের মত উদারপন্থী যাঁরা ইংরাজী শিক্ষার

এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দু ও মোসলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্য ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচ-লোক ধনাশয়ে কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীষ্টান হয় তাহাদিগকে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাময়িক পত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯, পৃঃ ১৬ (৪র্থ সং)।

১ Muhammad Mohar Ali—*The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, The Mehrub Publications, Chittagong, 1965, pp. 206-09 (Appendix A).

২ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর—বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃঃ ২০২

সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্মান্তরীকরণের বিষয়টিকে সুনজরে দেখেননি। রামমোহনের একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় হিন্দু সন্তানদের মধ্য হতে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবণতা দূর করা।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণের সংখ্যা বেশী ছিল না। দু'একটি পুস্তকে মহম্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা লিখলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ উঠে। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস থেকে মুদ্রিত একটি পুস্তিকায় মহম্মদের নিন্দা করা হয়, পুস্তিকাটি জোয়াদ সবত নামে একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান যুবক লেখেন। লর্ড মিন্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। কেরী ক্ষমা চেয়ে পুস্তিকার কপি তুলে নেন।[১] ১৮৩৯ সালে রেভারেণ্ড সি.জি. ফাণ্ডারের লেখা পুস্তিকার বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়। তিনি আগ্রার চার্চ মিশনারী সোসাইটির ধর্মপ্রচারক ছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তিনি ফারসী ভাষায় 'মিজানুল হক', 'তরিকুল হায়াত' 'মিফতাহুল ইসরার' ও 'দসারাত-ই-সিরাজুল হায়াত' পুস্তিকা লেখেন। মুসলমান সম্প্রদায় থেকে এগুলির বিরুদ্ধে কেবল প্রতিবাদই হয়নি, মৌলবীগণ বিতর্ক সভায় উপস্থিত হয়ে এগুলির জবাব দিয়েছেন এবং প্রতি আক্রমণ করে পুস্তক ও প্রচারপত্র লিখেছেন।[২]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রথম দিকে মিশনারীদের প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু ১৯১৩ সালে সনদ লাভের সময় তাঁদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয় এবং ১৮৩৩ সালে সনদের সময় তাঁদের ধর্ম প্রচারের কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৮৫০ সালের ২১তম বিধিতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না, এরূপ আইন করে কোম্পানী পরোক্ষভাবে মিশনারীদের সহায়তা করেন। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে প্রতিবাদ উঠলেও খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রচার কার্য অব্যাহত থাকে। তাঁরা ধর্মপ্রচারের কৌশল ও মাধ্যমগুলি সমানে ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁরা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম, সেবাশ্রম, অর্থদান ইত্যাদির সাহায্যে বস্তুগতভাবে এবং বই পুস্তক, প্রচারপত্র, পত্রিকা, বক্তৃতাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে থাকেন। বাংলা ভাষার প্রথম দুটি সংবাদপত্র 'দিগদর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) এবং 'সমাচার দর্পণ' (মে ১৮১৮) 'শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশন' থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। খ্রীস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকা দুটি

১ *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, pp 3·4.

২ *Ibib.*, pp. 203-04.

ব্যবহৃত হয়নি সত্য, তবে হিন্দুধর্মের হীনতা ও অসারতা দেখিয়ে কিছু পত্র ছাপা হত।[১] কিন্তু এর অল্পকাল পরেই দেখা যায়, সাময়িক পত্রকে প্রচারযন্ত্র হিসাবে মিশনারীগণ ব্যবহার করেছেন। ১৮১৮-১৮৬৮ সাল পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছর সময় সীমায় খ্রীস্টধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে যেসব বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:[২]

পত্রিকা	সম্পাদক/প্রকাশক	কাল
গসপেল ম্যাগাজিন (মাসিক)	ব্যাপ্টিস্ট অগজিলিয়ারি মিশনারী সোসাইটি	ডিসেম্বর ১৮১৮
খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক)	—	মে ১৮২২
মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (মাসিক)	জন রবিনসন	জানুয়ারী ১৮৪৩
উপদেশক (মাসিক)	জন ওয়েঙ্গার	জানুয়ারী ১৮৪৭
সত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক)	মেরিডিথ টৌন্সেণ্ড	মে ১৮৫০
সত্যার্ণব (মাসিক)	জেমস লঙ	জুলাই ১৮৫০
সংবাদ সুধাংশু (সাপ্তাহিক)	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	সেপ্টেম্বর ১৮৫০
অরুণোদয় (মাসিক)	লালবিহারী দে	আগষ্ট ১৮৫৬
তত্ত্ববিকাশিনী (মাসিক)	—	জানুয়ারী ১৮৬৭

'খ্রীষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখা হয়, "অন্য দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোক দ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহাদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগের জ্ঞাত করার কারণ মাসে ২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল ২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্ম-জ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমার-দিগের সহায়তা করিবা...ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করণার্থে

১ বাংলা সাময়িক পত্র, পৃঃ ৪-৫, ১৭ (৪র্থ সং)। ইংরাজী ভাষায় অনেক পত্র ছিল, সেগুলির মধ্যে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (১৮১৮) 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' প্রধান ছিল।

২ তালিকাটি 'বাংলা সাময়িক পত্রে'র সাহায্যে প্রণীত।

বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে একদল কর।"[১] 'মঙ্গলোপাখ্যান' পত্রের প্রচারোদ্দেশ্য ছিল, "এইক্ষণে আমরা যে পত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অর্পণ করি তাহা বর্তমান বৎসরের আরম্ভে শ্রীরামপুর বঙ্গদেশস্থ ডুবক (ব্যাপটিষ্ট) মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমারদের চতুর্দিকস্থ দেবপূজকেরদের পারমার্থিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্মোপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুবর্গের সভা তাঁহারদের নানা স্থান হইতে আগমনের দ্বারা আমারদের পরমানন্দ জন্মিল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনারদের পরিত্রাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে এই যে সম্বাদ তাঁহারা প্রকাশ করিলেন তদ্দ্বারা আমারদের অন্তকরণ আরো আনন্দিত হইল।"[২]

উদ্ধৃতিগুলি থেকে বুঝা যায় যে, মিশনারীদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজ। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সমাজে তুলনামূলকভাবে ধর্মান্তরীকরণ কম হয়েছে তার প্রধান দুটি কারণ: মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপ প্রথম দিকে হিন্দু অধ্যুষিত কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে হয়েছে; মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর ও পূর্ববঙ্গে তাদের মিশনকার্য বেশী সম্প্রসারিত হয়নি। দ্বিতীয়ত মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয় ও কলেজগুলি ধর্মান্তরিত করার উত্তম কেন্দ্র ছিল। শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এসব স্কুল-কলেজে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী ছিল। কলিকাতায় জেনেরাল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন, ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন, ইংলিশ সেমিনারী, বিশপস্ কলেজ ইত্যাদি ত্রিশ-চল্লিশ দশকে স্থাপিত হয়। শক্তিশালী পাদরী আলেকজাণ্ডার ডফ কয়েকটি স্কুল পরিচালনা করতেন। তাঁরা ক্রমান্বয়ে মুসলমান সমাজের দিকেও হস্ত প্রসারিত করেন। খ্রীষ্টান মিশনারীদের সাথে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মিলিত হয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলাম, হজরত মহম্মদ ও কোরানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করেন। রেজাউল করিম লিখেছেন, "মুইর, সেল, স্প্রেঙ্গার, জুয়েমার, মারগালুইথ প্রভৃতি খ্রীষ্টান লেখক ইসলামধর্মকে হেয় করিবার জন্য, ইসলামের মতসমূহকে নিন্দা করিবার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সব গ্রন্থ বিদ্বেষপূর্ণ ভাবধারায় পরিপূর্ণ। বহু মুসলমান লেখক ঐ সকল খ্রীষ্টান লেখকের বিদ্বেষপূর্ণ গ্রন্থের প্রত্যুত্তর সেইরূপ ভাষায় দিয়াছেন।"[৩] স্যার উইলিয়ম মুইর 'লাইফ অব মহম্মদ' (১৮৬৯) গ্রন্থে হজরত মহম্মদ ও ইসলাম সম্পর্কে বক্রোক্তি করেন। সৈয়দ আহমদ 'খুতুবাত-এ-আহমদীয়া' (১৮৭০) গ্রন্থে মুইরের

---

১ বাংলা সাময়িক পত্র, পৃ: ২৫

২ ঐ, পৃ: ৮১

৩ রেজাউল করিম—বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, পৃ: ১০

অভিযোগের ও অপব্যাখ্যার জবাব দেন। তিনি মহম্মদের জীবনীর অলৌকিক ঘটনাগুলিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে এগুলির আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা নিরূপণ করেন। প্রতীকের সাহায্যে বর্ণিত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রকৃতিবিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে খ্রীষ্টান পাদরীগণ মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করেছেন, সৈয়দ আহমদ এই লেখাটিতে তারই যুক্তি-সঙ্গত প্রতিবাদ করেন।[১] তাঁর 'তাবিনুল কালাম ফি তাফসিবাত্ তওরাতি অল ইন্‌জিলে আলা মিল্লাতিল ইসলাম' গ্রন্থে ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা আছে। সৈয়দ আমীর আলী 'লাইফ এণ্ড টিচিং অব দি প্রফেট' (১৮৭৩) গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহম্মদের উন্নত আদর্শ ও পবিত্র জীবনের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি যে একজন মহামানব, প্রগতিশীল চিন্তানায়ক, উদার বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন, আমীর আলী সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। তিনি অপর গ্রন্থ 'ক্রিশ্চানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট'-এ (১৯০৬) ইসলাম ও খ্রীস্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। খ্রীস্টান জগতে ইসলাম ও মহম্মদকে অপদস্থ করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তিনি প্রকারান্তরে তারই জবাব দিয়েছেন এসব রচনায়। আবদুল লতিফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা করার সময় সাহেবদের কোন কোন রচনায় মহম্মদ ও মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য আছে বলে উল্লেখ করেন এবং মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া হয় বলে সেগুলি পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২] আবদুল লতিফ 'বেথুন সোসাইটি'র (১৮৫১) সদস্য ছিলেন। ১৮৬০ সালের ১৫ই জানুয়ারী সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশনে ম্যাকক্রিণ্ডেল 'দি ক্রুসেডস' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আবদুল লতিফ প্রবন্ধের কতকগুলি আপত্তিকর উক্তির প্রতিবাদ করেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানের মিশ্র সভায় কোন ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ কোন কিছু না বলার যুক্তিযুক্ততা সভা কর্তৃক স্বীকৃত হয়।[৩] ১৮৯২ সালে অতুলকৃষ্ণ মিত্র বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে 'ধর্মবীর মহম্মদ' নামক পুস্তকের অভিনয়ের উদ্যোগ নিলে মুসলমান সমাজে তার প্রতিক্রিয়া হয়।

১ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃঃ ১৬

২ *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, pp. 219-20

৩ যোগেশচন্দ্র বাগল—বেথুন সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃঃ ৬১-৬২

আবদুল লতিফ সমাজের এরূপ মনোভাব বুঝে সেটি বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ইংলণ্ডেও অনুরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টাইমসপত্রে পত্র লিখে প্রতিবাদ করেছিলেন।[১] ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আত্মজীবনী 'দাস্তানে ইব্রাতুবার'-এ (১৮৮০) বলেছেন যে কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে (১৮৫৭) তিনি কিছু কাল ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। তিনি মৌলবী এনায়েত রসুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট ইহুদী-খ্রীস্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, বাইবেল ও অন্যান্য নবী-গ্রন্থে রসুলের আগমন বার্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি খ্রীস্টান পাদরীদের কাছ থেকে বাইবেলের অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়তেন এবং তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হতেন। তিনি লিখেছেন, "আমি সে সময় খ্রীস্টানদের ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস খণ্ডনে একটি পুস্তিকা রচনা করি। পাদরীদের সাথে বিতর্ক করে আমি প্রায়ই তাদের পরাস্ত করতাম।"[২] কলিকাতার সীমানা ছেড়ে মফস্বলেও প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়। এবার প্রতিবাদের ভাষা বাংলা। মুনশী মেহেরুল্লা প্রথম নেতৃত্ব দেন।

মুনশী মেহেরুল্লার জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান মেহেরুল্লার জীবিতকালে বাংলা ও ভারতবর্ষে খ্রীস্টান ধর্ম যাজকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারকার্যে প্রকৃতি বর্ণনা করে লিখেছেন, "এই শ্রেণীর পাদ্রীগণ ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখ্যক কোরান শরীফের তরজমা ও তফসির প্রকাশিত করিয়াছেন। 'ইসলাম-দর্শন', 'মিজানুল হক', 'তালিমে মোহাম্মদী', 'ইসলাম-দর্পণ', 'তহকিকুল ইমান' এবং এই শ্রেণীর প্রাণ জুড়ানো বহু ইসলামী নামের আবরণে নানা কেতাব প্রচার করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ইঁহারা তীব্র হলাহল উদগীরণ করিয়া থাকেন। ('মোসলেম ওয়ার্ল্ড' নামে একখানি সুপরিকল্পিত পত্রিকা এই উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়া থাকে।) অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এইসব তার্কিক পণ্ডিতগণ সত্যকে এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করেন যে. তাহাতে সাধারণের ত দূরের কথা, অনেক মৌলভী মৌলানা বা বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যায়। ...বহুলোকই ভ্রান্তিবশে পাদ্রীদের সম্মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে বা ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। বিরুদ্ধ রাজশক্তির বন্দুক, কামান, বোমা, বেয়োনেট ইসলামের যে ক্ষতি করিতে পারে, এই শ্রেণীর

১ মন্মথনাথ ঘোষ—মহাত্মা আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর সি. আই. ই., মালঞ্চ, আশ্বিন ১৩২৪

২ মুহম্মদ আবদুল্লাহ—ওবায়দুল্লাহ আল উবায়দী সুহরাওয়ার্দীর আত্মজীবনী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৮, পৃ: ৮৮

সাহিত্য কর্তৃক ক্ষতি তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক।"[১] 'ইসলাম-প্রচারকে'র প্রথম সংখ্যায় (ভাদ্র ১২৯৮) সূচনায় বলা হয়, "আমাদের ধর্মের শত্রু আজকাল প্রধানত খ্রীষ্টিয়ানগণ। ইহারা বৎসরে লাখে লাখে টাকা খরচ করিয়া স্ত্রী-পুরুষ নানা ভেক ধারণ করিয়া নানা উপায়ে ধর্ম প্রচার করিতেছে, ইহাদের অধ্যবসায় অটল, ইহারা ধর্মপ্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থবৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চল আড্ডা করিয়া গরীব লোকদিগকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে। এই উপায়ে নদীয়া যশোহর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই 'ঈসাইদীন' কবুল করিয়াছে।"[২] 'মোসলেম ক্রনিকলে' (২৫ এপ্রিল ১৮৯৫) প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে লেখা হয় যে, কিছুকাল আগে নদীয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে খ্রীস্টান মিশনারীরা কয়েক মুষ্টি শস্যের বদলে মুসলমানদের মধ্যে দীক্ষার কাজে বেশ সফলতা লাভ করেছে। দুটি বাংলা পত্রিকা 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব' ও 'প্রচার' (১৮৯২) এবং একটি ইংরাজী পত্রিকা 'মোসলেম ওয়ার্ল্ড' ইসলাম, মহম্মদ ও কোরানের বিরুদ্ধে প্রচার চালাত। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে খ্রীস্টান মিশনারীরা মুসলমান সমাজেও তাঁদের মিশনের জাল বিস্তার করেন। নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়েছে বেশী—অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ। হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যে যে পদ্ধতিতে আঘাত বা আক্রমণ এসেছে প্রতিরোধ বা প্রতিকার হয়েছে সে সে পদ্ধতিতে অর্থাৎ বক্তৃতার জবাব বক্তৃতায়, পত্রিকার জবাব পত্রিকায়, পুস্তকের জবাব পুস্তকে, মিশনের জবাব মিশনে প্রদান করার প্রয়াশ হয়েছে। সভাসমিতি করে বক্তৃতার স্থলে কেবল পাল্টা বক্তৃতা নয়, পূর্ব ঘোষণার দ্বারা মুখোমুখি বিতর্ক হয়েছে। এরূপ সভাসমিতি ও তর্কযুদ্ধে অংশ নিয়ে যাঁরা ইসলামের স্বার্থরক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, শাহ আবদুল্লা, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী,

১ শেখ হাবিবর রহমান—কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪ 'ইসলাম-দর্শন' (বাংলা) পাদরী য্যাকব কান্তিনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রণীত। 'মিজানুল হক' (ফারসী) আগ্রার চার্চ মিশনারীর পাদরী জন ফাণ্ডার কর্তৃক রচিত। গ্রন্থের প্রতিবাদে মওলানা রহমতুল্লা 'রদ্দে মিজানউল মিজান' ও 'এযাজে ইস্‌কি' গ্রন্থ লিখেন। 'তাদিয়ে মোহাম্মদী' (উর্দু) রচনা করেন পাদরী আমানুদ্দীন।—সুধাকর, ১৯ চৈত্র ১২৯৯

২ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮

ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে মুনশী মেহেরুল্লা ও শেখ জমিরুদ্দীনের কণ্ঠ অধিক সোচ্চার ও সক্রিয় ছিল। তাঁরা অজস্র ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা প্রদান, বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা, সমিতি ও বিদ্যালয় স্থাপন করে মুসলমান সমাজের উপর খ্রীস্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন ও ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচার করেছেন। তাঁদের বাগ্মীজীবনের ও সাহিত্যজীবনের শুরু পাদরীদের প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপনের মাধ্যমেই। পাদরীরা হাটে হাটে বক্তৃতা দিয়ে ধর্মপ্রচার করতেন। মুনশী মেহেরুল্লা প্রথম বক্তৃতা শুরু করেন গ্রামের হাটগুলিতে। জীবনীকার লিখেছেন, "হাটের একদিকে পাদ্রীদের বক্তৃতা, অন্যদিকে মুনশী সাহেবের বক্তৃতা, হাটের লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়া মুনশী সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। তাহারা এতদিন দেখিয়া আসিতেছে, পাদ্রীগণ নিঃস্বার্থভাবে হাটে হাটে ধর্মবক্তৃতা প্রদান করেন; কেহ কখনো তাহার প্রতিবাদ করেন না। মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা এই সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনা সভার সাবধানে এড়াইয়া চলিতেন। কেহ এতদসম্বন্ধে কিছু বলিলে কাফেরী ও গোমরাহী ফৎওয়া দিয়া নাসারাদিগকে দোজখে পাঠাইয়া দিতেন। ...যে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে এতদিন কেহই একটি কথা বলিতে সাহস করে নাই, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা নামক একজন তরুণ যুবক আজ তাঁহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছেন। ...দেশের দূর-দুরান্তে সাড়া পড়িয়া গেল।"[১] এরপর যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে, মেহেরুল্লা তখন সেখানে ছুটে গেছেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের সমুন্নত আদর্শ তুলে ধরেছেন। শেষে ধর্ম-প্রচারই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি দুটি বড় বিতর্ক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন একটি বরিশালের পিরোজপুরে, অপরটি নদীয়ার রাণাঘাটে। পিরোজপুরে পাদরী স্পার্জন এবং রাণাঘাটে পাদরী মনরো ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী। পূর্ব ঘোষণার দ্বারা নিরপেক্ষ বিচারক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে পিরোজপুরের তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। 'ইসলাম-প্রচারকে' এর বিবরণ দিয়ে লেখা হয়: "...ইংরাজী ৭ই অক্টোবর (১৮৯১) তর্ক সভার দিন স্থির হয়। নির্দিষ্ট তারিখে উভয় পক্ষ পিরোজপুরে সমাগত হন। খ্রীষ্টিয়ান পক্ষই অসংখ্য প্রশ্নজাল বিস্তার করিয়া তাহার উত্তরপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মুসলমান পক্ষ হইতে সুধাকর ও ইসলাম-প্রচারকের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি ও প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা তাঁহাদের প্রশ্নের অকাট্য উত্তর প্রদান করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। উপযুক্ত মধ্যস্থদিগের দ্বারা উভয় পক্ষের জয় পরাজয় নির্ধারিত হইয়াছে, শীঘ্রই

১ কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, পৃঃ ২০-২১

উহার কার্যবিবরণী ও উভয় পক্ষের প্রশ্নোত্তর ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।"[১] মেহেরুল্লা প্রণীত 'খ্রীষ্টান-মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' গ্রন্থখানি উক্ত বিতর্কের ফল।[২] রাণাঘাটের তর্কযুদ্ধে পাদরী মনরো শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেননি; মুনশী মেহেরুল্লা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে পাদ্রীদের অভিযোগ খণ্ডন এবং ইসলামের মহিমা কীর্তন করেন। তিনি যশোহর, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী ও কলিকাতার ওয়েলিং-টন স্কোয়ারে প্রতিবাদমূলক সভায় বক্তৃতা করেন।[৩]

'খ্রীষ্টীয় বান্ধবে' (জুন ১৮৯২) জন জমিরুদ্দীন 'আসল কোরান কোথায়?' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে 'মহাকোরানের প্রতি অযথা আক্রমণ ও ব্যঙ্গোক্তি' করেন। কোরানে অন্যের হস্তক্ষেপ আছে এই প্রশ্ন তুলে তিনি কোরানকে 'জাল' বলতে চেয়েছেন। মুনশী মেহেরুল্লা 'সুধাকরে' (১৯ চৈত্র ১২৯৯) 'ইসাই বা খ্রীষ্টানী ধোকাভঞ্জন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে জমিরুদ্দীনের অভিযোগের উত্তর দেন। জমিরুদ্দীন চিঠির মারফত মুনশী মেহেরুল্লার বক্তব্যের বিরোধিতা করেন; জমিরুদ্দীনের পাল্টা প্রশ্ন ছিল শিয়া-সুন্নির মধ্যে প্রচারিত কোরান অভিন্ন নয় কেন? মেহেরুল্লা প্রবন্ধের মাধ্যমে তারও জবাব দেন। জন জমিরুদ্দীন আর বিতর্কে অগ্রসর হননি; এর অল্পকাল পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুনশী মেহেরুল্লার শিষ্যভুক্ত হন। অতঃপর তিনি ইসলাম ধর্মের পক্ষে ও খ্রীস্টধর্মের বিপক্ষে আজীবন প্রচার কার্য চালিয়েছেন। সভায় বক্তৃতা দিয়ে, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ও স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করে এ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা-ধারা ও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শাহ আবদুল্লা ও মোহাম্মদ এহসানুল্লা প্রথমে খ্রীস্টান ছিলেন; তাঁরা পরে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম-খ্রীস্টান বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। সুধাকর, মিহির ও সুধাকর, ইসলাম-প্রচারক, হাফেজ প্রভৃতি পত্রিকা তাঁদের মতামত প্রকাশের মাধ্যম ছিল। এরূপ তর্ক-বিতর্ক ও মতামত প্রকাশের ফলে কি ধরনের ও কি পরিমাণের রচনার সৃষ্টি হয়েছিল

---

১ ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন ১২৯৮

২ পত্রে খ্রীস্টান পক্ষের কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ আছে, যথা—(ক) 'কোরআনে মিথ্যা বলিবার উৎসাহজনক উপদেশ আছে।' (খ) 'মহম্মদ সাহেব পাপী অর্থাৎ গোনাহগার ছিলেন।...খোদা মোহাম্মদকে নিজ পাপের ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছেন।' (কোরআনের সুরা আলমমিন ৬ রুকু ৫ আয়াত)। মুসলমান পক্ষের প্রধান প্রশ্ন ছিল: 'যীশুখ্রীস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি যে ঈশ্বর তাহার প্রমাণ কি?'—ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ ১২৯৯

৩ কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, পৃ: ৩৬-৩৯

তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল:

লেখক	প্রবন্ধ	পত্রিকা
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	ইসাই বা খ্রীষ্টানী ধোকাভঞ্জন	সুধাকর, ২০ ও ২৭ চৈত্র ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
,,	আসল কোরান সর্বত্র	সুধাকর, ১৩০০
অজ্ঞাত	সত্যের ভয়ে দুঃখ কেন	প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬
,,	আল্লার দাস	প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬
,,	সেই ভাববাদী বা সত্যের বিভা	প্রচারক, চৈত্র ১৩০৬
চন্দ্রনাথ সরকার	খ্রীষ্টিয়ান ধর্মনীতি	প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, কার্তিক, পৌষ ১৩০৭
শাহ আবদুল্লা	হজরত মোহাম্মদ(দঃ)ও তাহার শিক্ষা	----
শেখ জমিরুদ্দীন	বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে	ইসলাম-প্রচারক, জুলাই, ১৮৯৯
,,	প্রভু যীশু খ্রীষ্ট কে?	" জুলাই, আগস্ট ১৮৯৯
রেয়াজুদ্দীন আহমদ	লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান	,, ,, জুলাই, আগস্ট ১৮৯৯
শেখ জমিরুদ্দীন	বাইবেলে বহুবিবাহ	" জুলাই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯
এবনে মাআজ	প্রচারের প্রগলভতা	" জুলাই, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯
শেখ জমিরুদ্দীন	বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা	,,
এবনে মাআজ	প্রচারের অপূর্ব প্রলাপ	ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০
শেখ জমিরুদ্দীন	প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে?	,, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১
শাহ আবদুল্লা	ইঞ্জীল কেতাব	" নভেম্বর-ডিসেম্বর,১৯০১
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	ইসাই ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সংঘর্ষ	" মার্চ-এপ্রিল ১৯০২
শেখ ফজলল করিম	যীশু খ্রীষ্টের জীবনী আলোচনা	" মে-জুন ১৯০২

লেখক	প্রবন্ধ	পত্রিকা
আনিসউদ্দীন আহমদ	পাদরী মনরো সাহেবের ভ্রমসংশোধন	মিহির ও সুধাকর, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩
শেখ জমিরউদ্দীন	টমাস কার্লাইল ও ইসলাম	ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	ইস্রায়েল কি ইসমাইল বংশ শ্রেষ্ঠ ?	,, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩
শেখ জমিরুদ্দীন	হজরত মহাম্মদ(দঃ) নবয়ুত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য	,, নভেম্বর, ১৯০৪, জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী, এপ্রিল ১৯০৫
দলিলউদ্দীন আহমদ	ক্রুসেড বা খৃষ্টানধর্মযুদ্ধ	নবনূর, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩১১
শেখ জমিরুদ্দীন	হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা	ইসলাম-প্রচারক, জুলাই, নভেম্বর ১৯০৫, মার্চ ১৯০৬
মোহাম্মদ এবরার আনসারী	নব্যভাবতে চেহলাম	,, মার্চ, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ডিসেম্বর ১৯০৫
,,	বাইবেলের পরিবর্তন	,, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯০৫

তালিকায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে ইসলাম-প্রচারক বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে; সুধাকর ও প্রচারকেরও ভূমিকা ছিল। প্রচারকের আক্রমণের স্থল ছিল খ্রীস্টান পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকা, আর সুধাকরের ছিল 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকা। ইসলাম-প্রচারক উভয় পত্রিকাকে আক্রমণ করেছে। বাঙালী খ্রীস্টান গোপালচন্দ্র দত্ত 'প্রচার' সম্পাদনা করতেন। গোপালচন্দ্র দত্ত 'প্রচারে' (জুন ১৯০০) 'মোসলমেনে স্বপ্ন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত 'তফসীর হাক্কানী' নামক রচনার বিরূপ সমালোচনা করেন।[১] তিনি লিখেন, "মুসলমান ভাইসাহেবদের 'প্রচারক' পত্রে এক উদ্ভট রকমের স্বপ্নের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ...'তফসীর হাক্কানী' নামে যে একখানি মুসলমানী পুস্তক আছে, তাহা বোধ হয় দুই একজন মুসলমান ব্যতীত কেহই

১ 'তফসীর হাক্কানী'র মূল লেখক দিল্লীর মৌলানা আবদুল হক। আলাউদ্দীন আহম্মদ এর বঙ্গানুবাদ করে ইসলাম-প্রচারকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।

অবগত নহে। যে অজ্ঞাত পুস্তকের বিষয় কেহ জানে নাই, কেহ শুনে নাই, যাহার অস্তিত্ব বিষয় কেহ কিছু অবগত নহে তাহা দ্বারা কিরূপে যে হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে এত পরিবর্তন সংসাধিত হইল, তাহার কাল্পনিক অস্তিত্ব মহামান্য প্রচারক সম্পাদক মহোদয়ের সুমার্জিত মস্তিষ্ক ব্যতীত আর কোথাও স্থান পাইতে পারে?...ইসলামের খড়্গ যাহা পারিল না, তাহা কি একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা পারিবে?"[১] 'প্রচারের প্রগলভতা' প্রবন্ধে এবনে মাআজ (সম্পাদকের ছদ্মনাম) এর জবাব দেন। সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বলেন, "ইনি (গোপালচন্দ্র দত্ত) যদিও যীশুভক্ত ত্রিত্ববাদী, কিন্তু নামটিতে এখন পর্যন্ত পৌত্তলিকতার স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। ফলতঃ পুরাতন খ্রীষ্টীয়ান অপেক্ষা নূতন খ্রীষ্টীয়ানের বাড়াবাড়িটা কিছুটা অতিরিক্ত সন্দেহ নাই।"[২] 'লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান' প্রবন্ধে বর্ণিত খ্রীস্টানের মুসলমান হওয়ার ঘটনা 'প্রচার'পত্র মানতে চায় না। প্রচার-সম্পাদকের প্রশ্ন 'খ্রীষ্টিয় কি কখন মুসলমান হয়?' এবনে মাআজ 'প্রচারের অপূর্ব প্রলাপ' প্রবন্ধে উক্ত ঘটনার সত্যতা প্রতিপন্ন করেন এবং প্রচার-সম্পাদকের অনৃতনাদিতা সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। তাঁর ভাষায় "মিথ্যা কথাত ইহাদের পক্ষের ভূষণ। যখন মরিয়ম পুত্র যীশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া মিথ্যা ঘোষণা করিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না, তখন অন্য মানুষের সম্বন্ধে মিথ্যা কল্পনাজল্পনা করা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?"[৩] 'প্রচার' ও 'প্রচারকে'র মধ্যেও ধর্ম বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয় —নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই মসিযুদ্ধ। 'বাইবেল নীতিপূর্ণ শাস্ত্র' খ্রীস্টান পক্ষের এই দাবীর অসারতা দেখাবার জন্য বাইবেল থেকে ব্যাভিচার দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে 'সত্যের জয়ে দুঃখ কেন' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। খ্রীস্টানরা যীশুখ্রীস্টকে ঈশ্বরপুত্র জ্ঞানে পূজা করেন, সেজন্য প্রচারক তাঁদের 'নরপূজক' বলে আখ্যায়িত করেছে।[৪] 'আল্লার দাস' প্রবন্ধে মহম্মদের আগমন-সূচক দুটি পদ বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা হয়। পদ দুটির বক্তব্য এরূপ: "কিন্তু যিনি (মহম্মদ) আমার পরে আগমন করিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাবান, যাঁহার পাদুকা বহন করিতেও আমি যোগ্য নহি, তিনিই তোমাদিগকে

---

১ ইসলাম-প্রচারক, নভেম্বর ১৮৯৯

২ ঐ।

৩ ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০

৪ প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ (দীক্ষিত) করিবেন। কুলা (জেহাদীয় করবাল) তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, তিনি আপনার খামার (মণ্ডলী) কি শেষে পরিষ্কার করিবেন; আপনার গোম (মোসলমান লোক) তিনি গোলায় (মণ্ডলীতে) সংগ্রহ করিবেন, এবং আখড়া (কাফের) সকল তিনি অনির্বাণীয় অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।"[১] জন মনরো প্রচার পত্রিকায় ঐ উদ্ধৃত পদটির প্রতিবাদ করেন। তারই পাল্টা প্রতিবাদে 'সেই ভাববাদী বা সত্যের বিভা' প্রবন্ধটি লেখা হয়। পাদরী চন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'খ্রীষ্টিয়ান ধর্মনীতি' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। তিনি এতে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত সুসমাচার শীর্ষক চারখানি পুস্তিকার আলোচনা করেছেন।[২]

ইসলাম-প্রচারকে শেখ জমিরুদ্দীন ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তিনি খ্রীস্টান মিশনারী থেকে লেখা পড়া শিখেন এবং পাদরীর পদ লাভ করে খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত করার মর্যাদা পান। যীশুখ্রীস্ট যে মনুষ্য সন্তান, ঈশ্বরপুত্র নন, 'প্রভু যীশুখ্রীস্ট কে' প্রবন্ধের এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়। পাদরীগণ 'ত্রিত্ববাদে'র ভিত্তিতে যীশুকে ঈশ্বরপুত্র এবং সেই সূত্রে জীবের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে দাবী করেন। এদেশে খ্রীস্টধর্ম প্রচারের পদ্ধতির উপর মন্তব্য করে তিনি বলেছেন, "আজকাল ইসাই বা খ্রীষ্টিয়ান পাদরীগণ প্রায় সর্বদা সর্বত্রই হজরত ইসাকেই (আলাঃ) একমাত্র নাজাৎ দেহেন্দা বা ত্রাণকর্তা বলিয়া প্রচার এবং বহুতর হিন্দু মুসলমান নর-নারীর হৃদয় ক্ষেত্রে ঐরূপ বিশ্বাসবীজ বপন করিয়া থাকেন।...এখন যে কেহ সেই ইসাকে অবতার এবং ত্রাণকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তিনি আর কোনও পুণ্যকার্য না করিলেও স্বর্গে যাইবেন।"[৩] শেখ জমিরুদ্দীনের দাবী হজরত মহম্মদ শ্রেষ্ঠ নবী—এটা অস্বীকার করে পাদরী জন টেকল 'শ্রেষ্ঠ নবী কে ও মুনশীর ভুল' (১৯১৩) শিরোনামে গ্রন্থ লিখেন। বলা বাহুল্য, তিনি হজরত ঈসাকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।[৪] কোরান বহুবিবাহের প্রশ্রয় দেয়, ধর্মপুস্তক বাইবেলে একটি মাত্র বিবাহের বিধান আছে পাদরীগণের

১ প্রচারক, চৈত্র ১৩০৬
২ ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭
৩ চন্দ্রনাথ সরকার বরিশালের অক্সফোর্ড মিশনের দেশীয় পাদরী ছিলেন। একজন ধার্মিক ও সমাজকর্মী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল।
৩ ইসলাম-প্রচারক, আগস্ট ১৮৯৯
৪ জে. টেকল—শ্রেষ্ঠ নবী কে ও মুনশীর ভুল, ব্রাহ্মনবাড়িয়া, ১৯১৩; বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১৯১৩

প্রচারিত এরূপ একটি অভিযোগের প্রতিবাদে শেখ জমিরুদ্দীন 'বাইবেলে বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি লেখেন। কোরানে কোথায় কি পরিস্থিতিতে চারটি বিবাহের কথা বলা হয়েছে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং মূলতঃ একবিবাহ অভিপ্রেত তার সপক্ষে যুক্তি দেখান।[১] পক্ষান্তরে বাইবেল থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে 'ধর্মপুস্তকে' বহুবিবাহেব প্রশ্রয় আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।[২]

"খৃষ্টান পাদরীগণ প্রায় বলিয়া থাকেন যে 'দীন ইসলাম' তলোয়ার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জোর করিয়া লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেলে প্রেম প্রচারিত হইয়াছে। 'দীন ইসলাম' যে তলোয়ার দ্বারা প্রচারিত হয় নাই, তাহা আমাদিগের 'তাওয়ারিখ মোহাম্মদী' পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু খৃষ্টানী ত্রিত্বময় ঈশ্বর ও খৃষ্টানী দেবতারা এতই অন্যায় যুদ্ধ করিযাছেন, যাহা পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। জগতে অন্য কোন জাতি এরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমরা এখন বাইবেল হইতে দেখাইতেছি যে, সেগুলি যুদ্ধ না প্রেম।"[২] এরপর লেখক বহু ঘটনার উল্লেখ করে ও উদ্ধৃতি দিযে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করেছেন 'বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা' প্রবন্ধে। তিনি যখন খ্রীস্টান ছিলেন তখন তাঁর নিজেবই অভিযোগ ছিল যে, কোরানে হস্তক্ষেপ হয়েছে, আসল কোরান আর এখন নেই।[৩] 'বাইবেলেব পরিবর্তন' প্রবন্ধে তিনি পাদরী সি. বমওয়েচের বঙ্গানুবাদিত বাইবেল অবলম্বনে 'ধর্মপুস্তকে' কিভাবে পরিবর্তন এসেছে তার ধারাগুলি উল্লেখ করে দেখান।[৪] তিনি এরপর প্রশ্ন করেন, "যদি এখন পাদ্রী

---

১ প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেন : "এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায ব্যবহার করিতে পারিবে তবে তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই তিন ও চারি নারীর পানি গ্রহণ করিতে পার ; পরন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে (বিবাহ করিবে) অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপব অধিকাব লাভ করিয়াছে তাঁহাকে (পত্নীস্থলে গ্রহণ করিবে), ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্তী।" সুরা নেসা, ৩ আযেৎ।—ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর ১৮৮৯, পৃঃ ৮৭-৮৮

২ ঐ, নভেম্বর ১৮৯৯, পৃঃ ৬৯

৩ খ্রীস্টীয় বান্ধব, জুন ১৮৯২

৪ শেখ জমিরুদ্দীন বলেছেন যে, তিনি যখন কলিকাতার সি. এম. এস ডিভিনিটি কলেজে থিয়লজী পড়তেন তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বল সাহেব চার্চ মিশনারী সোসাইটির পাদরী বমওয়েচ সাহেবের ঐ বাইবেল খানি পড়াতেন ও বাইবেলের পরিবর্তনের কথা বলতেন। বমওয়েচের বাইবেল মূল গ্রীক ভাষার ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে অনূদিত।

ফাণ্ডার, পাদ্রী যাকুব, পাদ্রী ইমামুদ্দীন ও পাদ্রী সফদার আলী জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি করিতেন জানি না। এখন পাদ্রী রাউস, পাদ্রী কৈলাসচন্দ্র, পাদ্রী গোপালচন্দ্র, পাদ্রী ফিলিপ মহাশয়রা কি করিবেন করুন ও কি বলিবেন বলুন।"[১] লেখক একই সঙ্গে প্রতিবাদের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুর তুলেছেন।

জমিরুদ্দীনের অপর প্রবন্ধ 'বার্ণবার ইঞ্জীল'-এর বক্তব্য বিষয় হল: "বার্ণবার ইঞ্জীলে হজরত মহম্মদ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলিয়া খৃষ্টানেরা উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছে; কিন্তু সেল সাহেব (জর্জ সেল কোরানের অনুবাদক) তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। খৃস্টান পাদরী ও প্রচারকগণ। হে মনরো ও এফিফেনি প্রচার সম্পাদক! বল ভাই আর কত কাল সত্যকে গোপন রাখিবে? সত্বর সত্য প্রকাশ কর, নতুবা পরিণামে নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটিবে।"[২]

শাহ আবদুল্লা প্রথমে খ্রীস্টান ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং খ্রীস্টান-ইসলাম বাক্ ও মসিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'প্রচারকে' 'হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে পাদরী ডব্লিউ. ভি. মনরো একটি ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মনরোর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে তিনি "রেভাঃ ডব্লিউ ভি. মনরো সাহেবের প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেন। শাহ আবদুল্লার প্রতিবাদের ভাষা কঠোর ও বিদ্রূপাত্মক ছিল। তাঁর ধারণা: "যাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধি পরবশ ও ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া তর্কবিতর্কচ্ছলে বিবাদ ও তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাবিধ ব্যক্তিদিগের সহিত সাধুভাবে কোন শাস্ত্রীয় আলাপ হইতেই পারে না।"[৩] তিনি পাদরী সমাজকে আক্রমণ করে বলেছেন, "আমরা জানি যে, লম্বা একটা 'কেছাক' পরিয়া কোমরে একটা দড়ি বাঁধিবার অধিকার পাইলেই যে লোক পাদ্রী হয় এমত নহে। বরং অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ঐ লম্বা 'কেছাকে'র অন্তরালে পাদ্রী কিংবা ক্রাজিয়্যান নামধারী মহাপুরুষদিগের কোমরবন্দ দড়িতে শয়তান বাঁধা থাকে।"[৪] তাঁর প্রধান অভিযোগ যে, পাদরী মনরো তাঁর প্রবন্ধের 'সারভাগ অন্ধকারে রাখিয়া দুই একটা বাক্যের ছল ও বিভিন্ন মতের দুই একটি কথা লইয়া বিস্তর হাবুডুবু' খেয়েছেন; খণ্ডিত দৃষ্টি ও অভিপ্রেত মত দিয়ে

১ ইসলাম-প্রচারক, ডিসেম্বর ১৯০৫
২ ঐ, জুন ১৯০৫
৩ ঐ, ফেব্রুয়ারী ১৯০৩
৪ ঐ।

কোন বিষয়ের যথার্থ বিচার হয় না। তাই 'কর্তব্যের অনুরোধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিধায় পাদ্রী সাহেবের সুদীর্ঘ প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত' হয়েছেন তিনি। তাঁর 'ইঞ্জীল কেতাব' প্রবন্ধ 'ক্রিশ্চান ট্রাক্ট'-এর প্রতিবাদে রচিত। রাণাঘাটের 'আরবী ভাষাবিদ' পাদরী জন মনরো 'হজরত মোহাম্মদের বেগোনাহ থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলভী সাহেব-গণের শিক্ষা' নামে একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি কোরানের 'কতক-গুলি আযাতের অর্থ করিতে যাইয়া ভাষায় যেরূপ অনভিজ্ঞতা' প্রদর্শন করেন এবং সেই সূত্রে হজরত মহম্মদের প্রতি 'যেরূপ অযথা দোষারোপ' করেন, তারই প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর দিয়ে মৌলবী আনিসউদ্দীন আহমদ 'পাদরী মনরো সাহেবের ভ্রম সংশোধন' প্রবন্ধটি রচনা করেন। এটি 'মিহির ও সুধাকরে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[১] মোহাম্মদ এবরার আনসারী ইসলামের বিরুদ্ধে ত্রিত্ববাদী ফ্রিম্যানের আনীত অভিযোগগুলির উত্তর দিয়েছেন 'নব্য-ভারতে চেহলাম' প্রবন্ধে। ফ্রিম্যান ইসলামের ইতিহাস থেকে তথ্যোদ্ধার করে নিজ ধারণানুযায়ী কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেগুলি হল: ১. মুসলমানগণের নানাবিধ সদগুণ থাকা সত্ত্বেও তারা মহত্ত্বলাভ করতে পারেনি, তার কারণ ইসলাম ধর্মনীতি 'রূঢ়'। ২. মুসলমানদের স্বাভাবিক দোষগুলি সংশোধিত হওয়া অসম্ভব। ৩. তারা কোন কিছু রক্ষা করেনি বরং জগতের অন্য জাতির সুনীতিগুলি ধ্বংস করেছে। ৪. তারা আত্মকলহে পটু। ৫. ধর্মান্ধতা, পরকালসর্বস্বতা, অত্যাচার, বহুবিবাহ এবং দাসত্বপ্রথা প্রভৃতি কলঙ্করাজি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান।[২]

বাদপ্রতিবাদমূলক প্রবন্ধরাশির সহিত ঐসব লেখকের পুস্তকরাশি মিলিয়ে দেখলে খ্রীস্টান-ইসলাম দ্বন্দ্বের প্রকৃত ছবিটি উপলব্ধি করা যায়। মুনশী মেহেরুল্লার প্রায় ৭খানি, শেখ জমিরুদ্দীনের ৭ খানি, শাহ আবদুল্লার ১ খানি, আবদুল লতিফ আহমদের ১ খানি, আবদুল গণি আলার ১ খানি গ্রন্থ এই উদ্দেশ্যে রচিত। অংশত আলোকপাত করা হয়েছে এমন গ্রন্থও অনেক রচিত হয়েছে, যেমন শেখ আবদুর রহিমের 'হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১২৯৪), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের 'এসলামতত্ত্ব' (১২৯৫), আমীর আলীর 'স্পিরিট অব ইসলাম' (১৮৯১) ইত্যাদি। ঈষৎ পরবর্তীকালে রচিত মোহাম্মদ গোলাম লতিফের 'ইসলাম প্রভা' (১৯০৮) গ্রন্থখানি খ্রীস্টান ও অন্যান্য ধর্মের প্রভাব

১ মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, পৃঃ ৫৫ (পাদটীকা)।
২ ইসলাম-প্রচারক, জুন ১৯০৫

থেকে ইসলামকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়।[১] তারপরে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা লেখেন 'খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৩১৮) শীর্ষক আক্রমণাত্মক বই। বাঙালী মুসলিম মানসচিন্তার এখানেই শেষ হয়নি; তাঁরা খ্রীস্টান মিশনের আদর্শে 'ইসলাম মিশন' স্থাপন করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামের প্রচার ও অভ্যন্তরীণ তমসা দূর করার চেষ্টা করেছেন। 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' (১৯০৪) ঐরূপ যৌথ ধর্মীয় চিন্তার ফল। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ছিলেন এরূপ পরিকল্পনার পুরোভাগে। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম অধিবেশনের সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবটি ছিল এরূপ: "অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানবসমাজের মধ্যে পবিত্রতম সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম ভাস্করের অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীদিগের অযথা আক্রমণ হইতে ইসলাম ধর্ম ও মোসলেম সমাজের রক্ষা বিধান এবং আবশ্যকমত আক্রমণগুলির প্রতি উত্তর প্রদান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীগণের প্রকাশিত ইসলাম ধর্মের গ্লানিকর ট্রাক্ট বা পুস্তিকাগুলির প্রতিবাদকরণ এবং বিধর্মীগণের আরোপিত সন্দেহভঞ্জন, হত-চেতন মোসলেম সমাজের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি ও ধর্ম বিস্তৃতি এবং ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রকারে উন্নতি চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষায় নানাবিধ ট্রাক্ট্ বা পুস্তিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ করা।"[২] সমিতির কার্যাবলীতে ইসলাম প্রচারকদের ট্রেনিং দেওয়া, জেলায় জেলায় মিশনের শাখা স্থাপন করা, মিশন ফাণ্ড খোলা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, গ্রন্থাগার তৈরী করা ইত্যাদি বিষয়ের পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বক্তৃতা, পত্রিকা, প্রবন্ধ, পুস্তক, সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপক চিন্তা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। খ্রীস্টানের আক্রমণের স্থল ছিল কোরান, মহম্মদ এবং ইসলামের ধর্মনীতি। মুসলমান প্রবক্তারা একাধারে খ্রীস্টানের অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন ও পাল্টা আক্রমণ করেছেন এবং অন্যধারে ইসলামের মহিমা প্রচার করেছেন। তাঁদের আক্রমণের ক্ষেত্র ছিল খ্রীস্টানের ত্রিত্ববাদ, প্রভু যীশুখ্রীস্ট, ধর্মপুস্তক বাইবেল এবং খ্রীষ্টান সমাজের আচারবিধি। এসব বাদ-প্রতিবাদ, আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে বাংলার মুসলমানের ধর্মীয় চেতনা, সমাজ-সংহতি ও অস্তিত্ববোধ জাগ্রত হয়। এরূপ ধর্মকলহের মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যেমন হিন্দু সমাজের

১ *Muslim Community in Bengal*, p. 331

২ মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী—বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি, ইসলাম-প্রচারক, মে-জুন ১৯০৪

ঐ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তেমন মুসলমান সমাজের স্বধর্মপ্রীতি ও সমাজচেতনার উন্মেষ হয় এবং নবজাগরণ ও আত্মবিকাশ সংঘটিত হয়।

ইসলাম, হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার নিয়ে বিরোধ একটা অংশের মধ্যে বরাবর ছিল। ধর্মবিশ্বাস, ধর্মনীতি ও ধর্মাচরণের পার্থক্য থেকে এ বিরোধের উৎপত্তি। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোকপাত করেছি।[১] ধর্মাদর্শ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে, খ্রীস্টান-মুসলমানের ধর্মনীতি নিয়ে প্রত্যক্ষ বাক-বিতণ্ডা হয়েছে। বাইরের কতকগুলি ধারণা ও আচার-আচরণ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মসিযুদ্ধ হয়েছে। গো-হত্যা নিয়ে শুধু মসিযুদ্ধ হয়নি, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। মসজিদের সম্মুখ দিয়ে ঢোল-বাদ্য সহকারে পূজার শোভাযাত্রা এবং মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে মহরমের তাজিয়াসহ শোকমিছিল করার ঘটনা নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ, হানাহানি হয়েছে। আলোচ্য যুগে মুসলমান সমাজকর্মী, চিন্তাবিদ ও ধর্মনেতাগণ ধর্ম সংস্কারের যে দিকটি বড় করে দেখেছেন, সেটি হল মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুর কতক দেবদেবীর পূজা ত করেই, উপরন্তু তদনুকরণে পীরপূজা, কবর-পূজা ইত্যাদি বেশরাহ্ ধর্মাচরণও পালন করে। হিন্দুর ধর্মীয় সামাজিক আমোদ-প্রমোদমূলক উৎসবে যোগদান, বর্ণভেদ প্রথা ও বিধবা বিবাহ রীতি অনুসরণ করা, হিন্দু নাম গ্রহণ করা ইত্যাদির মধ্যে ধর্মচ্যুতির দোষত্রুটি ধরেছেন তাঁরা। এগুলি দীর্ঘকাল ধরে উভয় সম্প্রদায়ের একত্র বসবাসের ফল। প্রকৃত ধর্মশিক্ষা ও প্রচারের অভাবের কারণে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা পূর্বপুরুষের সংস্কার ও বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ধর্মসংস্কারক ও ধর্মপ্রচারকগণ সমাজজীবন থেকে এগুলির প্রভাব দূর করার আন্দোলন করেছেন।

এ সময়ে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রত্যহ দ্বন্দ্ব হয়েছিল। রাজা রাম-মোহন রায়কে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। রামমোহন আরবী-ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাটনায় ঐ দুটি ভাষা শিক্ষা ও ইসলামী শাস্ত্র পাঠ করেন। ইসলামের একেশ্বরবাদের আদর্শে তিনি বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের আদর্শ প্রচার করেন। আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি আকার-প্রকারহীন সর্বগুণান্বিত

১ এ-অধ্যায়ের 'সমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য।

ও সর্বশক্তিমান আধ্যাত্মিকসত্তা। ব্রাহ্মধর্মে অবাঙমানসগোচর, শব্দাতীত ও স্পর্শাতীত ব্রহ্মার আরাধনার কথা বলা হয়েছে। খ্রীস্টানের ত্রিত্ববাদের কেন্দ্র-বিন্দুতেও আছে একেশ্বরবাদিতা। রামমোহনের এরূপ ব্রহ্মবাদের চিন্তার পশ্চাতে প্রধান কারণ খ্রীস্টানধর্মের প্রভাব থেকে শিক্ষিত হিন্দু সন্তানদের রক্ষা করা। ঐ সময় খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রভাবে অনেকেই খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। রামমোহনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) পত্রিকার মৌলিক আবেদন ছিল 'মিশনারীদের তরফ হইতে হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণ বোধে প্রতিবাদ করা।'[১] তিনি প্রথমে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) এবং পরে 'ব্রাহ্ম-সমাজ' (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম সংস্কারের আদর্শ নিয়েই।[২] পরবর্তী-কালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) এবং তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা' (১৮৪১) 'সর্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্ম বিদ্যা প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।'[৩] এ সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নেতৃত্ব দেন। সদর ও মফস্বলে ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়; ধর্মগ্রন্থ, পত্রিকা ও প্রচারক মারফত ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্য শুরু হয়। ক্রমে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪) ব্রাহ্মধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি ১৮৫৭ সালে ঐ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি এই ধর্মকে বাংলার বাইরে ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলেন। কেশবচন্দ্র সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরারে'র এক সংখ্যায় (১ জানুয়ারী ১৮৬৬) বাংলা ও বাংলার বাইরে মোট ৫৪টি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার খবর দেয়।[৪] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ইণ্ডিয়ান মিরার ছাড়া সত্তর দশকের দিকে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত ও পরিচালিত আরও ১২ খানা ইংরাজী-বাংলা পত্রিকা চলত, যথা ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪), সত্যান্বেষণ (১৮৬৫), সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী (১৮৬৫), ধর্মপ্রচারিণী (১৮৬৪), ন্যাশনাল পেপার, ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১), বিজ্ঞাপনী (১৮৬৫), বর্ধমান মাসিক পত্রিকা (১৮৬৬), সুলভ সমাচার (১৮৭০), বঙ্গবন্ধু (ঐ), বালকবন্ধু (১৮৭৮) ও তত্ত্বকৌমুদী। কেশব-চন্দ্র নেতৃত্বভার গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জোরদার করেন। তিনি ১৮৬৫ সালে প্রথমবার এবং ১৮৬৯ সালের মার্চে দ্বিতীয়বার

১ বাংলা সাময়িক পত্র, পৃঃ ১৫ (৪র্থ সং)
২ বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, পৃঃ ৬১
৩ বাংলা সাময়িক পত্র, পৃঃ ৮১
৪ বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, পৃঃ ২২৯-৩০

ও ডিসেম্বরে তৃতীয়বার ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে গমন করেন এবং ব্রাহ্ম সভা ও ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরই উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম 'ব্রহ্মোৎসব' পালিত হয়। 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম মন্দির' (১৮৬৯) প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ঢাকায় দুদিন ধরে উৎসব হয়, ঢাকার নবাব আবদুল গণি সে উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় 'একজন উৎসাহপূর্ণ সরলহৃদয় মুসলমান যুবা' ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।[১] কেশবচন্দ্র অত্যন্ত সুবক্তা ছিলেন। ৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ সালে ঢাকায় একটি সভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি ৩৫ জনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন।[২] তখন থেকে ব্রাহ্মদের কর্মতৎপরতা ও দীক্ষাদানের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করত, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'হিন্দুহিতৈষিণী' (১৮৬৫), 'হিন্দুরঞ্জিকা' (১৮৬৬), 'সনাতন ধর্মোপদেশিনী' (১৮৭০) প্রভৃতি পত্রিকা ব্রাহ্মধর্মের প্রচাররোধ করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ঢাকা, দ্বিতীয়টি রাজশাহী, তৃতীয়টি কলিকাতা থেকে বের হত। হিন্দুহিতৈষিণীর পরিচয় প্রসঙ্গে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (১১ জুলাই ১৮৬৫) লেখা হয়, "অল্পদিন হইল ঢাকায় হিন্দুহিতৈষিণী নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষার্থ প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দু-হিতৈষিণী পত্রিকাখানি এই সভার মুখপত্র স্বরূপ।"[৩]

মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়াটিও সমকালীন পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় প্রতি-ফলিত হতে দেখা যায়। 'এসলামতত্ত্বে'র (১২৯৫) লেখক চতুষ্টয়, যাঁরা পরে 'সুধাকর' (১২৯৬) প্রকাশ করেন, তাঁরা এসলামতত্ত্ব ও সুধাকরে ব্রাহ্ম-ধর্মের প্রচারশীল নীতির কথা প্রথম সমাজকে অবহিত করেন এবং সেই সঙ্গে প্রতি-রোধের কথা চিন্তা করেন। এসলামতত্ত্বের ভূমিকায় লেখা হয়, "...অপর

১ রেয়াজদ্দিন আহমদের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ঐ সময় জালালউদ্দীন নামে একজন যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করে। সেই সম্ভবতঃ এই দীক্ষিত 'উৎসাহপূর্ণ সরল হৃদয় মুসলমান যুবা'। তার ধর্মান্তর গ্রহণে ঢাকার মুসলমানদিগের প্রতিক্রিয়া হয়, জালালউদ্দীন ঢাকা ত্যাগ করে জলপাইগুড়িতে আশ্রয় নেয়। মোহাম্মদ ইদরিস আলী—এসলামতত্ত্ব, মাহে নও, জুন ১৯৫৪

২ উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়—আচার্য কেশবচন্দ্র শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ খণ্ড, কলিকাতা ১৯০৮, পৃঃ ৫২৬-২৭

৩ বাংলা সাময়িক পত্র, পৃঃ ২০৩

এক সম্প্রদায় একেশ্বর-বাদিদ্বের ভাণ করিয়া ধর্মপ্রচারক ও তত্ত্ববাহকের (পয়-গম্বরের) আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের দুই একটা মহা-পুরুষ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া স্ব স্ব বিকৃত মস্তিষ্ক ও চিন্তাদৌর্বল্যের পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। কেবলমাত্র বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক গোপনে ব্রাহ্মমত স্বীকার করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এসলাম ধর্মবিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি বর্তমান থাকিলে তাহাদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইত না।··· আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের চক্ষে অঙ্গুলি নির্দেশ-পূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাম ধর্মই প্রকৃত ধর্ম।"[১] মুসলমান সমাজের লোকদের এই ধর্মত্যাগের পথরোধ করার উদ্দেশ্যেই এসলামতত্ত্বলেখার পরিকল্পনা। সুধাকরের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণ এবং ব্রাহ্ম-মুসলমানের বিতর্কের সংবাদ প্রকাশিত হয়। "কোচবিহার অন্তঃপাতী হলদীবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত ইয়ানতুল্লা প্রধান প্রভৃতি মুসলমান ভ্রাতৃগণ কিছু কিছু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত থাকিয়া, নবধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, এবং পিতৃ-মাতৃ বহিষ্কৃত অল্পবুদ্ধি কতিপয় মুসলমান উহাদের দলবৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহাতে ভোগডাবুরী নিবাসী ধার্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত মুন্সী হেমায়েতুল্লা বসুনীয়া সাহেব মর্মান্তিক কষ্ট অনুভব করাতে ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা ভাষাবিদ মোসলমান ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মৌলবি আনয়নপূর্বক একটি সভা আহুত করেন।...গত ২৭ ও ২৮ এ ভাদ্র সভার অধিবেশন হয়।... কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় ও কোচবিহারস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক মহোদয়, নবধর্মদীক্ষিত শ্রীযুক্ত ইয়ানতুল্লা প্রধানের পক্ষ সমর্থন করেন।"[২] সুধাকরগোষ্ঠীর অপর পত্রিকা 'ইসলাম-প্রচারক'কেও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সূচনায় লেখা হয়, "এই ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম) দিন দিন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একঘেয়ে বাঙ্গালা শিক্ষার যে ফল, তাহা এই ক্ষেত্রে বিকাশ পাইয়াছে। অতএব ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও ব্রাহ্মধর্মের অযৌক্তিকতা মধ্যে মধ্যে 'ইসলাম প্রচারকে' দেখান হইবে।"[৩] ইসলাম-প্রচারকের 'জাতীয় ধর্মসংবাদ' অংশে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রভাব সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশিত হত।

সেকালের অনেক চিন্তাবিদের ধারণা হয়েছিল যে, বাংলার মুসলমানের অধঃপতনের প্রধান কারণ হল ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। ইসলামের

১ এসলামতত্ত্ব, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১২৯৫

২ সুধাকর, ২৩ কার্তিক ১২৯৬, পৃঃ ৬-৭

৩ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮

শরাহ্-শরীয়ত মত ধর্মকর্ম না করে তারা বেশরাহ্-বেদাত কর্মে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, এ বেশরাহ্-বেদাত আচারগুলি এসেছে হিন্দুধর্ম থেকে। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে গ্রহণ ও পালন না করার জন্য মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক রীতিনীতি প্রবেশ করে জাতীয় চরিত্রকে হীনবীর্য ও হীনমন্য করে তুলেছে। ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের ধর্ম সংস্কারের একটি প্রধান দিক ছিল, সমাজে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কারগুলি দূর করে ইসলামের শরীয়তী আদর্শ স্থাপন করা। সাময়িকপত্র ও পুস্তকগুলি সেই আদর্শেরই প্রতিধ্বনি তুলেছে। ১২৯৯ সন আষাঢ় সংখ্যায় 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয়: "হজরত মাওলানা কেরামত আলী মরহুম মগফুরের আগমনের পূর্বে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান পৌত্তলিকতামূলক কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।... মুসলমানগণ নামাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মকর্ম ছাড়িয়া দিয়া, নানা প্রকার হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মনসাপূজা, শীতলাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, সত্যপীরের পূজা, কালীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ এ সমস্ত কার্য্য মুসলমান জনসাধারণ মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ব্যতীত পীরপূজা, দরগাপূজা, দরগাঘরে নানাবিধ বেদাতী কার্য্য, মহরমের সময় তাজিয়াদারী, জারিগান, গাজীর গীত ইত্যাদি শত শত প্রকার ধর্ম বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ, খৎনা ও স্ত্রীলোকের প্রথম রজস্বলা উপলক্ষে জঘন্য আমোদ প্রমোদ, বাদ্য বাজনা প্রভৃতির বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হইত।"[১] ১৮৯৭ সালের মার্চ সংখ্যায় 'হাফেজ' পত্রিকায় 'সেরেক ও বেদাত' প্রবন্ধে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। "আমাদের এই হিন্দুস্থানবাসী মুসলমান নামধারী ভ্রাতাগণের মধ্যে যে কত শত নূতন মনগড়া কার্য্য প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না,...খৎনার সময় আমোদ আহ্লাদ লোকজন খাওয়ান,...তাজিয়া বাহির করা, মহরমের মজলেস করা, আলম করা, মেহদী বানান, মৃত্যুর চতুর্থ (চাহারাম), দশম (দশা), ৪০ দিন, ছয় মাস বা ১ বৎসরে মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য কোন প্রচার কার্য্য করা, কবর চাদর দ্বারা ঢাকা,... সন্ধ্যার সময়ে কবরে চেরাগ দেওয়া...বিধবার পুনর্বিবাহ না দেওয়াকে আয়েব জানা প্রভৃতি এরূপ কার্য্য আছে, যাহা কোরান ও হাদিস শরিফে নাই।...যাহা হউক, যখন ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন আমাদের উচিত, পয়গম্বর সাহেবকে বিচারক নিযুক্ত করা।"[২] হিন্দুজাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের আন্দোলনের যুগে কোন কোন হিন্দু লেখকের লেখায় মুসলমানের ইতিহাস,

---

১ ইসলাম-প্রচারক, আষাঢ় ১২৯৯

২ হাফেজ, মার্চ ১৮৯৭, পৃ: ১৩৭

ঐতিহাসিক চরিত্র, ইসলাম ধর্মনীতি, হজরত মহম্মদ এবং মুসলমান জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হলে মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'এক হাতে কোরান ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে মুসলমানগণ ধর্মপ্রচার করেছেন।' 'ধর্মযুদ্ধে জয়ী হলে গাজী, আর মৃত্যু হলে শহীদ—এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলমানগণ ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হতেন।' হিন্দু লেখকগণ এ ধরনের মন্তব্য করতেন।[১] এতে মুসলমানদের ধর্মানুভূতি আহত হত। 'অর্চনা' মাসিক পত্রে (শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১২) কেশবচন্দ্র গুপ্ত 'ধর্মদ্বেষিতা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি সেখানে কতকগুলি মন্তব্য করেন, যথা—"খৃষ্টান এবং মুসলমান যখন বুঝিতে পারে, একটি ব্যতীত জনম নাই, এই জনমের কার্য-কলাপের সহিত অনন্তকাল ব্যাপী সুখ-দুঃখের সম্পর্ক...নিজধর্মে অপরকে দীক্ষিত করা একটা মহাপূণ্যকর্ম, তখন অপরকে আপনার ধর্মশ্রেণীভুক্ত করিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে আপনা আপনিই সমুত্থিত হয়।" "পাড় মহম্মদীয়গণ স্বকীয় ধর্মে কাফের-দিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য উষ্ণ নরশোণিতে ধরিত্রীর শস্যশ্যামল মাটি লোহিত বর্ণে চিহ্নিত করিয়াছিল।"[২] কোহিনুর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী 'মাসিক সাহিত্যসমালোচনা' অংশে এবং আহমদ কবীর 'ইসলাম ও হিন্দুধর্ম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র গুপ্তের রচনার প্রতিবাদ করেন। আহমদ কবীর বলেছেন, "বল প্রয়োগপূর্বক অন্যকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিবার আদেশ কোরানের কোন স্থানে লিখিত নাই। কোরানে ঈশ্বরের আদেশ এই যে, "ধর্মবিষয়ে বল প্রয়োগ করিও না।...লোকদিগকে জ্ঞানের সহিত এবং নম্রতার সহিত পরমেশ্বরের পথে আহ্বান কর এবং তাহাদের সঙ্গে ভদ্রতার সহিত ধর্মবিষয়ে তর্ক কর'।"[৩] 'তিনি সেখানে বলেছেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধ করেছেন রাজনৈতিক কারণে, ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে নয়। ইসলাম ধর্মের এরূপ সমালোচনা ও মুসলমানের ধর্মচ্যুতির কারণে সমাজ-পতিগণ বিচলিত হয়েছেন। তাঁরা এসবের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, এগুলির প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং সমাজের মানুষের মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য ও আদর্শ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক ও বাংলা ভাষায় ধর্মপুস্তকের অভাবের জন্য সাধারণ মানুষ নিজেদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেছে, তারা অন্যদের প্রচারে সহজেই বিভ্রান্ত ও প্রলোভিত

১ ইসমাইল হোসেন সিরাজী—নবনূর ও জেহাদ, ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০, পৃঃ ৪৪৭
২ কোহিনুর, আষাঢ় ১৩১২, পৃঃ ৭৮
৩ ঐ, আশ্বিন ১৩১২, পৃঃ ১৮৪

হয়েছে। এদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে পীর-দরবেশ, মৌলবী-মৌলানা, মুনশী-মোল্লাগণ ইসলাম চর্চা ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। সমাজের অধঃপতনের যুগে তাঁরা উচ্চ শিক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হয়ে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। যে নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা থাকলে লোকে মুগ্ধ হয়, ঐ শ্রেণীর ধর্মপ্রচারক তা হারিয়ে ফেলেন। ক্রমে তাঁরা ধর্মপ্রচারকে ব্যবসায় হিসাবে গ্রহণ করেন। পীর-মোল্লা-আলেমদের অযোগ্যতা, আদর্শহীনতা ও নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ করে ঐ সময়ের পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়। ''বঙ্গদেশের ধর্মপ্রচারক মৌলবীর সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু তাঁহারা বিধর্মীর নিকট ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত পাত্র নহেন। আবার তাঁহারা নিজের পেটের চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে, সমাজের কল্যাণচিন্তা আদৌ স্থান পায় না।...আবার মৌলবী সাহেবগণ বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের 'ওয়াজ-নসিহত' উর্দু ভাষায় সম্পন্ন হইয়া থাকে।...একজন নাস্তিক, একজন হিন্দু, একজন খ্রীষ্টিয়ান বা ব্রাহ্ম আসিয়া একটি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিলে মৌলবী সাহেবের চক্ষু স্থির। এরূপ অবস্থায় আমাদের মৌলবী সাহেবগণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের নিকট কিরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তাহা ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য।''[১]

বাংলা ভাষায় ধর্মপুস্তকের অভাবের কথা প্রথম অনুভব করেছিলেন টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন তৎপর কলিকাতার সুধাকর-গোষ্ঠীর লেখকগণ ও রাজশাহীর মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। নঈমুদ্দীনের 'কোরানের বঙ্গানুবাদ', 'ফতুয়ায়ে আলমগীরি', মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন ও অন্যান্যের রচিত 'এসলামতত্ত্ব', ইউসুফ আলীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' রচনার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সারমর্ম ও রীতিনীতি বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তখন থেকে শুরু করে ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর লেখকের হাতে বহু ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুনশী মেহেরুল্লা 'হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' ও 'বিধবাগঞ্জনা' পুস্তকে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রতি সরাসরি কটাক্ষ করেছেন। গোলাম কিবরিয়ার 'উচিত কথা'য় হিন্দুধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আছে। এসব প্রশ্নে তাঁরা মুক্তির পথ অনুসরণ করেননি, বরং ধর্মান্ধতা ও ধর্মবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জিইয়ে তুলেছেন। শেখ জমিরুদ্দীন, শাহ আবদুল্লা, মোহাম্মদ এব্রাহিম, দীন মোহাম্মদ গাঙ্গুলী, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, আনিসউদ্দীন আহমদ পারিলী প্রমুখ বক্তা ও লেখক কমবেশী ঐ ধারাকেই লালন করে গেছেন। মৌলানা কেরামত আলী এবং তৎপুত্র আবদুল হাফিজ, হুগলীর ফুরফুরার পীর

১ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮, সূচনা' দ্রষ্টব্য।

আবু বকর, যশোহরের আবদুল মজিদ লাহুরিয়া প্রমুখ ধর্মনেতার ভূমিকাও স্মরণ করতে হয়। এঁদের প্রভাব সমাজের গভীরে ছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বলে আখ্যায়িত করে কেরামত আলী জৌনপুরীই ওয়াহাবী ভাবধারার প্রভাব থেকে দেশবাসীর আবেগ ও দৃষ্টিকে মুক্ত করেন। তিনি ও অন্যান্য ধর্মনেতা ধর্মীয় সভায় যোগদান করে ইসলামের বিরুদ্ধে আনিত অভি-যোগের উত্তর, ইসলামের মাহাত্ম্য ও গৌরব, মুসলমানের ধর্ম ও ধর্মপালনের রীতি-নীতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতেন। আখবারে এসলামীয়া, আহমদী, সুধাকর, প্রচারক, ইসলাম-প্রচারক প্রভৃতি পত্রিকার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। এর সঙ্গে দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন আঞ্জুমনগুলির ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত করলে ইসলাম ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পুরো রূপটি প্রকাশ পায়। 'নূর-অল-ঈমান সমাজ', 'আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম', 'আঞ্জমনে মঈনাল এসলাম', 'আঞ্জুমনে আশ-আতে- ইসলাম', 'ধর্মোত্তেজিকা সভা', 'আঞ্জমনে নূরুল ইসলাম', 'আঞ্জমনে মফিদুল ইসলাম', 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া', 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মূলতঃ ধর্মভিত্তিক; কোন কোনটির ধর্মের সাথে সামাজিক ও রাজ-নৈতিক ভূমিকাও ছিল। সর্বতোভাবে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজের স্বার্থ-রক্ষা করে আঞ্জমনগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত। অনেক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেছে এবং ধর্মীয় পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান করেছে।

ইসলাম ও বাউল মতবাদ

সতের শতকের শেষের দিকে অথবা আঠার শতকের গোড়ার দিকে বাউল মতবাদের জন্ম হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে লৌকিক ধর্মমত, বাংলার মাটি এর লালন ও চারণ ক্ষেত্র। সুফীবাদ, বৈষ্ণবধর্ম, নাথধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনার সমন্বয় সাধন করে বাউল মতবাদের উদ্ভব হয়। শ্রেষ্ঠ বাউল লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বাউল গানই বাউলদের সাধনার অঙ্গ। এছাড়া, অন্য কোন দর্শন বা শাস্ত্র তাদের নেই। গানের মাধ্যমে তারা তাদের আরাধ্যের অনুসন্ধান করে। পারিভাষিক শব্দে তিনি বলেন 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি', 'মন মনুয়ার', 'অধরা', 'অটল' প্রভৃতি। জীবদেহেই তাঁর অধিষ্ঠান। দেহভাণ্ডকে জানলে ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যাবে—এই তাদের ধর্ম-দর্শন। বেদের 'আত্মানং বিদ্ধি' বা সুফীর 'মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু' —নিজেকে জানলে ঈশ্বরকে জানা যায়, বাউল দর্শন এই ধর্মনীতির অনুসারী।

বাউলরা জাতির বিচার করে না অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ, উচ্চ-নীচ বর্ণভেদ, ধনী-নির্ধন শ্রেণীভেদ মানে না। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শাস্ত্রধর্মে ও সামাজিক নীতিতে এসবেরই নানা বাছবিচার বিদ্যমান। ইসলাম নীতিগত-ভাবে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ বহন করলেও ব্যবহারিক জীবনে তা রক্ষিত হয়নি। লালন শাহ প্রমুখ বাউলরা শাস্ত্র বা শরীয়তীধর্মের কঠোর নিয়ম তান্ত্রিকতা ভেঙে দিয়ে একটি উদার মানবতাবাদ এবং সহজপন্থী মরমীয়াবাদের সৃষ্টি করেন। লালন কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় আস্তানা করে সাধনা করতেন। কৃষক ও তাঁতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাউল মতে দীক্ষা নিত। লালনের কয়েক লক্ষ বাউল শিষ্য ছিল। বাউলরা মুখ্যতঃ বিবাগী, তারা চাষাবাদ, তাঁতবোনা প্রভৃতি স্বাভাবিক জীবিকা ছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করত। বাউল মতে দেহসাধনার কথা আছে, তান্ত্রিকদের মত তারা নারীসঙ্গম ও মদ্যপানাদি সমর্থন করে। এই বামাচারী তামসিক ধর্মাচরণের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বাউলদের সুনজরে দেখত না, বরং সামাজিক অনাচারের ভয়ে তারা বাউলদের বিরূপতা করে উৎপাত করার চেষ্টা করেছে। মুসলমান যুবকেরা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বাউলমতে দীক্ষা নিত, শরীয়তপন্থী মুসলমানরা এটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। মোল্লা-মৌলবীরা 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া' পর্যন্ত জাহির করেছিলেন। লালন শাহের জীবিতকালেই বাউলবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। লালন নিজেই কয়েকটি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ বলেছেন, 'বাহাস করিতে এসে বয়াত হইনু, আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু।' কুষ্টিয়ার হিজলবাট গ্রামের মুন্শী তোফাজ্জল হোসেনের সাথে লালনের একাধিকবার কোরান-হাদিস নিয়ে বিতর্ক হয়। কাঙ্গাল (ছদ্মনাম) রচিত 'সহি আক্ষেপনামা' পুথিতে এ সবের বিবরণ আছে।[১] লালন বিদ্যাহীন প্রচার সর্বস্ব শরীয়তপন্থীদের আক্রমণ করে বলেছেন :

> বে-এলম, বে-মুরীদ জনা,
> শরীয়তের আঁক চেনে না,
> কেবল মুখে তোড় ধরে।[২]

তিনি শুষ্ক আচার-আনুষ্ঠানিকতারও বিরোধিতা করেছেন।

> কলমা আর নামাজ
> রোজা জাকাত হজ,

১ খোন্দকার রেয়াজুল হক—লালনশাহী ভাবসঙ্গীতে বাংলাদেশের সমাজচিত্র, পূর্বাচল, কার্তিক ১৩৮৩, পৃ: ৩৭

২ খোন্দকার রফিউদ্দীন—ভাবসঙ্গীত, পৃ: ১৬

এই করিয়ে আদায় কর শরিয়ত?
আমি ভাবে বুঝতে পাই
এসব আমল শরিয়ত নয়
আরো কিছু অর্থ থাকতে পারে।[১]

বাউলের কোন সংগঠন ছিল না, মৌখিক গান ছাড়া লিখিত কোন বিধি ছিল না, তারা বৈষয়িক চিন্তা অপেক্ষা পারমার্থিক ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। লালনের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তিও ছিলেন না। এসব কারণে বাউলেরা সহজে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে, তাদের অনেকে শাস্ত্রধর্মে ফিরে গিয়ে গৃহধর্ম পালন করতে থাকে। ওয়াহাবী-ফারায়েজী ধর্মসংস্কারের সময় থেকে বাউলদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়।[২] পরবর্তীকালে সভাসমিতি, পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে এদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। যশোহরের মুন্সী মেহেরুল্লা খ্রীস্টান মিশনারীদের মত বাউলদেরও বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান চালান। তিনি বক্তৃতা করে তাদের ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর জীবনীকার শেখ হাবিবর রহমান এক জায়গায় লিখেছেন, "এদেশের অনেক তথাকথিত মুসলমান এই তথ্য না বুঝিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীদের আদর্শে ফকির দরবেশ সাজিয়া দেশে নানা অনাচারের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারা নামাজ রোজা ইত্যাদি শরিয়তের অবশ্য প্রতিপাল্য কার্যসমূহ কিছুই করে না। নানা প্রকার চাতুরীর সহিত ইহারা লোকদিগকে মুগ্ধ করে। ইহাদের অনেকে এমনই অধঃপতিত যে কাপালিক অঘোরপন্থী ইত্যাদি হিন্দু সন্ন্যাসীদের অনুকরণে মলমূত্র পর্যন্ত আহার করিতে ঘৃণাবোধ করে না। এদেশে শত শত নেড়ার ফকির মুন্সী সাহেবের (মেহেরুল্লার) নিকট তওবা করিয়া খাঁটি চরিত্রবান মুসলমান হইয়াছিল।"[৩] তিনি 'মেহেরুল এসলাম' (১৮৯৭) গ্রন্থে বাউল বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরে লিখেছেন:

নাড়ার ফকির যারা আছে পায় পায়।
এই ঘোরে বহুজনে ফেলিল দাগায়।।
বহুতি আপসোস হয় তাহাদের তরে।
বানাইল পশু তারা বহুতর নরে।।[৪]

১ ভাব সঙ্গীত, পৃ: ১৬
২ বঙ্গে সুফী প্রভাব, পৃ: ১৯৯-২০০
৩ কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, পৃ: ১০০
৪ মেহেরুল এসলাম, পৃ: ৪৩ (৭সং)

তিনি বাউলদের 'ণ্ডমূর্খ ভেদুয়া' ও বাউলগানকে 'কাফেরী কালাম' বলে অভিহিত করেছেন।[১] মীর মশাররফ হোসেন 'সঙ্গীত লহরী'তে (১২৯৪) বাউলদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

ঠেটা গুরু ঝুটা পীর
বালা হাতে নেড়ার ফকীর,
এরা আসল সয়তান, কাফের বেঈমান
তাকি তোমরা জান না।[২]

মশাররফ হোসেন যখন এই কবিতা লেখেন, তখন লালন শাহ জীবিত ছিলেন। লাহিনীপাড়া ও ছেঁউড়িয়ার দূরত্ব অতি সামান্য। তিনি অত্যন্ত কাছে থেকে বাউলদের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যশোহরের হরিশপুর নিবাসী মোহাম্মদ ওসমান খান 'হেদায়েতল ফাসেকিন' (১৮৯৭) গ্রন্থে বাউলদের আচার-আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন। এই হরিশপুর ছিল লালনের জন্মভূমি। বশিরহাটের গোলাম কিবরিয়া ও কাজী কেরামতুল্লার রচিত 'উচিত কথা'য় (১৮৮৯) বাউলদের নিন্দা ও গালাগালি করা হয়েছে। সমকালীন সাময়িকপত্রেও তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালান হয়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'ইসলাম-প্রচারক' ঘোষণা করে, "ফকির মতাবলম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সমপ্রদায় ইসলাম ধর্মের ভীষণতম শত্রু। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, খৃষ্টিয়ান বা নাস্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধন না হইতেছে, মুসলমান নামধারী এই সকল ভণ্ড পাষণ্ডের দ্বারা তাহার শতগুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে। ইহাদের ভীষণ ও বীভৎস মতগুলি জনসাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, শিক্ষিত লোক এই সমপ্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক নহেন; কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া বিশাল মুসলমানের সমাজগঠিত, সেই সরল বিশ্বাসী মুসলমানগণ ইহাদের কুহকে পতিত হইয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিতেছে। ইহাদের পৈশাচিক ও পাষণ্ডোচিত কার্যকলাপের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা লেখনী কলুষিত করিতে পারিব না।...কতকগুলি ইন্দ্রজালিক কার্য ও ভেলকিবাজী দেখিয়া বর্ণজ্ঞানশূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানুকরণ করে। শত শত কৃষক ইহাদের কুহকে পতিত হইয়া কৃষিকার্য পরিত্যাগ করতঃ 'ফকির' নাম ধারণ করিয়াছে। এই জঞ্জালগুলির সংস্কার না করিতে পারিলে ইহারা শীঘ্রই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে।[৩] বাউলদের মধ্যে শিক্ষিত লোক না থাকায়

১ মেহেরুল এসলাম, পৃঃ ১২
২ মশাররফ রচনা-সম্ভার, পৃঃ ৬৭২
৩ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১৮৯৮

এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে কোথাও কোথাও তারা দলবদ্ধভাবে শরীয়তপন্থীদের ধর্মকর্মে বাধা দিয়েছিল। ইসলাম-প্রচারকে (ভাদ্র ১২৯৮) প্রকাশিত রাজশাহীর 'আঞ্জুমনে আহমদী'র এক প্রতিবাদপত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। বাউল বিরোধী আন্দোলন পরবর্তীকালেও চলতে থাকে। কুষ্টিয়ার কবুরহাট নিবাসী ফজলুর রহমানের 'ভণ্ড ফকীর' (১৩২১), নাটোরের দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদের 'সমাজ সংস্কার' (১৯১২), কুষ্টিয়ার বানিয়াকান্দির এমদাদ আলীর 'রদ্দে নাড়া' (১৩২৪, অপ্রকাশিত), শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদের 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' (১৩৩২, ২ সং) প্রভৃতি গ্রন্থে বাউলদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। এরূপ অন্দোলনের ফলে বাউলরা ক্রমশঃ কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তাদের অনেকে ইসলামের পথে ফিরে আসে। ফলে তাদের সংখ্যা ও প্রভাব হ্রাস পায়।

অন্তর্বিরোধ : সুন্নি ও শিয়া

"এদেশে হিন্দু-মুসলমানে সম্মিলন অপেক্ষা ব্রাহ্মণে-শুদ্রে, সিয়া-সুন্নিতে সম্মিলন অধিকতর দুর্ঘট।" উক্তিটি করেছেন নওশের আলী খান ইউসফজয়ী 'নবনূর' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩১২)। আমরা পূর্বে বলেছি, শিয়া-সুন্নির বিরোধের মূল কারণ হজরত আলীর খলিফাত্ব নিয়ে। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা কে হবেন এ নিয়ে মোয়াবিয়া ও আলীর সমর্থকদের বিবাদ হয়। হজরত আলী শেষ পর্যন্ত গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। মোয়াবিয়া খলিফা হলে আলীর সমর্থকগণ তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার না করে বিদ্রোহী হন, এজন্য তাঁদের 'উলভি' বা শিয়া বলা হয়। শিয়া-সুন্নির বিরোধের মূল কারণ এটা হলেও উভয়ের মধ্যে আরও মত পার্থক্য আছে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন, "শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর (মহরমের সময়) সুন্নিগণ ভাল মনে করেন না। বক্ষে করাঘাত করিলে বা শোকবস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা হইল এই যে, শিয়াগণ হজরত আয়েষা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবীয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়েষাকে নিন্দা করে।...সুন্নিগণ মাননীয়া আয়েষার নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। শিয়া সুন্নিতে এইটুকু মতভেদ। এ বিষয় লইয়াই দলাদলি।"[১] এদেশে শিয়াগণ 'মহরম' ও 'বেরা' নামে দুটি উৎসব করেন। মহরমের তাজিয়া, দুলদুল, দরগাহ নির্মাণ থেকে মাতম করা, জারি গাওয়া, লাঠি খেলা, শোভাযাত্রা করা

১ রোকেয়া রচনাবলী, পৃঃ ১২

ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে মূর্তি বা প্রতীক পূজার অনুকরণ আছে বলে সুন্নিগণ অভিযোগ করেন। হাসান-হোসেনের জোড়া 'মকবেরা'র উপর তাজিয়া নির্মাণ করে ঢোল-বাদ্য ও শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, এটি হিন্দুদের প্রতিমা বিসর্জনের অনুরূপ। সুন্নিগণ এটাকে বেদাত কার্য বলে মনে করেন। ভাদ্র মাসে 'বেরা' উৎসব হয়। কলার ভেলা তৈরী করে তাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভোগের দ্রব্যসহ খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে সেটি ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শরীয়ত মতে এটিও বেদাতী অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও ঢাকার ইমামবাড়া আছে। ঐ তিনটি স্থানেই শিয়াদের বসবাস আছে। ১৮৯৫ সালের ২৫ জুলাই 'মোসলেম ক্রনিকলে' হুগলীতে শিয়া-সুন্নির বিরোধের খবর আছে। ইমামবাড়ার তৎকালীন মতওয়াল্লী সৈয়দ আশরাফউদ্দীন আহমদ খান বাহাদুর উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় ও সম্প্রীতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐ বছর লক্ষ্ণৌতেও শিয়া-সুন্নির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। শিয়ারা কোরান-হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে হজরত আলীকে 'খলিফা বিলাফসল' প্রমাণ করলে সুন্নিগণ বিপরীত উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের মত অস্বীকার করেন—এ নিয়েই উক্ত বিবাদের সূত্রপাত।[১] শুধু ধর্মজীবন নয়, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনকেও এই দ্বন্দ্ব বিঘ্নিত করেছে। ১৯৩৭-৩৯ সালে ভারতবর্ষের মুসলমান রাজনীতিতে উত্তর প্রদেশের শিয়া-সুন্নির অন্তর্বিরোধ একটা কাল ছায়া ফেলেছিল।[২] তবে বাংলাদেশে শিয়া-সুন্নির বিরোধ কোন সময় তীব্ররূপ ধারণ করেনি। কারবালার আবেগময় কাহিনী ও অনুষ্ঠানাদি শিয়া-সুন্নি নির্বিশেষে বাঙালীর অন্তর্জীবন ও হৃদয়লোককে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। এখানে শিয়াদের দ্বারা সুন্নিরই প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কারবালার সেই বিবাদময় ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে মর্সিয়া, জারি' পুথিসাহিত্য এবং আধুনিকযুগে কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। লৌকিক চেতনা ও আবেগকে আশ্রয় করে জারিগান এবং শিক্ষিত মানুষের কল্পনা ও অনুভূতিকে আশ্রয় করে মর্সিয়া সাহিত্য বাঙালী মুসলমানের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল। মহরম উপলক্ষে যে লাঠিখেলা, শোক মিছিল, মেলা ইত্যাদি হয় তা সকল শ্রেণীর মানুষের মনে সাড়া জাগায়। মহরম ক্রমে মুসলমানদের 'জাতীয় উৎসবে'র
মানুষের মনে সাড়া জাগায়। মহররম ক্রমে মুসলমানদের 'জাতীয় উৎসবে'র
অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। আঠার-উনিশ শতকের পথিসাহিত্য কারবালার কাহিনীকে

---

১ *The Moslem Chronicle*, 8 August 1895, p.340

২ Amalendu De—*Islam in India* (a Research Paper), 1977, p.8

আরও আবেগধর্মী ও প্রাণস্পর্শী করে তোলে। উনিশ শতকের আট দশকে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' এক অনন্য রচনা: বাঙালী মানস ও মননের, আবেগ ও চিন্তার, বেদনা ও শোকানুভূতির একত্র সমন্বয় ঘটেছে বিষাদ-সিন্ধুতে। চট্টগ্রামের হামিদ আলী 'কাসেমবধ কাব্য' (১৩১১) ও 'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৩১৪) লিখে এ ধারাকেই পরিপুষ্ট করেছেন। মূলে যে কাহিনী মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়েছে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পরাধীনতা ও পতনের যুগে সেই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে ও উদ্দীপনা সঞ্চারে সহায়তা করেছে।

হানাফী ও মোহাম্মদী

শিয়া-সুন্নির মতবিরোধ অপেক্ষা সুন্নি শ্রেণীভুক্ত হানাফী-মোহাম্মদীর মত-বিরোধ গুরুতর ছিল। হানাফীগণ পীরবাদকে অস্বীকার করেননি। পীরবাদ ও পীরাচারকে কেন্দ্র করে এদেশে নানা কুসংস্কার গড়ে উঠেছে। পীরের আস্তানায় মাজার নির্মাণ, মাজার দর্শন, মাজারে মানত মানা, বাতি দেওয়া, শিরনী দেওয়া, সুতা বাঁধা ইত্যাদি কাজকে শরীয়তপন্থীরা অশাস্ত্রীয় আচরণ বলে মনে করেন। এ ছাড়া, কোন কোন নামাজ পড়ার পদ্ধতি, রোজা পালন ও সামাজিক প্রথা নিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে মতভেদ আছে। এই মতভেদের জন্য অনেক সময় সামাজিক লেনদেন ও বিবাহ সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয় না। কিছু মৌলিক, কিছু সাধারণ বিষয় নিয়ে এই মতবিরোধ তর্ক-বিতর্ক থেকে দলাদলি, মারামারি ও মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়িয়েছে। সমাজের দ্বন্দ্ব-কলহ বক্তৃতার সভাস্থল থেকে পত্র-পত্রিকায় ও প্রবন্ধ-পুস্তকে উঠে এসেছে। সমর্থকগণ সভাসমিতি করে দলবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ মতের মুখপত্র হিসাবে পৃথক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। টাঙ্গাইলের করটীয়ার 'আখবারে এসলামীয়া' এবং দেল-দুয়ারের 'আহমদী' পত্রিকা যথাক্রমে হানাফী ও মোহাম্মদী সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল। কলিকাতার 'সুধাকর' ও 'প্রচারক' ছিল হানাফী সমর্থক। ময়মনসিংহের এম.এস. নুরুল হোসেন কাশিমপুরী কর্তৃক সম্পাদিত 'হানিফি' (১৯০৩) পত্রিকা হানাফী সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল। মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মোহাম্মদী' (১৯০৩) মোহাম্মদী সম্প্রদায়কে সমর্থন দিত। পরবর্তীকালে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম ও মোহাম্মদ বাবর আলীর যুগ্ম-সম্পাদনায় 'আহলে হাদিস' (১৯১৫) প্রকাশিত হয় 'আঞ্জমন আহলে হাদিস' সমিতির মুখপত্র হিসাবে। পত্রিকার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মোহাম্মদী মতের সমর্থন দান এবং হানাফী মতের বিরোধিতা করা।[১] 'ইসলাম-প্রচারক' ও 'নূর-অল-ইমান' উভয় সম্প্রদায়ের

১ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃ: ৩৪৫

সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছে। মোহাম্মদ নইমুদ্দীন রচিত 'ইনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন' (১৮৮৯), 'এসবাতে আখেরজ্জোহর' (১৮৯১), 'রফা ইদায়েন' (১৮৯৬) ও 'আদেল্লায় হানিফীয়া বা রদ্দে লা-মজহাবী' (১৮৯৭) এই চারখানি গ্রন্থে তৎকালীন হানাফী ও লা-মজহাবী সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ডার কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলির কোন কোনটি 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত হয়। প্রথম ও চতুর্থ গ্রন্থ দুটিতে হানাফীমতের বিরুদ্ধে মোহাম্মদীদের আনীত অভিযোগের উত্তর আছে। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কতক বিষয়ে 'মসলা' বা নীতি-নির্দেশ নিয়ে এই বিরোধ দেখান হয়েছে। উভয় সম্প্রদায় রক্ষণশীল, তবে হানাফীগণ প্রচলিত ধারা অনুসরণ করতে চান, মোহাম্মদীগণ পিউরিটানদের মত মৌলিক শাস্ত্রকথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে চান---এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিরোধের উৎপত্তি।

নামাজ পড়ার সময় কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া আছে, 'রুকু' তার মধ্যে একটি।[১] রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় দু'হাত তোলার নিয়ম মোহাম্মদীরা মানেন, হানাফীরা মানেন না। রুকুর সময় হাত উঠানর রীতিকে 'রফা ইদায়েন' বলে। হজরত মহম্মদ প্রয়োজনবোধে উভয় প্রক্রিয়ায় নামাজ পড়েছেন। তৎসত্ত্বে কোনটির মসলা কি এই নিয়ে উভয় দলে বিবাদ। রমজান মাসে রোজা পালনের সময় রাত্রে 'তারাবী' ও 'বেতর' নামাজ পড়তে হয়। এগুলি দৈনিক পাঁচ বার ফরজ নামাজের অতিরিক্ত। হানাফীগণ ২০ 'রেকাত' তারাবী ও ৩ রেকাত বেতর মোট ২৩ রেকাত পড়েন, মোহাম্মদীরা ৮ ও ৩ বা ১০ ও ১ মোট ১১ রেকাত পড়েন।[২] এখানে এই সংখ্যা নিয়ে মতভেদ। মোহাম্মদীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আখবারে এসলামীয়ায় লেখা হয়: 'লা-মজাহবীগণ যে নফল নমাজ পড়া দূরে থাকুক সোন্নত নমাজ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তারাবির নমাজও ছাড়িয়া দিয়েছেন, বেতরের নমাজ তিন রেকাতকে এক রেকাত করিয়াছেন,...ইহাদের কার্যকলাপে আক্ষেপ। খোদাতালা হেদায়েত করেন এই প্রার্থনা।''[৩] 'সুরা ফাতেহা'র একেবারে শেষ শব্দটি 'দোওল্লিন' কি 'জোওল্লিন' হবে এই নিয়েও উভয়ের মধ্যে বিবাদ আছে। 'মিহির ও সুধাকরে' এ সম্পর্কে লেখা হয়, ''যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলে নব নব মৌলবীগণ

১ কোমর পর্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটুতে হাত দিয়ে দাঁড়ান প্রক্রিয়াকে 'রুকু' বলে।

২ প্রথমে দাঁড়িয়ে নামাজ আরম্ভ করার পর থেকে 'রুকু' ও 'সিজদা' (বসে মাটিতে মাথা রাখা) শেষ করে আবার দাঁড়ান পর্যন্ত একটা পূর্ণ প্রক্রিয়াকে রেকাত বলে। এক এক আঙ্গিক প্রক্রিয়ায় এক এক সুরা ও দোয়া-দরুদ পড়ার নিয়ম আছে।

৩ আখবারে এসলামীয়া, শ্রাবণ ১৩০২, পৃঃ ৬৯ (পাদটীকা)।

উপস্থিত হইয়া 'দোওল্লিন' ও 'জোওল্লিন' উচ্চারণ সম্বন্ধে মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের উত্তেজনায় মূর্খ লোকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য যশোহরনিবাসী জনাব ক্বারি হাফেজ মোহাম্মদ সফিউল্লা সাহেব একজন মহাবিজ্ঞ আলেম বন্ধুসহ শীঘ্রই উক্ত অঞ্চলে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।"[১] 'মোল্লাচরিত্র' নামে একটি কবিতায় ইসমাইল হোসেন শিরাজী অনুরূপ চিত্র দিয়েছেন,

ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা হস্তীসম জ্ঞানী,
'দাল্লিন,' 'জাল্লিন' লয়ে করে হানাহানি।[২]

জোহর, আসর, মগরেব, এশাব, ফজর—প্রতিদিন এই পাঁচবার নামাজ পড়ার নিয়ম আছে। শুক্রবার জোহরের স্থলে জুমার নামাজ পড়তে হয়। হানাফীগণ জুমার নামাজের সঙ্গে অতিরিক্ত চার রেকাত 'আখেরজ্জোহর' পড়ার পক্ষপাতী। মোহাম্মদীগণ কেবল দু'রেকাত জুমা ও তৎসঙ্গে সোন্নত নামাজ পড়েন। নইমুদ্দীন 'এসবাতে আখেরজ্জোহর' গ্রন্থে হানাফী ও লা-মজহাবীগণের মধ্যেকার এই বিতর্ক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'জুমার ফরজের পরে জুমার সোন্নত পড়িয়া তৎপর চারি রাকাত আখেরজ্জোহর পড়িতে হইবে।"[৩] নঈমুদ্দীনের গ্রন্থের প্রতিবাদে ময়মনসিংহের খোন্দকার আবুল ফজল আহমদ 'আখেরের জোহরের প্রতিবাদ' (১৯০৩) শিরোনামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[৪] 'এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জনে'র তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৯২) মোহাম্মদ নইমুদ্দীন লিখেছেন, "এনসাফ করিয়া দেখিলে এই কেতাব লা-মজহাবী রোগের অমোঘ ঔষধ এবং হানাফী মজহাবের ধারাল তরবারি। লা-মজহাবী-গণকে গোমরাহ করিয়া দলবল পুষ্টি করিবার জন্য স্থানে স্থানে জাল ফেলিয়াছেন, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেছেন।"[৫] তিনি ঐ গ্রন্থে বহু হাদিস দলিল উদ্ধৃত করে লা-মজহাবী মতের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। তিনি লা-মজহাবীদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য:

শয়তানের শিং সেই আবদুল ওহাব।
যাহার খবর নবী দিয়াছিল সাফ॥

১ মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাল্গুন ১৩০৮
২ ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-আগস্ট ১৯০৩, পৃ: ৩৬৯
৩ মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—এসবাতে আখেরজ্জোহর, টাঙ্গাইল, ১৮৯৭, পৃ: ৫৮ (২সং)
৪ বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ. খ, ১৯০৪
৫ মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন, ১৮৯২ (৩ সং)

আবদুলের তাঁবেদার যাহারা বাঁচিল।
ওহাবী বলিয়া তারা জাহের হইল ।।
এদেশেতে দেখ তাই যত লা-মজহাবী।
নিশ্চয় জানিও এরা সকলি ওহাবী ।।
ওহাবীর ধর পাকড় এদেশে যখন।
ইংরেজ করিল শুরু, জান সর্বজন ।।
তখন ওহাবী নাম দিল বদলাইয়া।
মহাম্মদী বলি কেহ জাহের হইয়া ।।
আহলে হাদিস বলি কেহ হইল বাহির।
গায়েব মোকাল্লেদ বলি কেহ প্রকাশিল ।।...
আজকাল মহাম্মদী যাহারা বলয়।
ওহাবীর দল ঠিক জানিবে নিশ্চয় ।।[১]

'আদেল্লায় হানিফীয়া বা রদ্দে লা-মজহাবী' গ্রন্থে তিনি দাবী করেছেন যে, উক্ত গ্রন্থ পাঠে লা-মজহাবীগণের 'দাগাবাজি, ফেবববাজি, ঝুটামি সকলি প্রকাশ হইয়া পড়িবে'।[২] লেখকের আক্রমণের ভাষা থেকে কোন্দলের তীব্রতা ও তিক্ততা অনুমান করা যায়। সৈয়দ আমানত আলী 'প্রচারকে' প্রকাশিত 'হানাফী ও লা-মজহাবী সংঘর্ষণ' নামক একটি প্রবন্ধে লা-মজহাবীদের প্রতি আরও রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভ্রাতাগণ। আমার অনুরোধ এই যে আপনারা শরা শরিফের প্রাচীন ও জগৎ বিখ্যাত কেতাবসমূহে যথা হেদায়া, শরে বেকায়া, আলমগিরী, দোররল মোক্তার...ইত্যাদি কোন কেতাবে সুন্নত জমায়েতের একতা বিশিষ্ট মজহাব চতুষ্টয় (হানাফী, সাফী, মালেকী, হাম্বালী) নাম ব্যতীত আপনারা 'মহাম্মদী' মজহাবের নাম কেহ কখন শুনিয়াছেন কি? বোধ করি কস্মিনকালেও কেহ দেখেন নাই ও শুনেন নাই। অতএব উহাই দজ্জালী দলের নতুন মজহাব।"[৩] 'প্রচারকে' সৈয়দ আমানত আলীকে 'লা-মজহাবী-নাশক' এবং মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীকে 'লা-মজহাবী-অরি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৪] 'প্রচারকে' মনিরুজ্জমানের দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়: একটি 'লা-মজহাবিগণের ধর্ম রহস্যভেদ' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) এবং অপরটি 'মজহাবের সত্যতা' (বৈশাখ ১৩০৭)।

---

১ এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন, ১৮৯২ (৩সং)

২ মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—আদেল্লায় হানিফীয়া বা রদ্দে লা-মজহাবী

৩ প্রচারক, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৬

৪ ঐ, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬, পৃ: ৫৪

প্রথম প্রবন্ধে তিনি লা-মজহাবীদের সংস্কার প্রবণতার প্রতি কটাক্ষপাত করে মন্তব্য করেছেন, "যে সকল বস্তুর জাকাত আদায় করা ফরজ বলিয়া সমুদয় আলেম ও ইমামগণ আজ ১২।১৩ বৎসর হইতে মত দিয়া আসিতেছেন আজ লা-মজহাবিগণ, স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে বিরত থাকিতেন না। কালে যে তাঁহারা ইসলামধর্মের পঞ্চমূলের এক একটি ক্রমান্বয়ে সমূলে উৎপাটন করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি ?"[১] তিনি ইসলাম-প্রচারকে এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, "হানিফী, লা-মজহাবী ও জাহেরী, বাতিনী দলের সমস্যা দিন দিন ভীষণ মূর্তি ধারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে তামাকের মসলা ও মৌলুদ শরিফের 'কেয়ামে'র তর্ক লইয়া মাথা ফাটাফাটি ও মোকদ্দমাবাজীও চলিতেছে।"[২] তিনি পরবর্তীকালে 'সোলতান' পত্রিকায় 'হানিফী মোহাম্মদী' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেন, "বঙ্গদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে ১০ বৎসর পূর্বে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।...এক দল আরেক দলকে কাফের বলিয়া ফতোয়া দিতেন। কেহ কাহারও পশ্চাতে নমাজ পড়িতেন না। এমন কি কোন কোন মসজিদে এক দল আরেক দলকে নমাজ পড়িতে দিত না।"[৩] কিভাবে এ বিবাদের অবসান হয় সে-সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনি বলেন, "আঞ্জমনে ওলামা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খবরের কাগজের আন্দোলন-আলোচনা, আঞ্জমনের প্রচারক ও পরিচালকগণের প্রাণপণ চেষ্টা, সভা-সমিতি এবং ওয়াজ বক্তৃতার ফলে এই সঙ্কীর্ণ সত্য ও সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক মতভেদ এবং বিবাদ কয়েক বৎসরের মধ্যে এক প্রকার মিটিয়া গিয়াছিল।"[৪]

সমসাময়িককালের বটতলার পুথিতে হানাফী-মোহাম্মদীর বিতর্কের বিবরণ আছে। মুনশী মোহাম্মদ ফসিহ রচিত দুখানি পুথি আছে যেগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল উভয় দলের 'বাহাস' বা বিতর্ক। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার সাড্ডা ও গোরাবাজারের বিতর্ককে অবলম্বন করে যথাক্রমে 'সয়ফল মোমেনিন' (১৮৭৫) ও 'সমসামল মওয়াহেদিন' (১৮৮৭) গ্রন্থ লেখেন। সাড্ডার বিতর্ক সভায় মোহাম্মদীর পক্ষে মৌলবী আবদুল্লা এবং হানাফীর পক্ষে মৌলবী এহসান আলী নেতৃত্ব দেন এবং গোরাবাজারের বিতর্ক সভায় আল্লামা ইব্রাহিম মোহাম্মদীর পক্ষে এবং মোল্লা আরেফ, করিম বক্স প্রমুখ হানাফীর পক্ষে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয়

১ প্রচারক, পৃঃ ১৬-১৭

২ ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩, পৃঃ ৩৬০

৩ সোলতান, ২১ আষাঢ় ১৩৩০

৪ ঐ

সভায় জজকোর্টের একজন উকিল বিচারক ছিলেন। বিতর্কের বিষয় ছিল 'তকলিদ-এ সখসি' বা অন্ধ অনুসরণ।[১] মাড্ডার বিতর্ক সভাটি ১২৬৯ সনের ২৪ বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি প্রশ্নোত্তর ছিল এরূপ:

আবদুল্লা (সওয়াল) চাহার মজহাব এ ফরজ কি ছোন্নত।
নফল ওাজেব কিবা বলো নেক জাত॥

মোবাহ কি মসকুক মকরুহ কিবা মস্তাহাব।
রাখিলে আজাব কি না রাখিলে ছওাব॥

হকে গণ্য হয় কি নাহকেতে ছোমার।
কতদিন হৈতে হৈল বুনিয়াদ ইহার॥

কি ফল মজহাবে ফলে কি চিজ মজহাব।
দোহাই হকের হক দাও হে জওাব।

লোৎফল হক (জওয়াব) ছোন্নত নফল না ওাজেব এ মজহাব।
মোবাহ ও মসকুক মকরুহ নহে মোস্তাহাব॥
না হক নহেকো হক মজহাব চাহার।
চৌথা জমানেতে হৈল বুনিয়াদ এহার॥
রাখিলে ছওাব আছে ছাড়িলে আজাব।
নেক ফল ফলে এতে ভাল এ মজহাব॥
বেসক মজহাব চারি ফরজে দাখিল।
কোরান সরিফে ছাফ মৌজুদ দলিল॥
পাঁচ ছেপারাতে ছুরা নেছার বিচেতে।
লেখি সে আয়েত নিচে মানো একিনেতে॥[২]

স্পষ্টত: হানাফীদের চার মজহাব নিয়ে এ বিতর্ক: মজহাব মানা এবং মজহাব মানলে তার ফল কি ইত্যাদি বিষয়ে এখানে প্রশ্নোত্তর হয়েছে। মজহাব সম্পর্কে মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের একই অভিমত: তিনি লিখেছেন, "চারি মজহাব হজরতের সময় যদিও ছিল না তথাপি চারি মজহাবের এক মজহাব মত চলা ওয়াজেব। কেননা এই চারি মজহাবের প্রতিই এসলামধর্ম নির্ভর করিতেছে, ইহারই প্রতি এজমা হইয়াছে। এই চারি মজহাব ব্যতীত যদি অন্য কোন

১ মুন্সী ফসিহউদ্দীন—সমসামিল মওয়াহেদিন, কলিকাতা, ১৮৮৭, পৃঃ ৩০
২ মোহাম্মদ ফসিহ—সয়ফুল মোমেনীন, কলিকাতা, ১২৮২, পৃঃ ২৪

মজহাব বাহির হয়, তবে তাহা হারাম বেদাত।"[১] এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি, আরও কিছুকাল ধরে চলেছিল, 'আহলে হাদিস' (১৯১৩), 'হানাফী' (১৯২৬) প্রভৃতি পত্রিকায় তার প্রমাণ আছে। বিতর্কমূলক গ্রন্থ রচিত হয়: হাবিলুদ্দীনের 'রদ্দে হানাফী ও মজহাব দর্পণ' (১৯২৫) এরূপ একখানি গ্রন্থ ছিল। বিশ শতকের দুই দশকের পর থেকে এই বিরোধের তীব্রতা কমে আসে, 'সোলতান' পত্রিকার পরোক্ষ মন্তব্য থেকে তা জানা যায়।

জুমা ও ঈদের নামাজ পড়া নিয়ে কোন কোন শ্রেণীর মৌলবী-মৌলানাগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ওয়াহাবীগণের অভিমত ছিল যে, খ্রীস্টান-শাসিত ভারতবর্ষে জুমার ও ঈদের নামাজ পড়া সিদ্ধ নয়, এজন্য তাঁদের কেউ কেউ হিজরতের পক্ষপাতী ছিলেন। মৌলানা কেরামত আলী প্রমুখ নব্যপণ্ডিতগণ এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বলেছিলেন যে, যেহেতু বিধর্মী শাসক ধর্মপালনে হস্তক্ষেপ করেন না, সেহেতু জুমা ও ঈদের নামাজ পড়া সিদ্ধ। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আত্মজীবনীতে অনুরূপ সমস্যার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় "দেশের এ অংশে 'তকলীদ' (পূর্ববর্তী ইমামদের অনুসরণ) নিয়ে সুধী সমাজ ও সর্বসাধারণের মত বিরোধ রয়েছে।... মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত দু'তিনটি ওয়াজ-মজলিসে আমি উপস্থিত লোকজনদের সম্বন্ধে এ বিষয়টি সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি।...বিতর্কমূলক বিষয়াদির মধ্যে একটি হল এদেশে জুমার নামাজ বৈধ কি না? মুসলমানদের পরস্পর বিবাদ ও বিরোধ নিরসনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে আমি এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছি।"[২] উভয়পক্ষীয় মত অবলম্বনে কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়, যথা আবদুল গফুরের 'তকরারে মাকুল' (১৮৯৮), মোহাম্মদ ইসমাইলের 'জুমা ও ঈদের ফতুয়া' (১৯০০) ইত্যাদি।

উনিশ শতকে হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মৌল প্রেরণা ছিল নব্য মানবতাবাদ। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা চিন্তার জগতে ভাবান্তর এনেছে। ধর্ম মানুষের জন্য, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মুক্ত যুক্তিবাদের এই উপলব্ধি থেকে মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মভীরুতা থেকে হিন্দুগণ সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তর্জলি, অস্পৃশ্যপ্রথা, বিধবা বিবাহ, গৌরীদান প্রথা, কুলীন প্রথা ইত্যাদি কতকগুলি নিয়ম ও আচার পালন করতেন। ডেভিড হেয়ার, উইলিয়ম বেন্টিকের প্রত্যক্ষ সহায়তায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র

---

১ মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—এনসাফ অর্থাৎ না-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন

২ পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮, পৃ: ১১১

বিদ্যাসাগর প্রমুখ নব্যপণ্ডিতগণ ধর্মের পাষাণ চাপা সমাজের রুগ্ন প্রাণকে মুক্ত করেছিলেন। সংস্কারের পথ নিরঙ্কুশ ছিল না, রক্ষণশীলদের বাধাবিপত্তি, তর্ক-বিতর্ক, প্রাণনাশের হুমকি সবই ছিল। শেষ পর্যন্ত মানবতার জয় ঘোষিত হয়। হিন্দু সমাজে সংস্কার-আন্দোলনে তাই একটা বিপ্লব আছে। এই বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সমাজে 'নবজাগরণ' এসেছে।

শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বাংলার মুসলমান সমাজে যে ধর্ম-আন্দোলন হয়, তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। বিধবা বিবাহ বা শ্রেণীভেদ প্রথা মুসলমান সমাজের শাস্ত্রীয় সমস্যা ছিল না। এগুলি ধর্ম-আন্দোলনকারীদের প্রধান লক্ষ্যও ছিল না। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বাইরের শক্তিগুলি থেকে ইসলামের উপর যে আঘাত এসেছে, সেগুলি প্রতিহত করা। আবার নিজেদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি, হানাফী-মোহাম্মদীর মতবাদ নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, তারও নিরসন করা। স্বধর্মীদের উন্মার্গগামিতা ও আত্মকলহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা প্রধানতঃ ধর্মশিক্ষার কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, ইসলাম অপরিবর্তনীয় ধর্মমত, কোরান অপৌরুষেয় ও হাদিস অকাট্য বাণী। কোরান-হাদিসের নীতি-নির্দেশের সঙ্গে কোন আপোষ চলে না। সুতরাং ধর্মসংস্কার বলতে তাঁরা সমাজের অনৈসলামিক আচার-আচরণের সংস্কার বুঝেছেন। রক্ষণশীল মনোভাব থেকে এর প্রেরণা এসেছে। এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন মৌলবী-মোল্লা শ্রেণীর লোকেরাই। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন। এটি নব্যযুগের নব্যশিক্ষা ও নব্যচিন্তার আলোকে কোন বিপ্লবমুখী আন্দোলন ছিল না, এ ছিল ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন।

মুসলমানের এই ধর্মান্দোলনের একটা প্রত্যক্ষ ফল বাংলা চর্চা ও ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টি। অংশতঃ হলেও পূর্বে এই ধর্মীয় সংস্কার বাংলা ভাষা চর্চার পক্ষে অন্তরায় ছিল। আলোচ্য যুগেও সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের আরবী-ফারসী-উর্দুর প্রতি মোহ ও আকর্ষণ ছিল। তাঁরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ভাষাগত দুস্তর ব্যবধানের জন্য সাধারণ মানুষ ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝতে পারছে না, এজন্য তারা অন্যের কুহকের সহজ শিকারে পরিণত হয়। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীস্টান সকলেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মালোচনা করেন ও পুস্তক-পত্রিকা রচনা করেন। নতুন ধর্ব-আন্দোলনকারিগণ এর গতিরোধ করার জন্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাবাতেই ধর্মপুস্তক রচনার প্রয়োজন বোধ করেন। কোরানের অনুবাদ, হাদিস, ফেকাহ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ হয়েছে, আবার শিক্ষা-মূলক, আলোচনামূলক, বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হয়েছে। কোরানের

বঙ্গানুবাদ একদিন অকল্পনীয় ছিল। যাঁরা প্রথম অনুবাদে অগ্রসর হন, তাঁরা গোঁড়া শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে লাঞ্ছনা পেয়েছেন। ধর্মকথা, সাধু-সন্তজীবনী এবং ঐতিহাসিক বীরগাথা রচনা করে তাঁরা মানুষের দৃষ্টিকে স্বধর্মের পথে ফিরিয়ে এনেছেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়েই মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উঠে এসেছে, বাংলা ভাষার বিরোধী মনোভাবের অবসান হয়েছে।

এযুগের মুসলমানের ধর্ম-আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার প্রসঙ্গে জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন, "চার মজহাবের ব্যাখ্যার মধ্যে ইসলামের সত্যকে সীমাবদ্ধ করে একদিকে যেমন চিন্তার রাজ্যে এক অতি উচ্চ প্রাচীরের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনি ওহাবীদের গ্রহণবিমুখীনতাতেও হয়েছিল অপর একটি প্রাচীরের সৃষ্টি। এ বিশ্বে মুসলিম মানসে আর স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয় মননশীলতার কোন সুযোগ থাকেনি।"[১] বাঙালী মুসলমানের ধর্মান্দোলনকে আশ্রয় করে যে ধর্মসাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাতে স্বাধীনচিন্তা, মুক্তবুদ্ধির ছাপ পড়েনি, এটিই তার প্রধান কারণ ছিল। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য মানুষের প্রধান শত্রু ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্যে মানুষের আত্মজাগরণ ও নবজাগরণ সম্ভব, একথা সেযুগের কোন শ্রেণীর নেতাই উপলব্ধি করেননি। তাঁরা ধর্মের মধ্যেই মুক্তির ও উন্নতির পথ খুঁজেছেন।[২] তাঁরা আত্ম-রক্ষামূলক নীতি নিয়ে প্রাচীন ধারাতেই ইহবিমুখ আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। সুতরাং এ শ্রেণীর রচনা সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারেনি। ধর্মের কারণে একটি ঘুমন্ত সমাজ জেগেছে সত্য, কিন্তু সে শক্তিকে সমাজের ছিদ্রপথ বন্ধ করার কাজে লাগান হয়েছে, সমাজের বিকাশ ও মুক্তির কাজে প্রয়োগ করা হয়নি। মুসলমান সমাজের উক্ত সংস্কার আন্দোলনের এটাই প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

---

১ পূর্বাচল, কার্তিক ১৩৮৩, পৃঃ ১

২ ফারায়েজী আন্দোলনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির বীজ ছিল সত্য কিন্তু নেতারা জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে একত্র করতে পারেননি। ধর্মীয় রঙ থাকার ফলে হিন্দু কৃষক প্রজা ফারায়েজী আন্দোলনে যোগদান করেনি। নচেৎ শোষক ও অত্যাচারী জমিদার-মহাজনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নিতে পারত।

শিক্ষা

আলোচ্য যুগে বাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসঙ্গটি জটিল রূপ ধারণ করে।[১] অথচ শিক্ষাই ছিল জাতির জীবন-মরণ কাঠি। একটি সমাজের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ-বর্জনের উপর। উনিশ শতকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা চর্চা জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজে এ শিক্ষা নিয়ে সংশয়, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দেয়। বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা আবশ্যক হলেও ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য আরবী-ফারসী ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য ছিল। মুসলমান আমলে ফারসী ছিল রাজভাষা। রাজপদ লাভ করার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ঐ ভাষা শিক্ষা করতেন। মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরবী-ফারসীর কদর ছিল। সতের-আঠার শতকের দিকে এদেশের আর একটি ভাষার আমদানী হয়---সেটি হল উর্দু ভাষা। উত্তর ভারত থেকে শাসক শ্রেণীর মৌখিক ভাষা হিসাবে উর্দু আরবী-ফারসীর পাশে স্থান করে নেয়। হিন্দু সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের চর্চা বরাবর অব্যাহত ছিল। রাজভাষা বা ধর্মভাষার মর্যাদা না পেলেও মাতৃ-ভাষা বাংলা চর্চার ধারা কোন সময় শুকিয়ে যায়নি। ইংরাজদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে এই পাঁচটি ভাষার প্রচলন ছিল। মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতুস্পাঠীতে এগুলির চর্চা হত। ইংরাজ আমলে ইংরাজী ভাষার প্রচলন হলে ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টি। এক সময় সরকার আইন করে অফিস-আদালতের ভাষা হিসাবে ফারসীর স্থলে ইংরাজীর প্রবর্তন করেন (১৮৩৭)। স্কুল-কলেজে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) স্থাপন করে ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন বিচার ও রাজস্ব বিভাগে যোগ্য কর্মচারী তৈরী করার জন্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও (১৮০০) ইংরাজী-বাংলার সাথে উর্দু-ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। বহুদিন এ ব্যবস্থা

---

১ প্রদীপ সিনহা বলেছেন, The question of Muhammadan learning presents a variety of facets, some of which are of fascinating complexity.

Pradip Sinha—*Ninteenth Century : Aspect of Social History.* Firma K.L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1965, p. 50

চালু ছিল, ততদিন মুসলমান সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়নি; সমস্যার আকার ধারণ করে তখন, যখন ফারসী রহিত করে ইংরাজীর প্রচলন হয়। কলিকাতা মাদ্রাসায় ইরাজী শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে (১৮২৩) আরবী-ফারসী ভাষা ও ইসলাম ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার মৌলিক আদর্শ ক্ষুণ্ন হবে, এরূপ অজুহাত দেখিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক মণ্ডলী প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু পরে ঐ মাদ্রাসার অঙ্গনে ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা হয় (১৮২৬)। ১৮৩০ সালে মাদ্রাসায় ৮৭ জন ছাত্র প্রাথমিক ইংরাজী শিখতো। ঢাকার মুসলমানগণ শহরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য হেবসের নিকটে আবেদন করেছিলেন (১৮২৬); কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য করে দেন। মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবারের সন্তানদের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়াব জন্য একটি প্রাথমিক ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮২৪)। এছাড়া, খ্রীস্টান মিশনারী পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতেও কিছু কিছু মুসলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ করত। সুতরাং ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদের বিরূপ মনোভাব ছিল না।[১] বরং বলা যায়, ঐ সময় পর্যন্ত প্রয়োজন ছিল না বলে তাঁরা এ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়নি। যখন ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত প্রয়োজন দেখা দিল, তখন মুসলমান সমাজে নানাবিধ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলমান সমাজে বিত্ত, বিদ্যা ও কূলের দিক দিয়ে আশরাফ, আতরাফ শ্রেণীভেদ ছিল। উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মত আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার রীতি ছিল, নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মত আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান বংশোদ্ভূত লোকেরা নিজেদের অভিজাত মনে করতেন। কৃষক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, মুটে-মজুর ছিল আতরাফ শ্রেণীভুক্ত। দেশের এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শিক্ষা এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারের ছেলেরা মক্তব মাদ্রাসায় লেখাপড়া করত বটে, কিন্তু সেটি ছিল ধর্ম শিক্ষা নির্ভর; বৈষয়িক উন্নতি কিংবা জ্ঞানচর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার মনোভাব প্রায় অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ বা বর্জনের কোন প্রশ্নই উঠে না। আশরাফ শ্রেণীর মধ্যে একটি অংশ যথা

১ উইলিয়াম এ্যাডাম তাঁর রিপোর্টে বলেন, "Learned Musalmans are in general much better prepared for reception of European ideas than learned Hindus.

আলেম, পীর, দরবেশ, মৌলবী, মওলানা কেবল আরবী-ফারসী শিক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন, সমাজের পার্থিব ভালমন্দের কথা না ভেবে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁরা অধিক নজর দিতেন। তাঁদের কাজ ছিল ধর্ম প্রচার করা এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি পালন করা।[১] যেহেতু ইসলামের ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ আরবী-ফারসীতে লেখা, সেহেতু আরবী-ফারসী শিক্ষা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। ইংরাজী ও বাংলা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে টোল-চতুষ্পাঠীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায়। কিন্তু মুসলমানরা মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে। ফারসী শিক্ষার মানও উন্নত ছিল। উইলিয়ম এ্যাডাম তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে বলেছেন যে, বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার তুলনায় মাদ্রাসার ফারসী শিক্ষা অধিক সংহত ও উদার প্রকৃতির ছিল।

সাধারণভাবে অভিযোগ করা হয় যে, ফারসীর প্রতি মোহ থাকায় মুসলমানরা ঐ ভাষা ত্যাগ করতে পারেননি। ভারতবর্ষে রাজকার্য পরিচালনা, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার বাহন হওয়ায় ফারসী শিক্ষা সামাজিক মর্যাদার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফারসী বিদ্যা সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তি লাভের উপায় ছিল। জমিদারপুত্র ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শিখেছিলেন বলে পরিবারের লোকের কাছে সমাদর পাননি, তিনি দুঃখে গৃহত্যাগ করেন এবং রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করে ফারসী আয়ত্ত করেন, তখন গৃহে সম্মান হয়। রামমোহন রায় প্রথমে ফারসী শিখেছিলেন, ডিগবী সাহেবের অধীনে সেরেস্তাদারের কাজ করার সময় ইংরাজী শিখেছিলেন। 'মীরাৎ-উল-আখবার' (১৮২৩) পত্রিকা তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'তুহফাতুল মওয়াহিদিন' (১৮০৪) ফারসীতে রচিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর উত্তম ফারসী জানতেন। মুসলমান বনেদী পরিবারগুলিতে ফারসীর স্থান এর আলোকে বিচার করলে তাঁদের মোহের কারণ বুঝা যায়। গোলাম হোসেন সলিম বাংলার প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ 'রিয়াজ-উস-সলাতিন' (১৭৮৬-৮৮) রচনা করেন ফারসীতে। তিনি উডনি সাহেবের অধীনে মালদহে চাকুরী করতেন। তাঁর ন্যূনাধিক একশো বছর পরে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি 'হাকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১)

১ সব রকমের নামাজ পাঠ যথা প্রতিদিন পাঁচবার ফরজ, সুন্নত ও নফল নামাজ, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, রমজানের মাসে তারাবী নামাজ, জানাজার নামাজ, এসতেশকার নামাজ প্রভৃতি এবং মিলাদমহফিলে দোয়া দরুদ পাঠ, বিবাহ পাঠ ইত্যাদি মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি আরবী ভাষাতে সম্পন্ন করতে হয়।

রচনা করেন ফারসীতে। হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলী (মৃত ১৮৭৩) ফারসীতে 'মখজুল উলুম' গ্রন্থ লেখেন। আবদুল লতিফের পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ 'জামিউল তাওয়ারিখ' (১৮৩৬) গ্রন্থ লেখেন ফারসীতে। আবদুল লতিফের তত্ত্বাবধানে ও সৈয়দ রেয়াজতুল্লাহর সম্পাদনায় ফারসী সাপ্তাহিক 'দূরবীন' (১৮৫৩) প্রকাশিত হয়। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'তে (১৮৬৩) বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হত ইংরাজী, ফারসী ও উর্দুতে। ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর কবিতার সংকলন 'দিওয়ান-ই-ওবায়দী' (১৮৮৬) ফারসীতে রচিত হয়। আশরাফ শ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ফারসীকে এভাবে জিইয়ে রেখেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ডিগ্রী নিয়েছেন, তাঁদের বিষয় নির্বাচনের তালিকা দেখলে বুঝা যায়, তাঁদের কিরূপ ফারসী-প্রীতি ছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যে সকল ছাত্র বিএ (অনার্স) ও এমএ পাশ করেছেন, তাঁদের বিষয়ভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান এরূপ:[১]

বিষয়	সংখ্যা	হার
ফারসী	১০৭	৫৩.২
ইংরাজী	৫৩	২৩.৩
আরবী	২১	১০.৪
গণিত	১০	---
দর্শন	৮	---
বিজ্ঞান	৫	---
ইতিহাস	৩	---
সংস্কৃত	২	---

ফারসীর সংখ্যা সর্বোচ্চ। স্মরণীয় যে, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান ছাত্র এ সংখ্যার মধ্যে আছে। সুতরাং রাজভাষার পরিবর্তনে বাংলার এক শ্রেণীর মুসলমানরা মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন। বৈষয়িক সুবিধা হারাবার ফলে তাঁদের মনঃক্ষুণ্নতা আরও বেড়ে যায়। আইনের দ্বারা একটা ভাষার মুণ্ডচ্ছেদ হলেও যাঁরা এ ভাষাকে ভালবাসেন তাঁরা রাতারাতি এটিকে বিসর্জন দিতে পারেননি। সুতরাং ফারসী ভাষার প্রভাব মুসলমান সমাজে থেকে যায়।

১ পরিসংখ্যানটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে প্রণীত। পরিশিষ্ট ১ (ক) দ্রষ্টব্য।

বদরুদ্দীন উমর এটিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। রাজভাষার সম্মান হতে ফারসীর স্থানচ্যুত হওয়াকে মুসলমানরা দেখেছেন শাসক-গোষ্ঠীর সাথে কলিকাতার ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি ষড়যন্ত্র হিসাবে। তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল, ফারসী ত্যাগ করলে তাঁরা স্বাধীন মনোবৃত্তি হারিয়ে 'দাস মনোভাবাপন্ন' হয়ে পড়বেন।[১] কারণটি একেবারে অমূলক ছিল না। কলিকাতার সাময়িকপত্রে এ নিয়ে আন্দোলন হয়। ১৮২৮ সালের ২৬ জানুয়ারী একটি বাংলা সাপ্তাহিকীতে লেখা হয়, "ফার্সী বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা বিচারক, উকিল, বাদী, বিবাদী অথবা সাক্ষী কাহারই ভাষা নয়। আমরা মনে করি, যদি কোন বিদেশী ভাষাকে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ইরাজী ভাষাই গ্রহণ করা উচিত। এতদিন ইরাজীকে সরকারী ভাষা রূপে গ্রহণের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, বাঙালী জাতি ইংরাজী জানে না। কিন্তু এখন সে আপত্তি টিকিতে পারে না। এখন হিন্দু কলেজে ৪০০ ছাত্র ইংরাজী শিখিতেছে। কলিকাতার অন্যান্য স্কুলগুলিতে কমপক্ষে এক হাজার ছাত্র ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছে। ইংরাজী ভাষায় তাহাদের যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে এই ভাষায় আদালতের কাজ চালান কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। সরকার যাহাতে ফার্সীর জায়গায় ইংরাজীকে আদালতের ভাষারূপে প্রচলন করেন সেজন্য কলিকাতা-বাসীদের আবেদন করা উচিত। যদি এই আবেদন গ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার হইবে।"[২] ১৮৩৪ সালের ২১ মার্চ ঐ পত্রিকা সরকারের কাছে দাবী করে যে, সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে ফারসীর পরিবর্তে ইংরাজী জ্ঞানকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।[৩] মুসলমানদের ইংরাজী-ভীতি পশ্চাদপদ মনোভাবের লক্ষণ হলেও এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফল, যা তাঁদের জাত্যাভিমানকে আরও স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। এ সময় লর্ড মেকলের দম্ভোক্তি, 'একটি ভাল ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি আধারের বইএর মূল্য ভারতীয় ও আরবী সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল্যের সমান' তাঁদের ক্ষুব্ধ চিত্তকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। এতে তাঁদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার মনোবৃত্তি প্রবল হয়। অপরপক্ষে ইংরাজ ও ইংরাজীর প্রতি সন্দেহ ও বিরূপতা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত সময় না দিয়ে আকস্মিক পরিবর্তনকে তাঁরা সন্দেহের চক্ষে

১ বদরুদ্দীন উমর—পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, পৃঃ ৯
২ Ramesh Chandra Majumder—*Bengal in Nineteenth Century*, p. 31
৩ *Ibid.*, p. 48

দেখেছিলেন। যুগের পরিবর্তনের ধারাটিও তাঁরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন বলে আমাদের বিশ্বাস।

জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলা প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সকল শ্রেণীর কবির রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আধুনিক যুগে গদ্যশিল্পের প্রসার ঘটলে বাংলা ভাষার শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ফলে শুধু শিল্প-সাহিত্য চর্চা নয়, শিক্ষা, রাজকার্য ও অন্যান্য বিষয়কর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহারের আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলার এই উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করেই সরকার ১৮৩৫ সালে ইংরাজীর পাশে বাংলাকেও শিক্ষা ও রাজকার্যের অঙ্গী করে নেন। মধ্যযুগের মোল্লা-পুরোহিত শ্রেণীর লোক বাংলায় ধর্মকথা লেখার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু নবাব-সুলতানেরা বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেননি। তাঁরা অনেকে বাংলা ভাষা চর্চায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন। 'দৌলত উজির' (অর্থমন্ত্রী) বাহরাম খান, 'অমাত্য তনয়' আলাওল, 'প্রধান উজির' মাগন ঠাকুর বাংলার সেবা করেছেন। সুতরাং মুসলমান অভিজাত শ্রেণী বাংলাকে উপেক্ষা করেননি। এদেশে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান অভিজাত শ্রেণী বাংলাকে উপেক্ষা করেননি। এ দেশে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান শ্রেণীর উপেক্ষার ভাব জন্মে সম্ভবতঃ উর্দুর আমদানীর পর। উর্দু আরবী লিপিতে লেখা হত, আরবী-ফারসী শব্দের আধিক্য সেখানে ছিল। দিল্লী-লক্ষ্ণৌর অনুকরণে একে তাঁরা মৌখিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে স্থান দেন এবং বাংলাকে নিম্ন শ্রেণীর ছোটজাতের ভাষা বলে ভাবতে থাকেন। কিন্তু বাংলার শক্তি ছিল বৃহত্তর জনগণ। আধুনিক যুগে ছাপাখানার দৌলতে বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষা অনেক উপরে উঠে আসে; শিক্ষা, শিল্প, কাব্য, বক্তৃতা, আলোচনা, সমালোচনা ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজে বাংলা ব্যবহারের উপযোগিতা সম্প্রসারিত হয়। উর্দু-বাংলা বিতর্ক তুলেও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে বাংলাকে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। আবদুল লতিফ আভিজাত্যের মুখ চেয়ে শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্তের জন্য উর্দু এবং গ্রামের নিম্নবিত্তের জন্য বাংলা শিক্ষার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলার মুসলমান লেখকগণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই মাতৃভাষা হিসাবে বাংলার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন শুরু করেন এবং জীবনের সর্বত্র বাংলা চর্চার উপযোগিতা প্রচার করেন। তবে তাঁরা হিন্দুর হাতে গড়া বাংলা ভাষা ও হিন্দুয়ানি ভাবান্বিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক করেছেন, এবং কেউ কেউ ইসলামী সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে মুসলমানের 'জাতীয় ভাষা', 'জাতীয় ভাব' ও 'জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টির কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যখন পরিবর্তনের পালা চলেছে এবং ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তখন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়। পশ্চিমবঙ্গে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ও পূর্ববঙ্গে হাজী শরিয়তুল্লাহ (১৭৮০-১৮৪৯) ও দুধু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২) ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরাজ শাসন-শোষণ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলেন। ইসলামধর্মে যেসব কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি আছে, সেসব দূর করে কোরান-হাদিসের আদর্শে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা ক্রমে রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিতুমীর 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করে ইংরাজ সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন (১৮৩১)। শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে ঐ সময় সৈয়দ আহমদ শহীদ বালাকোটের যুদ্ধে শিখ সৈন্যের হাতে পরাজিত ও নিহত হন (১৮৩১)। তাঁর মৃত্যুর পরও জেহাদ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ১৮৪৯ সালে ইংরাজ পাঞ্জাব অধিকার করলে জেহাদীদের আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়।[১] বাংলাদেশ থেকে মুজাহিদ ও অর্থ সংগৃহীত হয়ে সীমান্ত প্রদেশে এই জেহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হত। মালদহ, ঢাকা, রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চলে জেহাদীদের প্রচারকেন্দ্র ছিল। এই আন্দোলনই সাধারণভাবে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে পরিচিত। শরিয়তুল্লাহ ও তিতুমীর সৈয়দ আহমদ শহীদের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল। তাঁরা এ সংগ্রামে সরকারের সহানুভূতি বা সমর্থন পাননি, উপরন্তু সরকার জমিদার ও নীলকরদের পক্ষ নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দমননীতি চালিয়েছেন। এর ফলে ইংরাজ বিরোধী মনোভাব জোরদার হয়, ইংরাজী ভাষা-সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফতোয়া জারি হয়। গ্রামের মানুষের ইংরাজী শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন, "আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংরেজী পড়িলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়।...সরাব খায়। জাবহাঝটকার বিচার নাই। হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক না-পাকে জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবি পোশাক পরে। ছুরি কাঁটায় খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায়

১ সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃঃ ১৩৩

ভক্তি করে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।...নম্রতার নাম গন্ধ থাকে না।"[১] ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্রদের ইংরাজী বিরোধী মনোভাবের একটি বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, "বর্তমানে অধ্যয়নরত কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্ররা এসেছে পূর্ববঙ্গ হতে। এদের মধ্যে আবার চট্টগ্রাম ও সুধারামের ছাত্র সংখ্যাই বেশী। পশ্চিমবঙ্গ বা শহরতলীর জেলাগুলির ছাত্র সংখ্যা শতকরা চার/পাঁচ ভাগ। চট্টগ্রামের মুসলমান ছাত্ররা খুবই ধর্মান্ধ, আধুনিক জীবনের প্রতি তাদের সামান্যতম সহানুভূতি নেই। স্বভাবতই তারা ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী হয়।"[২] ইংরাজী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসে অনেকে ধর্মনাশের আশঙ্কা করতেন।[৩] খ্রীস্টান মিশনারীগুলি ইসলাম বিরোধী প্রচার চালিয়ে এ-আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করেছিল। সেখানে বিদ্যাচর্চা করতে গিয়ে অনেক হিন্দুছাত্র খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করে, মুসলমান ছাত্রেরও দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। ইয়ং বেঙ্গলদের আচার-আচরণ কলিকাতা শহরে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেছেন, ঢাকার শিক্ষিত মুসলমানরা তাঁদের সন্তানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাই দিতেন; ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা ইংরাজী শিক্ষার কথা ভাবতেন না।[৪] এর উপরে আছে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য। ব্যয়বহুল ইংরাজী স্কুলে সন্তানদের পড়ান দরিদ্র পরিবারগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না। আধুনিক বিদ্যালয়গুলি ছিল শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, গ্রামে যাদের সামান্য সামর্থ্য ছিল, তারাও বিদ্যালয়ের অভাবে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতে পারেনি।

এর সঙ্গে যোগ করতে হয় সরকারের শিক্ষানীতির কথা। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ-যাট বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোন স্পষ্ট শিক্ষা-নীতি গ্রহণ করেননি। প্রথম দিকে বরং উদাসীন ছিলেন এই ভেবে যে, শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করলে জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। এদেশে মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-

---

১ আমার জীবনী, পৃঃ ১৩৩

২ Obaidullah Al Obaidi—Muhammedan Education, *The Bengal Magazine*, February 1873, p. 310

৩ আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনকে বলেছিলেন যে, তিনি লোকের মত নিয়ে জেনেছেন সমাজের এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, ইংরাজী শিক্ষা মুসলমান ধর্মমতে অবিশ্বাস জন্মায়। আবার কেউ কেউ ইংরাজী শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলমান ধর্মমত শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় ঐ শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন বলে মত দেন। মালঞ্চ, ভাদ্র ১৩২৪, পৃঃ ৩৮৩-৮৪

৪ Dr. James Wise—*Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London, 1883, p. 36

চতুষ্পাঠীতে ধর্ম-শিক্ষারই ব্যবস্থা ছিল। খ্রীস্টান মিশনারীরা স্কুল খুললে কোম্পানির লোকেরা তাঁদের উৎসাহ দেননি বরং মিশনারীদের বাধা দিয়েছিলেন এই আশঙ্কায় যে, ধর্মভীরু ভারতবাসী মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে ক্ষিপ্ত হবে।[১] ডিরেক্টরদের একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষা দিলে আমেরিকায় ব্রিটেন-বাসীর যে দশা হয়েছিল ভারতেও সেরূপ ঘটবে।[২] অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হলে আত্মজাগরণ ও মুক্তি আন্দোলন হবে, যার পরিণতি স্বরূপ ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজদের পাততাড়ি গুটাতে হবে। কিন্তু একটি দেশের কোটি কোটি মানুষকে চিরকাল অশিক্ষার অন্ধকারে রাখা যায় না; তাছাড়া, প্রশাসনিক কাজে স্থানীয় লোকের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। ১৮১৩ সালে ২০ বছর মেয়াদী সনদ লাভের সময় কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষা দানের জন্য সর্ব প্রথম বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন লাভ করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে খ্রীস্টান মিশনারীদের পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক প্রচার করতে বলা হয়, যার ফলে উইলিয়ম কেরী প্রমুখ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন।[৩] ১৮২৩ সালে 'জেনেরাল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকসন' বা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ গঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ঐ ১ লক্ষ টাকার সুষ্ঠু ব্যয় সম্ভব হয়নি। হোরেস হেম্যান উইলসন এর পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি ও বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট বেশীর ভাগ টাকা বেসরকারী হিন্দু কলেজের জন্য ব্যয় করেন। ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজী ক্লাশ খোলা হয় এবং হিন্দু কলেজে উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এ দুটি প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পেত না। সুতরাং তৃতীয় দশকের আগে পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ একান্ত ভাবে কলিকাতা শহরে সীমাবদ্ধ ছিল, সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের ফলভোগী হয়েছে উচ্চ বর্ণের ও উচ্চ বিত্তের হিন্দু সম্প্রদায়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অপরাপর জনসাধারণ সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যম কি ও শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ সে সম্পর্কে কোন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। গবর্নর-জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক

১ Muhammad Mohar Ali—*The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, The Mehrub Publication, Chittagong, 1965, p. 2

২ Syed Mahmud—*History of English Education in India* (1781-1893) Aligarh, 1895, p. 2

৩ J. A. Jamil—*The Muslim Year Book of India and who's who*, Bombay, 1948, p. 239

শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর পরামর্শে জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদের ডিরেক্টর লর্ড মেকলে ভারতের শিক্ষা-সংক্রান্ত 'মন্তব্যপত্র' প্রকাশ করেন (১৮৩৩)। তার আগে পরিষদে সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়। ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যপন্থী ও এঙ্গলিসিস্ট বা পাশ্চাত্যপন্থী—এ দুই দলের মধ্যে বিতর্ক হয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে। মেকলে ছিলেন ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার পক্ষপাতী। তিনি স্বীয় মন্তব্য-পত্রে এদেশের উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর প্রথম যুক্তি হল, এ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে তাঁরা পরে নিজেদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ করে নিবে, এটাই মেকলের 'ফিলট্রেসন থিওরী' বা 'অভিসেচনতত্ত্ব' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় যুক্তি হল, ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি হবে—এতে ভারতীয়দের মধ্যে এমন একটি শ্রেণী তৈরী হবে যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু চিন্তাধারা, নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরাজ হয়ে পড়বে। এরা সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে আনুগত্য বজায় রাখবে। মেকলের আরও যুক্তি ছিল, সেটি তাঁর মাকে লেখা একটি পত্রে প্রকাশিত হয়েছে; তিনি সেখানে বলেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করি তা হলে ত্রিশ বছর পরে বাংলাদেশে কোন পৌত্তলিক থাকবে না।"[১] বলা বাহুল্য, খ্রীস্টধর্ম প্রচারের সুবিধার কথা তিনি ইঙ্গিত করেছেন। মেকলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ সরকার ইংরাজী ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র ইংরাজী শিক্ষা খাতে সরকারী অর্থ-ব্যয়ের কথা বলা হয়।[২] মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার কথা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ বলেছিলেন, কিন্তু জনগণের আপত্তির কারণে সেগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকে। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদান পদ্ধতি অব্যাহত রাখা হল বটে, কিন্তু প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বৃত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়।

১ *History of Freedom Movement*, Vol. 2, p. 252.
১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে চার্লস গ্রান্ট প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে হিন্দুদের ধর্মের ভিত ধ্বসে পড়বে, যন্ত্র বিজ্ঞানের আলোকে ভারতীয়রা উদ্ভাসিত হবে এবং ক্রমশঃ পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের স্থলে খ্রীস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে।
British Policy and the Muslims in Bengal, p. 168

২ *Ibid*, p. 202

এরূপ প্রতিযোগিতায় ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সুবিধা হত বেশী। ১৮৩৬ সালে মহসীন ফাণ্ডের টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্র পড়ত। ঐ সালে সরকারী খরচে কলিকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ সালে ফারসী ভাষা রহিত করে ইংরাজী ও মাতৃভাষায় আদালত ও অফিসের কাজ চলবে বলে ঘোষণা করা হয়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে আইন পড়াবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৪ সালে ভারতীয়-দের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪২ সালে জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদের স্থলে 'এডুকেশন কাউন্সিল' বা শিক্ষা পরিষদ নামকরণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার অধীনে আনা হয়। ১৮৪৪ সালে পরিষদ কতকগুলি জেলা স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৩৫-৩৮ সাল পর্যন্ত জরিপ চালিয়ে উইলিয়ম এ্যাডাম শিক্ষা বিষয়ক তিনটি রিপোর্ট তৈরী করেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। ১৮৪৪ সালে সরকার প্রতি জেলায় মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ৩৬টি জেলায় ১০১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়; এগুলিকে রেভেনিউ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়।

যেভাবেই বিচার করি না কেন, সরকারের এসব প্রচেষ্টায় লাভবান হয়েছে শহরের লোকেরাই এবং বিশেষভাবে ইংরাজী শিক্ষানুরাগীরাই। মুসলমানদের মধ্যে এসময় ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয়নি। কেবল কলিকাতা মাদ্রাসায় প্রাথমিক মানের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হত, মাদ্রাসার ছেলেরা কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারত না।

উনিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের দিকে মুসলমানরা এসব কারণেই আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বৃহত্তর জনগণ নানারূপ ভাবধারা ও চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয় এবং নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। ষাট দশকে আবদুল লতিফের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত বাঙালী মুসলমানদের চরম বিপর্যয় ও নৈরাশ্যের কাল গেছে। ষাট-সত্তর দশক থেকে যাঁরা শিক্ষা আন্দোলনে এগিয়ে আসেন, তাঁদের এসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরাজী, বাংলা এই পঞ্চ ভাষায়[১] শিক্ষা সমস্যা, বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার ব্যাপারে

১ ১৮৫৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ঐ পাঁচটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। ঐ বছর ইঙ্গো-আরবীর স্থলে ইঙ্গো-ফারসী বিভাগ খোলা হয়, তৎসঙ্গে বাংলা ও উর্দু শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, সমাজের দারিদ্র্যদশা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার দ্বন্দ্ব, ক্রটিপূর্ণ পাঠ্য-পুস্তক, নারীশিক্ষার প্রতি বিমুখতা, সরকারের অপরিণত শিক্ষানীতি, সমাজের ধর্মান্ধতা, সাধারণ শ্রেণীর শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের প্রথমে ভাবতে হয়েছে, তারপর শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয়েছে। সমাজের দারিদ্র্যের কথা ভেবে তাঁরা অবৈতনিক শিক্ষা ও বৃত্তি-দানের ব্যবস্থা করেছেন, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, বোর্ডিং স্থাপন করে স্কুল-কলেজে ছাত্রদের থাকার সমস্যা দূর করেছেন, সরকারের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য আবেদন-নিবেদন ও স্মারকপত্র প্রদান করেছেন, ধর্মশিক্ষা বজায় রেখে ব্যবহারিক ও অন্যান্য বিদ্যা-দানের ব্যবস্থা করেছেন, ভাষাগত প্রশ্নে শেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া গত্যন্তর নেই, ইংরাজী শিক্ষার বিপক্ষে যে ভুল ধারণা ছিল, তা নিরসন করেছেন, ইসলামী সংস্কৃতি অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করে পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করেছেন, সভাসমিতি থেকে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছেন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এক কথায় তাঁরা বহুমুখী দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা প্রসারে সংগ্রাম করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহকে শাসক ইংরাজ মনে করেছিলেন, রাজ্যহারা মুসলমানদের ক্ষমতালাভের পুনঃপ্রয়াস বলে। ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও আক্রোশ আছে, এটা তাঁরা বুঝতে পারেন। মুসলমানরা সামাজিক ও আর্থিক দুর্গতির জন্য ইংরাজদের দায়ী করতেন। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজদের অনেক ক্ষয়-ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, বিদ্রোহ দমন করতে খরচ হয় চার কোটি টাকা। সুতরাং ভারতীয়দের প্রতি তাঁদের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে, তাঁরা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের প্রতি নজর দেন। শিক্ষার অভাবই মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ, এজন্য কিভাবে শিক্ষা বিস্তার করা যায়, সেদিকে প্রথম মনোনিবেশ করেন। সে সময় মোটামুটি আলোকপ্রাপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ, কর্মপটু ও উদ্যমী পুরুষ হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আবদুল লতিফ ও উত্তর প্রদেশ থেকে সৈয়দ আহমদকে নির্বাচন করা হয়। আবদুল লতিফের অব্যবহিত পরে সৈয়দ আমীর আলীর আবির্ভাব হয়। তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনে কোন দ্বিমত ছিল না। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী ব্যক্তিগতভাবে ও সমিতির মাধ্যমে যৌথভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা করেছেন। আবদুল লতিফ

মাদ্রাসাগুলিতে আরবী-ফারসী শিক্ষা অব্যাহত রেখে তার সঙ্গে ইংরাজী বিভাগ খুলে ইংরাজী শিক্ষা দানের চিন্তা করেছেন। 'এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই হাম্বল এফার্টস টু প্রমোট এডুকেশন স্পেশালি এমং দি মহামেডানস' গ্রন্থে আবদুল লতিফ তাঁর শিক্ষা-সংক্রান্ত কর্মসূচীর পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ভগ্নদশার উন্নতি সাধন করে সেগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার প্রয়াসের মধ্যে তাঁর বেশীর ভাগ উদ্যম ব্যয়িত হয়েছে। মহসীন ফাণ্ডের টাকায় হুগলী কলেজের ব্যয় নির্বাহ হত। সেখানে মুসলমান ছাত্র অপেক্ষা হিন্দু ছাত্র বেশী অধ্যয়ন করত। আবদুল লতিফ মহসীন ফাণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের পরামর্শ দিলে সরকার তা কার্যকরী করেন (১৮৭৪)। হুগলী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছাত্রাবাস নির্মিত হয় এবং ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। মুসলমানের শিক্ষা-উন্নতির ব্যাপারে আবদুল লতিফ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে যে সুপারিশ করেন তার ভিত্তিতে সরকার দেশের সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের বেতন দুই-তৃতীয়াংশ মুক্ত করেন এবং নয়টি জেলা-স্কুলে ফারসী শিক্ষক নিযুক্ত করেন।[১] আবদুল লতিফের চেষ্টায় ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। এতে মুসলমান ছাত্ররা উচ্চ ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে (১৮৭৩) এবং 'কেন্দ্রীয় টেক্সট বুক কমিটি'র সদস্য হিসাবে গ্রন্থ নির্বাচনে (১৮৮২) মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষায় আবদুল লতিফ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'দি স্পেক্টর', 'দ তালিসম্যান', 'রিফ্লেকসন ইন একজাইল' ইত্যাদি রচনায় হজরত মহম্মদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্য আছে, এরূপ অভিযোগ এনে তিনি পাঠ্যসূচী থেকে সেগুলি বাদ দেওয়ার কথা বলেন। এ ধরনের পাঠ্যপুস্তক মুসলমানদের ইংরাজী শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[২] ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের কাছে আবদুল লতিফ অভিজাত ও মধ্যবিত্তের জন্য উর্দু ও সাধারণ শ্রেণীর জন্য বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[৩] উচ্চ শিক্ষায় দরিদ্র ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আবদুল লতিফ

১ *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Decuments*, p. 216

২ *Ibid.*, pp. 218-22, 241

৩ *Ibid.*, p. 224

বিত্তবানদের উৎসাহিত করে কতকগুলি বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে লর্ড রিপন কলিকাতা মাদ্রাসার বার্ষিক পারিতোষিক সভায় এলে তাঁর স্মৃতিরক্ষা স্বরূপ চাঁদাদাতার নামের সঙ্গে বৃত্তি ও পুরস্কারগুলির নাম যথাক্রমে 'রিপন বৃত্তি' ও 'রিপন পুরস্কার' করা হয়।[১] এছাড়া, 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'কে আবদুল লতিফ মুখ্যতঃ শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ও গবেষণার চিন্তার ও চর্চার কাজে লাগিয়েছিলেন। 'এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা' (১৮৬১) 'এ পেপার অন মহামেডান এডুকেশন' (১৮৬৮), 'এ পেপার অন প্রেজেন্ট কনডিশন অব দি ইণ্ডিয়ান মহামেডানস এণ্ড দি বেস্ট মীনস ফর ইট্স ইম্প্রুভ-মেন্ট' (১৮৮৩), হান্টার কমিশনকে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর (১৮৮২) প্রভৃতি রচনায় আবদুল লতিফের সমকালীন শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা ও চেতনার ছাপ পড়েছে।

সৈয়দ আমীর আলী বিভিন্ন লেখায় ও রিপোর্টে, আলোচনায় ও বক্তৃতায় মুসলমান সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক সমস্যারও মোকাবেলা করেছে। ১৮৮২ সালে মার্কুইস অব রিপনকে প্রদত্ত 'স্মারকপত্রে' সৈয়দ আমীর আলী বলেছিলেন যে, ১৮৩৭ সালে ফারসী শিক্ষার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে, এর পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা এখন অচল, তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ফারসী বা উর্দুতে পরীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি রপ্ত করার মধ্যে তিনি সম্মান ও মর্যাদার চিহ্ন দেখেছিলেন। এজন্য দেশবাসীকে শাসকের ভাষা, বিজ্ঞান ও ও সাহিত্য গ্রহণ করার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন।[২] আবদুল লতিফের শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে আমীর আলীর চিন্তাধারার এখানেই পার্থক্য ছিল, এই কারণে তাঁরা একত্রে মিলতে পারেননি। ১৮৯৯ সালে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সে'র প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি মাদ্রাসাগুলি তুলে দিয়ে আলিগড় কলেজের আদর্শে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।[৩] এসোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহিত করেছেন, ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করে গরীব ও

১ *Op. cit.*, pp. 237-38

২ K. K. Aziz—*Ameer Ali : His Life and Works*, pp. 37-38

৩ *Abstract of the Proceedings of an Extraordinary Meeting of this Comittee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta*,… 9 June, 1900

মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছেন। শাখা এসোসিয়েশন-গুলি নিজ নিজ এলাকায় কোথাও ইংরাজী বিদ্যালয়, কোথাও বাংলা বিদ্যালয় কোথাও মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।[১]

আবদুল লতিফ ও আমীর আলী ছাড়া ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী, সৈয়দ শামসুল হোদা, স্যার আবদুর রহিম, আবদুল করিম বিএ, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, আবদুল আজিজ বিএ, হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বিএল প্রমুখ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন। তাঁরা পুস্তক-প্রবন্ধ রচনা করে, সভাসমিতি গঠন করে এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। 'কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা', 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', 'চট্টগ্রাম মোসলমান শিক্ষা সভা', 'আঞ্জমনে হেমায়েত ইসলাম' (বরিশালে) 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রভৃতি সভা-সমিতি শিক্ষা-প্রচার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির উদ্যোগ ও কর্মসূচী ব্যাপক ছিল। বিভিন্ন সমিতির বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করে উদ্যোক্তাগণ জনসাধারণের মনে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওবায়দুল্লাহ ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। আবদুল আজিজ, হেমায়েতউদ্দীন তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন। তিনি 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' (ফেব্রুয়ারী ১৮৭৩) 'মহামেডান এডুকেশন' শীর্ষক একটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন।

কলিকাতা হাই-কোর্টের উকিল সৈয়দ শামসুল হোদা সমাজ-উন্নতির জন্য যেসব কর্মসূচী নিয়েছিলেন সেসবের মধ্যে শিক্ষা ছিল প্রধান। তিনি কিছুকাল কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবী-ফারসীর সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির সভাপতি হন। তিনি বাংলা মাসিক 'সুধাকর' ও ইংরাজী সাপ্তাহিক 'মহামেডান অবজারভার' পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান করেন। সুতরাং আইন ব্যবসায় করলেও শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কলিকাতার কারমাইকেল হোস্টেল প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ছিলেন মূলশক্তি। মুসলমানদের জন্য একটি সরকারী কলেজ স্থাপনের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন, এরই ফল স্বরূপ ওয়েলেস্‌লি স্ট্রীটে নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইসলামিয়া কলেজের জন্য জমি ক্রয় করা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসায় অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা পড়ত। সাধারণ শ্রেণীর ছেলেদের কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য তিনি 'কড়েয়া মুসলিম

১ বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

বয়েজ স্কুল' প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁর দান আছে; ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। শিক্ষা বিভাগে চাকুরীর ক্ষেত্রে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ফর মুসলিম এডুকেশন' এবং প্রতি বিভাগে একজন করে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর ফর মুসলিম এডুকেশন' পদ সৃষ্টি তাঁর উদ্যোগের ফল। পদগুলির সৃষ্টিতে মুসলমান শিক্ষা বিস্তারে সুদূর প্রসারী ফল ফলে। প্রথম মুসলমান সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল করিম স্বপেশায় নিযুক্ত থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার মুখোমুখী হয়েছেন, তিনি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছেন। 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থখানি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফল। আবদুল লতিফের মত তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন কামনা করেছেন। তিনি সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলমান শিক্ষক ও স্কুল-পরিদর্শক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছেন।

কোন কোন বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী জমিদার ও জোতদার নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করে শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা করেছেন। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষার অসুবিধার কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় শব্দে এবং সাহিত্যে হিন্দুয়ানি ভাবের প্রাধান্য থাকায় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীর সমালোচনা করেন।

মুসলমান শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ সত্তর-আশি দশকে যে ভূমিকা রচনা করেছিলেন, নব্বই দশকে মুসলমান লেখকেরা বাংলা পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে সেটিকে জোরদার করেন এবং ক্রমশঃ ব্যাপক আন্দোলনের রূপ দেন। আধুনিক শিক্ষার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পত্রিকাগুলি বিশেষ সহায়তা করেছে। লেখক-সম্পাদকগণ বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে এবং বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে আলোচনা ও বিতর্ক উত্থাপন করে একাধারে সমাজের দোষত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন, অন্যধারে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করে দাবী-দাওয়া পূরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করে মুসলমান সমাজের ঐ বিষয়ে চরম শূন্যতা দূর করেছেন। মীর মশাররফ হোসেন লিখেছেন 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' (১ম ভাগ ১৯০৩, ২য় ভাগ ১৯০৮) গ্রন্থ। তাঁর 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩) ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। নওশের আলী খান

ইউসফজয়ী শিক্ষা বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন, যথা 'দলিল রেজিস্ট্রারী শিক্ষা' (১৮৯৭), 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০২), এবং 'নোটস অন মহামেডান এডুকেশন'। আবদুল জব্বার 'নামাজ শিক্ষা' (১৯০৪) গ্রন্থে ধর্মশিক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। রেয়াজুদ্দীন আহমদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' গ্রন্থের অর্থপুস্তক 'বোধোদয়তত্ত্ব' (১৮৭৯) রচনা করেন শিশুদের কাছে ঐ গ্রন্থ সহজবোধ্য করে তোলার জন্য। তাঁর 'পদ্য প্রসূন' (১৮৮০) ও 'তোহফাতুল মোসলেমিন' (১৮৮৫) শিশুপাঠ্য বই ছিল। মোজাম্মেল হক ও কাজী ইমদাদুল হক স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ছাত্রপাঠ্য অনেক বই লেখেন। 'সাহিত্য শিক্ষা', 'পদ্যশিক্ষা', 'সরল বাংলা শিক্ষা', 'শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা', 'পত্রদলিল লিখনশিক্ষা' প্রভৃতি বই মোজাম্মেল হক রচনা করেন। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ তৎকালীন স্কুল বুক কমিটির অনুমোদন লাভ করে। তাঁর 'পদ্যশিক্ষা' 'ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের প্রচারিত পাঠ্যলিস্টে ৪র্থ শ্রেণীর নীতিশিক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট' ছিল।[১] সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর ইমদাদুল হকের শিক্ষানুরাগিতা খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রখর ছিল। নিজ পেশায় নিযুক্ত থেকে তিনি মুসলমানের শিক্ষা-উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেছেন, উপরন্ত বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর কর্ম প্রয়াসকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। তিনি 'নবি কাহিনী' পুস্তকখানি বালকদের পাঠোপযোগী করে রচনা করেন, এটি স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদন পেয়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়।

এদিকে মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ সুবক্তা বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। জনগণের সাথে থেকে জনগণের প্রকৃত অসুবিধা উপলব্ধি করে সেগুলি নিরসনের পথ ও পদ্ধতির কথা বলেছেন তাঁরা। তাঁরা ধর্মশিক্ষার সঙ্গে অর্থকরী কৃষি, শিল্প, কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রচার করেছেন। তাঁরা প্রায় সকলেই রাজভাষা ইংরাজী শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, তবে কেউ কেউ প্রচলিত শব্দমালা এবং ভাবধারার পরিবর্তন কামনা করেছেন। দেশের নবাশিক্ষিত ব্যক্তি, লেখক, সাংবাদিক, বাগ্মী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রচেষ্টায় সেযুগে শিক্ষা-সংস্কারের যে আন্দোলন হয়েছিল, এখন তার প্রধান ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

১ মিহির ও সুধাকর, ১৩০২, পৃ: ৭০

আধুনিক শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতি এই ত্রিবিধ সমস্যা জড়িত ছিল, পূর্বে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, নিম্ন শ্রেণীর জন্য আর এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার সহিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। এক কথায়, মুসলমান শিক্ষা সেযুগে বহুমুখী সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক হয়েছে, তদন্ত হয়েছে, তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এসব কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়। পুরাতন শিক্ষা প্রণালী বিদায় নেয়, আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর আবির্ভাব ঘটে। সমাজের সমস্যা সেযুগের সাহিত্যিকদের চিন্তাকে আলোড়িত করেছিল। পঞ্চভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "বঙ্গীয় মুসলমানদিগের শিক্ষার পথে দারুণ অন্তরায়। হিন্দুদিগের যে স্থানে ২টা বা ৩টা ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তথায় ৫টা ভাষা আয়ত্ত না করিয়া উপায় নাই। প্রথমতঃ বাঙ্গালা ইঁহাদের মাতৃভাষা হইলেও বিশুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। উহা আরবী মিশ্রিত এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গালা। সুতরাং মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষা দস্তুর মতন শিক্ষা করা চাই। তারপর আরবী বেশী না হউক কোরান শরীফ বিশুদ্ধ ভাবে পাঠ করিবার উপযোগী ত হওয়া চাই। জাতীয় আচার ব্যবহার উন্নত করণ জন্য, 'আদব-কায়দা' শিক্ষার জন্য, ভাল জাতীয় কাব্য ও ইতিহাসের রসাস্বাদন জন্য, অতি সুমধুর ও স্মৃতিসুখকর পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। তৎপর উর্দু ভাষা, ইহা ভারতীয় মুসলমানদিগের জাতীয় ভাষা বলিয়া পরিবর্তিত হইতে পারে। প্রয়োজনীয় ধর্মগ্রন্থাদি সমস্তই প্রায় এই ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে বা হইতেছে। এই ভাষা শিক্ষা না করিলে নাগরিক সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত বাক্যালাপ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং উর্দু ভালরূপে শিক্ষা করা দরকার। অবশেষে রাজভাষা ইংরাজী,...এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলে, বঙ্গীয় মুসলমান প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।"[১] ভাষা শিখতেই মুসলমান ছাত্রদের

১ ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮

শিক্ষার বয়স অতিক্রান্ত হয়, এর উপর ঐ ভাষার বিদ্যা আয়ত্ত করা ছিল এক দুঃসাধ্য ও প্রাণান্তকর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে এতে কোন বিদ্যাই ভালভাবে অর্জিত হয় না। বয়সের আধিক্যহেতু উচ্চ শিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিত। রেয়াজুদ্দীনের উক্তিতে অংশত আবদুল লতিফের চিন্তার প্রতিফলন আছে।

সৈয়দ আবদুল গাফফর 'তরফের ইতিহাস' (১২৯৪) গ্রন্থে বলেছেন, "ইংরাজী ভাষার প্রতি মুসলমানদের পূর্ব হইতেই ভয়ানক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরাজী শিখিলেই নরকগামী হইতে হইবে এবং ইংরাজী পড়াইয়া খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বহু কালের সংস্রবে এবং দেশের প্রচলিত ভাষার গতিকে বাঙ্গালার প্রতি বিদ্বেষের লাঘব হওয়াতে অনেকেই বাঙ্গালা শিখিতেছেন।"[১] তিনি বলেছেন যে, তরফের লস্করপুর নিবাসী সৈয়দ মকজ্জল হাসন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মজম্মিল হাসনকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিয়ে সমাজের কাছ থেকে তিনি 'কিয়ৎকাল ভয়ানক গঞ্জনা সহ্য' করেছিলেন।[২] পায়রাবন্দের জমিদার জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের জ্যেষ্ঠ কন্যা করিমুন্নেসা খানমের বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়েও সমাজে নিন্দার ভাগী হয়েছিলেন।[৩] ইংরাজী বিরোধী লোকদের চিহ্নিত করে মহম্মদ কে চাঁদ লিখেছেন, "মৌলভীগণ প্রায় বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান দর্শন 'কুফরে কালাম' ও ইংরাজী শিক্ষা 'এলমে বেদিন'। ইহা অল্প শিক্ষিত আলেম, ফাজেল, মৌলভী, ওয়ায়েজ প্রভৃতি উজ্জ্বল উপাধিধারী কাটমোল্লাগণের স্বরচিত বচন মাত্র। ইহার ভিত্তি ইসলাম ধর্মে, কোরানে বা হাদীসে কোন স্থানেই নাই। তাহারা জীবিকা নির্বাহের জন্য অজ্ঞ মুসলমান-দিগকে বিবিধ অলীক ভিত্তিশূন্য গল্পকে হাদীস বলিয়া শুনাইয়া তাহাদিগকে মোহিত করে এবং এইরূপে তাহাদিগকে জ্ঞানান্ধ করিয়া রাখিয়াছে।"[৪]

সমাজের এই অন্ধত্বের ভাব শেষ পর্যন্ত টিকেনি, মানুষের মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে; প্রথম দিকে দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে সমাজ কিভাবে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সে-বিষয়ে আলোকপাত করে মোহাম্মদ আফতাবউদ্দীন আহমদ

১ সৈয়দ আবদুল আগফর---তরফের ইতিহাস, পৃঃ ১১

২ ঐ, পৃঃ ১২

৩ রোকেয়া-রচনাবলী, পৃঃ ২৮৫

৪ মোহাম্মদ কে চাঁদ—মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষার অবনতির কারণ, ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন, ১৩১৩

লিখেছেন, "ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকে এখন একটু একটু বুঝিতে-ছেন, কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস, ইহা চাকুরীর সহায় মাত্র, কিন্তু ধর্মের প্রবল শত্রু। তাই ধনলাভের আশায় কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট। আমার বিশ্বাস, ইংরাজী শিক্ষার সহিত আরব্য-পারস্য ভাষায় যতই মুসলমানগণ শিক্ষিত হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা হৃদয়রস সংগ্রহ করিয়া জাতীয় ভাবে সুদৃঢ় হইতে পারিবেন।"[১] কাজী ইমদাদুল হক দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে উঠে সমাজকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, "শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে এক্ষণে ইংরাজি শিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক। আজকাল ইংরাজি শিক্ষা না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যাঁহারা কাফেরী ভাষা বলিয়া ইংরাজি শিক্ষার এবং এলমে বেদীন বলিয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, তাঁহারা অজ্ঞান, তাঁহারা মূর্খ, তাঁহারা দয়ার পাত্র। আমরা ইংরাজি শিক্ষা করিব যে শুধু চাকুরী করিবার জন্য তাহা নহে, জ্ঞান প্রচারের জন্য, বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য। যাঁহারা বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আরবী ভাষা দ্বারা জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার-করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আরব দেশে গমন করিতে অনুরোধ করি। ইসলাম কখনো একমাত্র আরবী ভাষার মধ্যে আবদ্ধ নহে, বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিলে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি ছাড়া কখনো খর্ব হইবে না।"[২] ইমদাদুল হক গ্রাজুয়েট ছিলেন, তিনি আমীর আলীর চিন্তাধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি আরবী-ফারসী প্রেমিকদের দেশ ছাড়তে বলেছেন, সেযুগে এরূপ বলা সহজসাধ্য ছিল না। শেখ ফজলল করিম প্রায় অনুরূপ প্রতিধ্বনি তুলে বলেছেন, "এ যুগ বেশীর ভাগ ইংরাজীর। ইংরাজী না শিখিলে আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই। বর্তমান শিক্ষা প্রণালী ধর্মের হিসাবে আমাদের কাজে আসিতেছে না। লুপ্ত জাতীয়তা জাগাইতে পারিতেছে না। জাগাইতেছে লাম্পট্য, চৌর্য, বিলাসিতা ও ভান। সুতরাং শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করিয়া নতুন ধরণের একটা তার্কিক ব্যূহ গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে।"[৩]

মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটির উল্লেখ করে 'প্রচারক' সম্পাদক মেয়েজউদ্দীন আহমদ বলেন, "যতদিন আরবী এবং ফারসী ভাষার ব্যাকরণ এবং অভিধান বঙ্গভাষায় লেখা না হইবে, ততদিন চিন্তায় কোন ফল হইবে না। যেদিন মাদ্রাসার শিক্ষকেরা আরবী এবং পারসী ভাষা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অর্থ করিয়া ছাত্রদিগকে

১ এম. আফতাবউদ্দীন আহমদ—বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা, ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ ১৩১১

২ কাজী ইমদাদুল হক—ধর্ম এবং শিক্ষা, নবনূর, ফাল্গুন ১৩১০

৩ শেখ ফজলল করিম—ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার, কোহিনুর, আষাঢ় ১৩২১

শিক্ষা দিবেন, সেই দিন বঙ্গীয় মোসলমানের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইবে। যেদিন মাদ্রাসাসমূহ আধুনিক পদার্থবিদ্যা, ভূগোল এবং ইতিহাস নিয়মিত শিক্ষা দিবেন সেই দিন আমরা দ্রুতগতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব।"[১] বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য পড়াবার ব্যবস্থা ছিল বটে,[২] কিন্তু বাংলা ছাড়া অন্যান্য বিষয় উর্দুর মাধ্যমে পড়ান হত, পরীক্ষার খাতায় উর্দুতে লিখতে হত। ইংরাজী-বাংলা শিক্ষার সঙ্গে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করে মাদ্রাসা শিক্ষা-সংস্কারের জন্য আবদুল করিম ও আবু নসর ওহীদ যত্নবান হন। আবু নসর ওহীদ মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ধর্মের সঙ্গে আধুনিক বিদ্যার সামঞ্জস্য রেখে 'নিউ মাদ্রাসা স্কীম' শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন (১৯০৮)। তাঁর এই প্রচেষ্টার মধ্যে সরকারের সহযোগিতা ছিল। আধুনিক শিক্ষানুরাগীরা এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের মোহ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছিলেন। যেহেতু তাঁদের চিন্তাধারা ছিল যুক্তিশীল, কর্মপন্থা ছিল বাস্তব প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু তাঁরা সে মোহ ও সংস্কারের আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। শতাব্দীর শেষে সমাজের মতিগতি ফিরতে শুরু করে এবং নব যুগের পদধ্বনি শোনা যায়।

ছাত্রাবাস আন্দোলন

জাতীয় চেতনার উন্মেষের কালে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, অত্যধিক দারিদ্র্য বশতঃ তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রথম দিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি শহর-বন্দরে কেন্দ্রীভূত থাকায় যে-কোন শিক্ষা গ্রহণ করতে গ্রামের মানুষকে শহরে যেতে হত। মুসলমান সমাজে 'জায়গীর প্রথা' প্রচলিত ছিল। অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজগৃহে ছাত্র রেখে তাদের ভরণপোষণ চালাতেন। কলিকাতা মাদ্রাসার ইতিহাসে দেখা যায়, মাদ্রাসার মফস্বলের ছাত্ররা ছোটখাট ব্যবসায়ী,

---

১ প্রচারক, কার্তিক ১৩০৭

২ ১৮৮৪ সালে জনশিক্ষা ডিরেক্টর আলফ্রেড ক্রফটের নির্দেশে মাদ্রাসায় বাংলা ও অংক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়।
Supplementary Note on Mahomedan Education (Director of Public Instruction), 1883-84, Para 12

উকিল-মোক্তার, এমন কি বাবুর্চি-খানসামার গৃহে থেকে পড়াশুনা করত।[১]

ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আত্মজীবনী 'দস্তানে ইব্রাত্বারে' (১৮৮০) কলিকাতার জায়গীর প্রথার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "কলিকাতায় দু'প্রকার জায়গীর—ছাত্রদেরকে কোন শর্ত ছাড়াই থাকার জায়গা ও খাওয়া-দাওয়া পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় রকমের জায়গীর—বাড়ীওয়ালার দিক থেকে কাজের শর্ত থাকে, যেমন ছেলেপুলে পড়ানো, হিসাবপত্র লেখা ইত্যাদির দায়িত্ব তালিবে ইলমের উপর ন্যস্ত করা হয়। এ ধরনের জায়গীরকে কোন কোন স্থলে খাওয়া-দাওয়ার খরচ বহন ছাড়া মাসিক কিছু নগদ অর্থও দেওয়া হয়। আমাদের আর্থিক সংকটের প্রতি লক্ষ্য করে আমার ভাই ঠনঠনিয়া মহল্লায় মির্জা ফতে আলীর বাড়ীতে আমার জন্য শর্তযুক্ত জায়গীর ঠিক করলেন। বড় বাজারে ফতেহ আলীর আতরের দোকান ছিল। সেই দোকানের হিসাবপত্র লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়।"[২] তিনি পরে মুরগী হাটা মহল্লায় শেখ আসাদুল্লাহর গৃহে ছেলে পড়ানোর শর্তে জায়গীর থাকতেন। তাঁর মেজ ভাই মোবারক আলী বোংগা মহল্লায় মুহম্মদ আলী খান নামক একজন আড়তদারের গৃহে জায়গীর থেকে আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেন। বড় ভাই মুহম্মদ আলী তালতলা মহল্লায় থেকে ঐ মাদ্রাসায় পড়তেন।[৩] মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে (১৯০৮) বলেছেন যে তিনি কলিকাতা আদালতের আমিন নাদির হোসেনের গৃহে থেকে পড়াশুনা করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। নাদির হোসেনের কন্যা আজিজন্নেসার সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়।[৪]

শহরে মুসলমানের সংখ্যা কম, তদুপরি নাগরিক জীবনে ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ সৃষ্টি হলে এরূপ ছাত্রপোষণ প্রথা উঠে যায়। সুতরাং ছাত্রদের থাকার জন্য ছাত্রাবাসের সমস্যা দেখা দেয়। আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার তদন্ত রিপোর্টে এ সমস্যার কথা তুলেছিলেন। হুগলী শহরে মুসলমান বাশিন্দা খুবই কম। মুসলমান ছেলেরা যাতে মহসীন ফাণ্ডের সুবিধা পায়, সেজন্য আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার সহিত ইংরাজী-ফারসী বিভাগ খোলা এবং মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ গৃহীত হয় এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন ছাত্রাবাস

১ *Community in Bengal*, p. 68
২ পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮, পৃঃ ৭৮-৭৯
৩ ঐ, পৃঃ ৭৮-৮১
৪ আমার জীবনী, পৃঃ ২০৮, ২৬০

নির্মিত হয়।[১] কলিকাতা মাদ্রাসা সংলগ্ন 'এলিয়ট হোস্টেল' নির্মাণেও আবদুল লতিফের দান ছিল। হোস্টেলে রক্ষিত 'স্মৃতি-ফলকে' সেকথার উল্লেখ আছে (১৮৯৮)।[২] ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের আবাসিক মাদ্রাসায় প্রথম থেকেই ছাত্রাবাস ছিল।

বরিশাল সরকারী স্কুলের ছাত্রের জন্য 'বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং' (১৮৯৫) নির্মিত হয়।[৩] স্থানীয় সরকারী উকিল হেমায়েতউদ্দীন আহমদ এটি নির্মাণে নেতৃত্ব দেন। ৬০ জন ছাত্রের বাসোপযোগী এই বোর্ডিং-এর সঙ্গে একটি 'লাইব্রেরী' ও 'রিডিং রুম' ছিল। শায়েস্তাবাদের জমিদার সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ৫০০৲ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। সরকার ঘোষিত 'সেলফ-হেলপ' বা স্বাবলম্বনের নীতিতে বিদ্যালয় বা ছাত্রাবাস নির্মাণের মোট টাকার বেশীর ভাগ অংশ স্থানীয় লোকের চাঁদায় সংগৃহীত হলে সরকার কিছু অনুদান প্রদান করত। মুসলমান সমাজে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রবণতা ঐ সময় থেকে দেখা যায়।[৪]

চট্টগ্রামের সরকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল আজিজের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম শহরে 'ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল' নির্মিত হয় (১৮৯৯)। স্থানীয় জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ খান ২০০০০৲ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেছিলেন। হোস্টেলে ৪০ জন ছাত্রের স্থান সংকুলান হয়।[৫]

রাজশাহীতে 'ফুলার হোস্টেল' (১৮৯৯) নির্মাণে নেতৃত্ব দেন সাব-রেজিস্ট্রার মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। 'ইসলাম-প্রচারকে' (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮) লেখা হয়, ইউসুফ আলী নওগাঁয় অনুরূপ আর একটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণে সচেষ্ট

১ *A Minute on Hooghly Madrashah,* 1861

২ ১৮৯৬ সালে সরকারের খরচে দ্বিতল বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মিত হয়। কিন্তু স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় ১৮৯৮ সালের আগে এটি উদ্বোধন করা হয়নি। ১৯০২ সালে তিন তলা করা হয়। প্রায় ১৫০ জন ছাত্র এখানে থাকার সুযোগ পায়। *Muslim Community in Bengal,* p. 70 ; *The Moslem Chronicle,* 20 August 1898

৩ রিটসন বেল ঐ ছাত্রাবাস নির্মাণের একজন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাংলা সরকারের ল্যান্ড রিকুইজিশন এণ্ড এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ছিলেন। ইসলাম-প্রচারক, আষাঢ় ১৩১০

৪ *Quinquennial Review of Education in India,* 1892-93 to 1896-97, p.346 ; *The Moslem Chronicle, 1 October* 1898, p.998

৫ ইসলাম-প্রচারক, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০

আছেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে কুষ্টিয়ায় ছাত্রাবাস নির্মিত হয়, তাঁরা ফরিদপুরের রাজবাড়ীতে অপর একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের চেষ্টায় রত আছেন। ঢাকাতেও ফুলারের নামে ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ গৃহ নির্মাণের ভূমিদান করেন।[১]

কুমিল্লা শহরে 'মোসলেম বোর্ডিং' নির্মাণের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভায় চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।[২] মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশন এক সভায় শহরে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৩] কাটোয়ায় 'মোসলেম বোর্ডিং হাউস' তৈরীর জন্য স্থানীয় আয়মাদার আবদুল হালিম চাঁদা সংগ্রহ করেন।[৪] ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির (১৮৯৫-৯৮) পাবনা পরিদর্শন উপলক্ষে স্থানীয় মুসলমানগণ তাঁকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তুতি সভায় মিলিত হয়ে পাবনা জেলা-স্কুলের মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব নেয়: স্থানীয় জমিদার চৌধুরী ফয়েজউদ্দীন ২০০০৲ টাকা এবং রফিকুন্নেসা ও ফকরুন্নেসা চৌধুরানীদ্বয় ২০০০৲ টাকা দান করেন।[৫] স্যার জন উডবার্ন ময়মনসিংহ পরিদর্শনে গেলে স্থানীয় লোকে 'মোসলেম বোর্ডিং হাউস' স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু স্থানীয় চাঁদা সংগৃহীত না হওয়ায় ছোটলাট তাঁদের প্রার্থনা নাকচ করে দেন।[৬]

সমগ্র দেশের চাহিদার তুলনায় এ প্রচেষ্টা নগণ্য, কিন্তু দেশের মানুষ নিজেদের অভাব বুঝতে পেরেছে এবং সে অভাব দূর করার প্রয়োজন আছে---এসব ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। ছাত্রাবাস স্থাপনের এসব প্রয়াসে আনন্দ প্রকাশ করে রেয়াজুদ্দীন আহমদ একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "বঙ্গদেশে আজকাল বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস স্থাপন সম্বন্ধে বেশ একটু আন্দোলন হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ উন্নতহৃদয় উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানের প্রাণপণ চেষ্টায় কয়েকটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছে। যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, বঙ্গদেশে শীঘ্রই বহুতর মুসলমান ছাত্রাবাস স্থাপিত হইবে।"[৭]

---

১ *The Moslem Chronicle*, 1 October 1898, p. 998

২ কোহিনুর, বৈশাখ ১৩১২, পৃঃ ৩২

৩ *The Moslem Chronicle*, 11 July 1898, p. 310

৪ *Ibid.*, 12 November, 1898, p. 1079

৫ *Ibid.*, 26 December, 1898, p. 581

৬ *Ibid.*, 1 October, 1891, p. 991

৭ এবনে মাআজ (রেয়াজুদ্দীন আহমদের ছদ্মনাম)—মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস, ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮

পাঠ্য পুস্তক

আবদুল লতিফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ইংরাজী পাঠ্য-পুস্তকের এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী নিম্ন ও মধ্য বিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের আপত্তিকর অংশ বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সমাজের নিন্দা, অপমান ও গ্লানি শিখবার জন্য অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না বলে তাঁরা অভিমত দিয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করার মত মনোভাব সমাজের তখনও গড়ে উঠেনি। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে ধর্মশিক্ষার স্থান তো নেই, উপরন্তু ইসলাম ধর্মের বিরোধী কথা আছে, ধর্ম ও সমাজের আদর্শ ও গৌরবের কথা না থাকায় মুসলমান ছাত্রেরা ধর্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাসের হানি ঘটছে—এসব অভিযোগ আবদুল লতিফ প্রমুখের চিন্তা ও বক্তব্যের সূত্র ধরেই মুসলমান লেখকগণ তাঁদের লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। খ্রীস্টান ও হিন্দুয়ানি বিষয়-আশ্রিত পুস্তকের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান অভিযোগ। দ্বিতীয় অভিযোগ মুসলমানের লেখা পাঠ্যবই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায় না, তার বিরুদ্ধে।

মীর মশাররফ হোসেন 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' (১৩১০) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, "বঙ্গে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার পুস্তক যথানিয়মে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আমি যে এই ১ম শিক্ষা পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে।"[১] তিনি কারণটি সেখানে আর বলেননি, তবে পুস্তক-খানির পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে মুসলমান ছাত্রের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ১৯০৮ সালে রচিত আত্মজীবনীতে তিনি যা লিখেছেন তাতে এ-সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। বাল্যস্মৃতি মন্থন করে তিনি বলেছেন, "আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম, ইংরাজী আর বাঙ্গলা পড়িতে হয়। এতদিন পড়িলাম—আল্লাহ-রসুলের নাম কোন স্থানে পাইলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরাজী কেতাব মধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম। পাকসাফ পবিত্রতার নামগন্ধ পাইলাম না। আল্লাহ-রসুলের নাম কেতাবে নাই কিন্তু রাম শ্যাম হরি কালী দুর্গা শূকর, কুকুর, শৃগালের নাম অনেক স্থানে পাইলাম।"[২] বাল্যকালের এই বেদনাদায়ক স্মৃতিকথা অন্তরে লালন করেই তিনি পরবর্তীকালে 'মুসলমানের

১ মীর মশাররফ হোসেন—মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা (১ম ভাগের প্রথম অংক), কলিকাতা ১৩১৩, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

২ আমার জীবনী, পৃঃ ১৭৮-৮০

বাঙ্গলা শিক্ষা' রচনা করেন। যাঁরা বাংলা স্কুলে পাঠ করেছিলেন তাঁদের সকলেরই এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আত্মচিন্তার যুগে এরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছে।

রেয়াজুদ্দীন আহমদ আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর সমালোচনা করে বলেছেন, "মুসলমান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নিরাপদ নহে। এই শিক্ষার দোষে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান দোষ ধর্মাচারবিহীনতা ও নীতিজ্ঞানপরিশূন্যতা। ধর্মবিশ্বাসেও অনেকের ত্রুটি আছে। অনেকের ধর্মমত নাস্তিকের কাছাকাছি।"[১] লেখক ইংরাজী শিক্ষার বিরোধিতা করেননি, ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীতে যে দোষ আছে তার প্রতিকার চেয়েছেন। তিনি অপর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধর্মহীনতা বিরাজ করছে। তাঁরা 'আপনাদের জাতীয় ধর্মগ্রন্থাদি পড়িতে বা উপযুক্ত ধার্মিক পুরুষদিগের নিকট ধর্মকথা শুনিতে অনিচ্ছুক হন।'[২] তিনি পার্থিব উন্নতির জন্য ইংরাজী এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধর্মশিক্ষা কামনা করেছেন। আফতাবউদ্দীন আহমদ পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিতে আমাদিগকে ধর্মগন্ধবিহীন বাঙ্গালা ইংরাজী ও সংস্কৃতের বকুনি শিখিতে হইয়াছে। যাঁহারা আপনাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য নিয়োজিত তাঁহারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত পাঠ্য নির্দেশ না করিয়া, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান নীতি অনুমোদিত পাঠ্যে আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।"[৩] রেয়াজুদ্দীন আহমদের মত আফতাবউদ্দীন আহমদ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশিক্ষার সমন্বিত পাঠ্য প্রণালী কামনা করেছেন: "ধর্ম প্রচারক মৌলবী মোল্লা সাহেবেরা ইংরাজী বাঙ্গালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, ইংরাজী শিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষার বিষয়ে ওয়াজ নসিহত করিলে, বোধ হয় সমাজচিত্র ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পাইতাম।"[৪] পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে অভিযোগ পরবর্তীকালে শহীদুল্লাহর কণ্ঠেও শোনা যায়। তিনি বলেছেন যে, ধর্মপুস্তকে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের এবং ইতিহাসগ্রন্থে হিন্দু রাজা-মহারাজার গুণকীর্তন করা হয়। ইতিহাসগ্রন্থে মুসলমান শাসকদের অত্যাচারী ও নিষ্ঠুররূপে চিত্রিত করা হয়। এরূপ

১ ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮

২ এবনে মাআজ—আমাদের কি করা উচিত, ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

৩ আফতাবউদ্দীন আহমদ—বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা, ইসলাম-প্রচারক, আষাঢ় ১৩১১

৪ ঐ

গ্রন্থ পাঠ করে হিন্দু ছাত্রদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তার ফলস্বরূপ 'রাষ্ট্রীয় একতার মূলোচ্ছেদন করা হয়'।[১]

সভাসমিতির মাধ্যমেও পাঠ্যপুস্তকের অনৈসলামিক বিষয়বস্তুর সমালোচনা করা হয়। রাজশাহীর আঞ্জমনে হেমায়েত ইসলাম এদেশের 'শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক' সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে, "বাঙ্গালা পাঠশালায় মুসলমান সন্তানদিগকে রীতিনীতি, আদব তমিজ ও ধর্মসংক্রান্ত কোন বিশেষ পুস্তক পড়ান হয় না। যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে হিন্দুদিগের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার মুখস্থ করিতে হয়। মোসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থকর্তা অধিক নাই। যে দুই চারিজন আছেন তাঁহাদের পুস্তক সিলেক্ট কমিটির হিন্দু মেম্বরগণের সুবিচারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পায় না।...এইজন্য আমাদের বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের চক্ষে মোসলমান গ্রন্থকর্তার পুস্তক পড়ে না এবং দুনিয়াতে মোসলমান লেখক আছেন বলিয়া আমাদের বালকগণ বুঝিতে পারেন না।"[২] বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির শিক্ষা বিষয়ক সামগ্রিক আন্দোলনের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত আন্দোলন ছিল অন্যতম। সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মিলনে মুসলমান ছাত্রের পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে গৃহীত একটি প্রস্তাব ছিল এরূপ: "বর্তমান সময়ে বহু সংখ্যক মুসলমান বালক স্কুল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের জন্য পাঠোপযোগী পুস্তক অতি বিরল থাকায় এই সমিতির মতে ঐরূপ পুস্তক সংগ্রহের জন্য সেণ্ট্রাল কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে গ্রন্থকারদিগকে পুরস্কার অথবা ছাপা খরচ দিয়া উৎসাহিত করা আবশ্যক। এবং যাহাতে পাঠোপযোগী পুস্তকগুলি টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক তালিকাভুক্ত এবং মুসলমান বালকদিগের জন্য গবর্ণমেণ্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় সমূহে প্রচলিত হয়, সেজন্য শিক্ষাবিভাগে উক্ত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।"[৩]

শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের দাবী ব্যর্থ হওয়ার কারণ হিসাবে শিক্ষাবিভাগের অমুসলিম কর্মচারীদের দায়ী করা হয়। ফলে মুসলমান শিক্ষক, স্কুল-ইন্সপেক্টর ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের দাবী উঠে। দাবী উঠে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও।[৪]

---

১ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ—আমাদের দরিদ্রতা, আল-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

২ নূর-অল-ইসলাম, শ্রাবণ ১৩০৭

৩ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৪৭-৪৮

৪ ১৯০০ সালে সরকার নিযুক্ত ৩৮২ জন শিক্ষকের মধ্যে মুসলমান শিক্ষক ছিলেন মাত্র ২৬ জন। *Muslim Community in Bengal*, p 65

১৯০৩ সালের জুলাই মাসে আলিগড় কলেজের ইংলণ্ডপ্রবাসী পুরাতন ছাত্রগণ লণ্ডনে এক সান্ধ্যসভায় মিলিত হন। সৈয়দ আমীর আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি নিজ ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করে 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। এ কথার উল্লেখ করে 'নবনূরে'র সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন, "বস্তুতঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একরূপ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমানের নিকট ইহা নানা কারণে আলমা-মেটার রূপে পরিচিত হইতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে শৈশবে যেসব পুস্তক মুসলমান বালকগণ সাধারণত অধ্যয়ন করিয়া থাকে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের আদর্শ লইয়া লিখিত, হিন্দু বালকের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী সত্য, কিন্তু মুসলমান বালকের হৃদয়ে তাহা বিষময় ফল উৎপন্ন করে। এইরূপ শিক্ষা মুসলমান সমাজের পক্ষে বড়ই অহিতকর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলমানের শিক্ষার উপযোগী করিতে হইলে সর্ব প্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তকের পরি-পরিবর্তন আবশ্যক। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির বিষয় যেসব পাঠ্যপুস্তকে থাকিবে কেবল তাহাই নির্বাচন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজ হইতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করা একান্ত কর্তব্য। যদি হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন একান্ত প্রার্থনীয় হয়, তবে দেশের মুখের দিকে চাহিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কিয়ৎ পরিমাণে বিসর্জনপূর্বক, সহৃদয় হিন্দুদেরও এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত। যদি এসব বিষয়ে একটা কুলকিনারা না হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই মুসলমানদিগকে হিন্দুদের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং সেইরূপ অবস্থায় 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন একরূপ অনিবার্য।"[১] এই আন্দোলন উগ্রপন্থী লেখকদের খুব সহজে আলোড়িত করে। রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে'র দাবী তোলেন, তাঁর যুক্তি ছিল এরূপ: "বিধর্মী হিন্দু প্লাবিত দেশে, বিধর্মী খৃস্টান গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর গতি কে রোধ করিবে? যতদিন না আমাদের মনের মতন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, ততদিন আমাদের এই সর্বনাশের পথ কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না।"[২] ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি যে 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রচার করেন, তাতে একটি 'রেসিডেন্স্যাল কলেজ' স্থাপনের প্রস্তাব ছিল, যেখানে মুসলমান ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পাবে।

১ নবনূর, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃঃ ২৭৯
২ ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

অনুষ্ঠানপত্রের ভাষায়—"বঙ্গীয় মুসলমানদিগের একটি মাত্রও ফার্স্টগ্রেড কলেজ নাই। তাহাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি কলেজ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।... আরবী, পারসী, উর্দু, ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাসমূহ সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা দেওয়া যায়, এবং তৎসহ ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার বিশেষ সুবিধা হয়, এইরূপ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রেসিডেন্স্যাল কলেজ স্থাপন করা শিক্ষা সমিতির পরোক্ষ প্রধান উদ্দেশ্য।"[১] সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে'র একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১৯) শিরোনামে একটি প্রচারপত্র (৪পৃষ্ঠা) বিলি করেছিলেন। প্রচারপত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। তাঁর মতে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ভারতের মুসলমানদের পুনর্জীবন ঘটবে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান একেবারে 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল এরূপ: "আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আমরা মানুষের মত মানুষ গড়াইতে চাহি, স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী, দেশগতপ্রাণ, ধার্মিক, চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদের অভিপ্রেত। বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার, সিভিলিয়ান, শিল্পী তৈয়ার করা আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে, এক কথায় বলিতে গেলে জগতে এসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আধুনিক ধরণের উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক গড়ানই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।"[২] তিনি ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে জমিও খরিদ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরবী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি।

নারীশিক্ষা

১৮৬৮ সালে 'বেঙ্গল সোস্যাল এসোসিয়েশনে'র এক সভায় আবদুল লতিফ মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শিরোনামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্যারীচাঁদ মিত্র এক প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন যে, বর্তমান হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার জন্য কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা। কলিকাতা মাদ্রাসার মৌলবী আবদুল হাকিম প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়টি অজ্ঞাত নয়, ইসলামের

১ পূর্বোক্ত, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

২ এসলামাবাদী—আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-এসলাম, আষাঢ় ১৩২৭

নীতিতে নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, স্বয়ং হজরত মহম্মদ তাঁর স্ত্রী-কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আরবের খলিফা ও ভারতের বাদশাহরা নিজ নিজ কন্যাদের শিক্ষা দিতেন। মুসলমানরা ভালভাবে জানে যে মা শিক্ষিত হলে শিশু সুশিক্ষা পায়। শিক্ষিতা স্ত্রী সাংসারিক কাজে স্বামীকে সাহায্য করতে পারেন। পুরুষের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষারও উন্নতি ঘটবে। তবে কথা এই যে, অন্য, সম্প্রদায়ের মত মুসলমানরা তাদের কন্যাদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে পারেন না। মেয়েদের পর্দানশীল করে রাখতে তাঁরা ধর্মের কারণে বাধ্য, অন্য জাতির মত তাঁরাও তাঁদের ধর্মবিধি পালন করতে বদ্ধপরিকর।[১] অন্য কথায় আবদুল হাকিম মেয়েদের গৃহশিক্ষার কথা বলেছেন, স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমর্থন করেননি। বনেদী পরিবারে এ রীতি প্রচলিত ছিল। পর্দার অন্তরালে থেকে মেয়েরা গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখত। বিদ্যালয়ে যাওয়া দূরের কথা, তারা বাড়ির বাহির মহলেও যেতে পারত না। সে শিক্ষা আবার আরবী-ফারসীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[২] ইংরাজী-বাংলা শিক্ষা নারীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেনি। পায়রাবন্দের 'সাবের' পরিবারে মেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উল্লেখ করেছেন।[৩] গৃহশিক্ষক তাজউদ্দীনের কাছে ফয়জন্নেসা চৌধুরানী শিক্ষা সম্পর্কে পাঠ নেন, তাঁর বাকী শিক্ষা ছিল স্বশিক্ষা। গৃহে 'ফয়জন পাঠাগার' স্থাপন করে সেখানেই বিদ্যাচর্চা ও কাব্যচর্চা করতেন। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে কর্মচারীদের আদেশ-নির্দেশ দিয়ে জমিদারী পরিচালনা করতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবপত্নী বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস মহল কলিকাতায় নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[৪] ঢাকার নবাবেরা নারীশিক্ষা তো দূরের কথা, গৃহের

১· *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, p. 76*

২ আরবী 'দীনিয়াত' পাঠের দ্বারা বর্ণ পরিচয় ও বানান পদ্ধতি শিক্ষা শেষ হলে 'সিপারা' (কোরানের ৩০-তম অধ্যায়) পড়ান ও মুখস্থ করান হয় এবং তারপরে পুরো কোরান সুর করে পড়ান হয়। অর্থ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, কোরান পাঠে পুণ্য আছে, এ প্রেরণাতেই এই শিক্ষা। এর সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার নামাজ পাঠ ও দোয়া-দরুদ পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়।

৩ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গৃহশিক্ষাই মূল সম্বল ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবেরের কাছে কিছু ইংরাজী ও বাংলা শিখেছিলেন। বাকী শিক্ষা বিলাত ফেরত স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মুক্ত মন ও চিত্তের বিকাশ হয়।

৪ *The Moslem Chronicle*, 23 January 1897, p. 29

কন্যারা পাছে সম্পত্তির ভাগ দাবী করেন, এজন্য প্রায় অশিক্ষিত, অকর্মণ্য, অথর্ব পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাঁদের ঘরেই বন্দিনী করে রাখতেন।[১] গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা বালিকাসতি বয়সে মক্তব-মসজিদে নামাজ ও কোরান পাঠের বিদ্যা দিয়ে নারীশিক্ষার পর্ব শেষ করতেন।

আবদুল লতিফ প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রশ্নের উত্তর দেননি, উত্তর দিয়েছিলেন আবদুল হাকিম। মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে উত্তর দেওয়ার মত তখন কিছু ছিল না।[২] আবদুল লতিফ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষার জন্য যা কিছু করেছেন তার সবই ছিল ছেলেদের শিক্ষার জন্য। প্যারীচাঁদ মিত্রের ঐ প্রশ্নের পরেও পঁচিশ বছর স্বসমাজে শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন, কিন্তু নারীশিক্ষার কথা তাঁর মনে রেখাপাত করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আবদুল লতিফের চার পুত্র উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমান বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যাকে কোন শিক্ষা দিয়েছিলেন কি না তা জানা যায় না।[৩] 'বনেদী ঘরের মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে পারে না' আবদুল হাকিমের এই অভিমতের সমর্থক ছিলেন আবদুল লতিফ। অর্থাৎ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল। তিনি এক্ষেত্রে যুগধর্ম ও যুগমানসিকতার প্রভাব একেবারেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য অনেক বিষয়ের মত নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ছিল। তিনি ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান কনফারেন্সে' সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালভাবে চলা উচিত। তাতেই সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, পুরুষ নারী একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না। বরং এক অংশকে শিক্ষিত ও অপর অংশকে নিরক্ষর করে রাখলে ফল মারাত্মকই হবে। শিক্ষিত অংশ আনন্দলাভের জন্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝুঁকে

১ বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, পৃঃ ৩৫

২ ১৮৮১-৮২ সালের বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী সংখ্যার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের মোট ১৮৪ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান মেয়ের সংখ্যা শূন্য। মধ্য ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ের মোট ৩৪০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান মেয়ের সংখ্যা মাত্র ৪ (১.১%)। বিনয় ঘোষ—বাংলা সামাজিক ইতিহাসের ধারা, পৃঃ ২১৯

৩ আবদুল লতিফের জামাতা সৈয়দ মুহম্মদ খান বাহাদুর ইনস্পেক্টর জেনেরাল অব রেজিস্ট্রেশন পদে কাজ করতেন। এটি অতি সম্মানিত চাকুরী ছিল। মালঞ্চ, আশ্বিন ১৩২৪

পড়বে।[১] আমীর আলী নারীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত দিলেও তিনি সে-শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য কোন চেষ্টা করেননি। বিদেশী মহিলার পাণিগ্রহণ করে তিনি জীবনের শেষ ২৪ বছর বিলাতেই অতিবাহিত করেন।

১৮৯৬ সালে কলিকাতার প্রভাবশালী ডাক্তার জহিরুদ্দীন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তি হতে পারেনি, কারণ সেখানে মুসলমান মেয়েদের পড়ার অধিকার ছিল না।[২] সম্ভবতঃ তখন কোন কোন সমাজকর্মীর চিত্ত উদ্বেল হয়। দেখা যায়, এর প্রায় দেড় মাস পরেই কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ব্যারিস্টার ই.এ. খোন্দকারের বাসগৃহে একটি সভায় (১০ মে ১৮৯৬) মিলিত হয়েছেন, উদ্দেশ্য মুসলমান মেয়েদের জন্য বড় আকারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ, মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, শেখ মোহাম্মদ জিলানী শামসুল উলমা, আবদুল সালাম খান বাহাদুর, আবদুল কাদির, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আবুল হাসান খান বাহাদুর, ডাক্তার জহিরুদ্দীন আহমদ, আবদুল হামিদ, মির্জা সুজাত আলী বেগ, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ। বখতিয়ার শাহকে সভাপতি এবং সুজাত আলী বেগ ও ওয়াহেদ হোসেনকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ৬ জন সদস্যসহ একটি 'সাময়িক কমিটি' গঠন করা হয়। সভায় মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস মহলকে পৃষ্ঠপোষকতা করার অনুরোধ জানান হয়।[৩]

১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারী ঐ বিদ্যালয়টি লেডি ম্যাকেঞ্জি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এর নামকরণ হয় 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। নবাব বেগম ফেরদৌস মহল গৃহনির্মাণের খরচ বহন করেন, নবাব আহসানুল্লাহ ১০০০৲ টাকা দান করেন। ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়।[৪] মুসলমানদের উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এটিই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। মোসলেম ক্রনিকলে লেখা হয়, বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাক্কালে সমাজের তরফ থেকে আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের অদম্য ইচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত এটি খোলা সম্ভব হয়।[৫]

১ Syed Ameer Ali M.A.,C.I.E.--*Muhammadan Education and Muhammadan Society* (Presidential Address delivered at the Muhammadan Educational Conference of 1899, Calcutta, 1900

২ *The Moslem Chronicle*, 28 March 1896, p. 142

৩ *Ibid.*, 16 May 1896, p. 122

৪ *Ibid.*, 23 January 1897

৫ *Ibid.*, 16 January 1897, p. 621

মহিলা স্কুল-ইনস্পেক্টর মিস ব্রুক ১৯০৫-০৬ সালে প্রদত্ত এক রিপোর্টে তৎকালীন মুসলমান নারীশিক্ষার একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, I have this year seen more of Mohammadan Schools and come more into touch with Mohammadan Zanana life. Education both in the Schools and in the Zanana is of the most meagre description. In the former this is undoubtedly due to the early age of which girls are withdrawn, not for marriage, but within the pardah ; in the latter it is owing to the almost utter lack of training and education in the teachers. From what I have observed I consider that in the case of Mohammadans the work has not yet been attempted on the right lines for success. The majority of the Mohammadan will no doubt for years to come view the movement for the education of women with dislike ; but that will be no bar, if certain conditions are allowed, to the progress of education both in the Zanana and in the Schools. Mohammadan Schools must be altogether pardah, and all the local male officials. entirely withdrawn from the Schools. A conveyance grant for the Schools is necessary if high class Mohammadan girls are to be secured. Women of good family must be obtained as teachers for the schools, but above all for the Zanana. These teachers must be able to speak good Urdu. Lastly one of the most important points is, I consider, the giving of certain concession with regard to the curriculum. The text books above all should be such as are acceptable to the Muhammadans. I am convinced that if we could obtain teachers capable of giving an acceptable course of instruction, a large number of Zanana would be at once available.[১]

ঠিক এই সময় কলিকাতায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রথমে লেখনির মাধ্যমে নারীমুক্তির বাণী প্রচার করেন। মিস ব্রুকের মতো তাঁরও বিশ্বাস ছিল যে মুসলমানের পর্দাপ্রথাই নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই পর্দার কারান্তরাল থেকে নারীদের বের করে আনতে হবে। তিনি শৈশব

১ *The Muslim Community in Bengal*, p. 399 (Appendix-D)

কালে পিতৃ-পরিবারে যে অভিজ্ঞতা এবং বিবাহিত জীবনে স্বামীর পরিবারের যে পরিচয় লাভ করেছেন, তা থেকে জ্ঞান আহরণ করে নারীর বন্দীদশার করুণ চিত্র তুলে ধরেন। অশিক্ষার কারণেই নারীরা আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে, যার ফল স্বরূপ তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীলা হয়, তাদের ব্যক্তি-স্বাধীনতাও অবলুণ্ঠিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করলে নারী অর্থ-স্বাধীনতা ও তৎসঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভ করে। 'মতিচূর' (১৯০৪), 'সুলতানের স্বপ্ন' (১৯০৫), 'অবরোধ বাসিনী' (১৯২৮) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি মুখ্যভাবে এটাই প্রচার করেছেন। ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল' স্থাপন করে তিনি তাঁর চিন্তাজগতের আদর্শকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। নিজে সমাজের সমালোচনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করে প্রকৃতপক্ষে বাঙালী মুসলমান নারীর আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন।

মফস্বলে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নবাব ফয়জন্নেসা চৌধুরানীর অবদানই সর্বাগ্রগণ্য। অভিজাত ঘরের মেয়েরা ধর্মের কারণে স্কুল-কলেজে যেতে পারে না বলে আবদুল হাকিম ও তাঁর নীরব সমর্থক আবদুল লতিফ যে-সময় নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তার মাত্র ৫ বছর পরে ফয়জন্নেসা চৌধুরানী সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় একটি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৩) স্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, হোস্টেলে মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাদের শিক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি পশ্চিম গাঁওয়ে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[১] ফয়জন্নেসার এ প্রচেষ্টার পথ নিরঙ্কুশ ছিল না : ফতুয়া-প্রপীড়িত দেশে তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি পিছপা হননি। তিনি নিজে জ্ঞানের যে স্বাদ, মুক্ত চিন্তার যে আলো পেয়েছেন, তা নারী সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। তবে তাঁর এই স্বতোৎসারিত চিন্তাশক্তিকে লেখনির মাধ্যমে কিংবা অন্য কোন ভাবে আন্দোলনের আকার দিতে পারেননি, ঐরূপ চেষ্টাও তাঁর ছিল না। বেগম রোকেয়া সেদিক থেকে অগ্রবর্তিনী ছিলেন।

১৮৮৩ সালে ঢাকা কলেজের পাঠরত কতিপয় ছাত্র 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপন করে প্রথম যৌথভাবে নারীশিক্ষার অভিযান চালান। তাঁরা যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা সম্পূর্ণ অভিনব। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয় ভেবে তাঁরা গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে বার্ষিক পরীক্ষা

১ নওয়াব ফয়জুন্নেসা, শতবার্ষিকী স্মরণিকা ১৯৭৩, কুমিল্লা, ১৯৭৫, পৃঃ ৩০-৩১

নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচী ও পাঠ্য-পুস্তক ঠিক করে দিতেন। তারই ভিত্তিতে ছাত্রীরা তৈরী হত, পরীক্ষক গিয়ে স্থানীয় অভিভাবকের সহায়তায় পরীক্ষা নিতেন। তাঁরা বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যারা পরীক্ষায় সফল হত, তাদের সম্মিলনের তরফ থেকে পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দেওয়া হত। কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শিক্ষাপদ্ধতি এটি। নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা ও সমাজের বিরূপ মনোভাবের দিকে চেয়ে তাঁরা এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সমাজের জাগরণ ও উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যে গভীর সম্পর্ক আছে, তা উপলব্ধি করে তাঁরা তাঁদের সামর্থ্যের মধ্যে এরূপটি করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তা নিঃসন্দেহে মহৎ ছিল। অবশ্য এ ব্যবস্থা নিতান্ত সাময়িক ও সীমিত ছিল।

সামগ্রিকভাবে শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ নিয়ে আন্দোলনের জোয়ার এনেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন সমিতির 'অনুষ্ঠানপত্রে' (১৯০৩) স্ত্রীশিক্ষাকে অঙ্গীভূত করে বলেছেন, "আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করাও শিক্ষা সমিতির এক প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রীশিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং যাহাতে মুসলমান বালিকাগণ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিতে পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"[১] রাজশাহীতে সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (চৈত্র ১৩১০) গৃহীত পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক: মির্জা সুজাত আলী বেগ প্রস্তাব করেন, দিনাজপুর নিবাসী মেসেরউদ্দীন আহমদ সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি এরূপ: "অধুনা মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই সমিতির মতে পরদার সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।"[২] এ প্রস্তাব অনুযায়ী নারীশিক্ষা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, তা জানা যায় না। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' (১৮৭৬) শ্রীহট্ট জেলার বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করে। ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অনুরূপ শ্রীহট্ট সম্মিলনী নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করত এবং সফল পরীক্ষার্থিনীদের সার্টিফিকেট, পদক ও পারিতোষিক প্রদান করত। ১৮৮৯ সালে সম্মিলনীর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খান বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুসলমান মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য

১ ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০, পৃ: ৪১৮

২ ঐ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃ: ৭৫

১০৲ টাকা মূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেন। সিরাজুল ইসলাম, আবদুল করিম বিএ. মৌলবী আহমদউল্লা সম্মিলনীর সভ্য ছিলেন।[১]

লেখকসমাজের কমবেশী সকলেই নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন, বিরোধী কেউ ছিলেন না। তবে তাঁরা যা বলেছেন, নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই বলেছেন, আন্দোলনের রূপ দেওয়ার জন্য কেউ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। 'মিহির ও সুধাকরে' 'মুসলমান স্ত্রী সমাজে ইংরাজী শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখা হয়: "আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, ১৯০১ সালের আদম সুমারী আমাদের নিকট ৫০০ মুসলমান স্ত্রীলোকের ইংরাজী শিক্ষার কথা প্রচার করিবে।... যদি অন্তঃপুরে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকা-গণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যেসব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি?...বিশেষ আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়।"[২] প্রবন্ধকার নারীশিক্ষায় আশাবাদ প্রকাশ করলেও তেমন উচ্চ-কণ্ঠ ছিলেন না। নারীর উচ্চ শিক্ষা মিহির ও সুধাকর সমর্থন করত না। সাধারণ মানের শিক্ষাই পত্রিকার কাম্য ছিল। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'নবনূরে' (ভাদ্র ১৩১১) 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নারীর উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বললে, তার প্রতিবাদ করে মিহির ও সুধাকরে লেখা হয়, "আজকাল মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ও অবরোধপ্রথা লইয়া ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে এবং সংবাদপত্রেও তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সর্বদাই বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা দান করা সমাজের কর্তব্য কিনা এই বিষয়ের মীমাংসায় এ পর্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না। স্ত্রীশিক্ষা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তাহার একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা চাই। অর্থাৎ কোরান শরীফ পড়া, কিছু উর্দু ও সামান্য রকম বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করা একান্ত দরকার। তাহা হইলে উর্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানি মসলা-মসায়েলের কেতাবগুলি পাঠ করিয়া ধর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় রীতিনীতি অবগত হইয়া শরাশরীয়ত অনুযায়ী সমস্ত ধর্মকার্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় ললনা সুহৃদ বা তত্তুল্য কোন স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া সাংসারিক কাজকর্মের সুশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান লালন-পালন রীতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারা যায়, এইহেতু আমাদের

১ সুন্দরীমোহন দাস—শ্রীহট্ট সম্মিলনীর জন্মকথা, শ্রীহট্ট, ১৯৩১

২ মিহির ও সুধাকর, ২৩ মাঘ ১৩০৯

সমাজের ভগ্নিগণকে ঐ পরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা করিতে অনুরোধ করি। তাহাদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।"[১] কোন কোন নব্য-শিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে নিঃশঙ্ক ও দ্বিধাহীন ছিলেন। কাজী ইমদাদুল হক বলেন, "স্ত্রী-সমাজে কুশিক্ষার বিষাক্ত প্রভাবে আমাদের সমাজ জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকগণই মানবকুলের মাতা, তাহারাই আবার সমাজের উন্নতি বা অবনতির প্রসূতি। স্ত্রীগণ অশিক্ষিত থাকিলে সমাজের অর্ধাঙ্গ বিকল হইয়া পড়ে, সুতরাং সে সমাজ দ্বারা কোন কর্মই সুসাধিত হয় না। স্ত্রীলোকগণের মতিগতি ও শিক্ষা সংস্কার যেরূপ থাকে, বালকগণের সরলচিত্তে তাহা দৃঢ়রূপে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। আমাদের বালকগণ তাহাদের মাতৃসমাজের কুসংস্কার, অবনতি ও অজ্ঞানতা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যতদিন আমাদের মাতৃসমাজ সুশিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত না হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই।"[২] উনিশ শতকের শেষ পাদে নারীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলমান সমাজের নিশ্চলতার অবস্থা থেকে সচলতার অবস্থায় উত্তরণ ঘটেছে। সমাজের গতি যে পরিবর্তনের দিকে ছিল, এতে তাই প্রমাণিত হয়।

---

১ মিহির ও সুধাকর, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃঃ ৪

২ কাজী ইমদাদুল হক—আমাদের শিক্ষা, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভাষা ও সাহিত্য

"বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ---একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক---পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।"[১] কথাগুলি বলেছেন অক্ষয়-কুমার সরকার মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ' (১৮৭৩) কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে। এটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। "মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় তখনও অতীত গৌরবের গোরস্থানে বসিয়া বাঙালী মুসলমানের ভাষা 'বাংলা কি উর্দু' সে বিচার লইয়া মশগুল। কিছুদিন পরেই সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া তাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাংলা নহে, 'দোভাষী বাংলা'ও নহে, একেবারে সরাসরিভাবেই 'উর্দু'।"[২] এ উক্তি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের। তাঁদের উভয়ের কণ্ঠধ্বনি এক: একজন সমসাময়িককালের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, অপরজন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কথা বলেছেন। বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এরূপ বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে চলছিল, কখন উপর তলার মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে, কখন উঠতি নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর মোহের কারণে, আবার কখন নেতৃবর্গের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের কারণে।

ষোল-সতের শতকের দিকে মোঘল শিবিরে সেনাবাহিনীর মৌখিক ভাষা হিসাবে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। শিবিরের প্রতিশব্দ উর্দু। উর্দু ভাষা সৈন্যের ছাউনি ছেড়ে দরবারের স্বীকৃতি লাভ করে সম্রাট শাহজাহানের আমলে (১৬২৬-৫৭)।[৩] উত্তর ভারতের আঞ্চলিক হিন্দুস্থানী ভাষার কাঠামোয় আরবী বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি এবং আরবী-ফারসী শব্দমালা আত্মসাৎ করে

---

১ বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০

২ মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পৃ: ৩০৩

৩ 'উর্দুয়ে মোয়াল্লা' বা রাজশিবিরের ভাষা নাম দিয়ে শাহজাহান প্রথম ঐ ভাষাকে রাজ-দরবারে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃ: ৭৭

উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়। প্রথমে কবি গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯), কবি হালি (১৮৩৭-১৯১৪) এবং পরে আলিগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) প্রমুখের চেষ্টায় উর্দু সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোঘল বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত নবাব-সুবেদার-মনসবদার-জায়গীরদার-আয়মাদার ও তাঁদের পরিবার পরিজন, সৈন্য ও ধর্মপ্রচারক দ্বারা উর্দু ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে নীত হয়। সে সময় থেকে এদেশে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উর্দু চর্চার সূত্রপাত হয়। মোঘল আমলে দিল্লীর সঙ্গে বাংলা যুক্ত থাকায় উত্তর ভারতের ভাগ্যান্বেষীর দল রাজধানী ও বাণিজ্যিক শহরগুলিতে এসে ভিড় করত। এদের সমন্বয়ে এদেশে ক্রমে উর্দুভাষী অবাঙালী মুসলমানের একটি নাগরিক শ্রেণী গড়ে উঠে। তাঁরা উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৭০২ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় থেকে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বেড়ে যায়, মুর্শিদাবাদই শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠে। দেশের যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও যশোলিপ্সু, তাঁরা শহরের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে উন্মুখ হন। জমিদারগণ নবাব-নাজিম ও আমীর-ওমরাহদের অনুকরণ করতেন। তাঁরা সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য আরবী-ফারসীকে বিদ্যা চর্চার ভাষা ও উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে, বাঙালী মুসলমান পরিবারগুলিতে উর্দুপ্রীতি ও আরবী-ফারসীর মোহ জাগতে থাকে।[১] রাজকার্যের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য হিন্দু রাজা-মহারাজা, জমিদারগণও ফারসী শিখতেন এবং নবাবী আদব-কায়দা ও সংস্কৃতির অনুসরণ করতেন। এমনকি, ইংরাজরাও প্রথমদিকে নবাবী চালচলন খানাপিনা ও আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করতেন। ভারত থেকে প্রত্যাগত ইংরাজদের ইংলণ্ডবাসীরা 'নাবুব' বলে অভিহিত করত।[২]

নবাবের আমলে মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী, কলিকাতা ব্রিটিশশাসিত সমগ্র ভারতের রাজধানী হয়। প্রথমে গবর্নর বা গবর্নর জেনেরাল

১ মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন যে, তাঁর পিতামহ মীর এবরাহিম হোসেন উর্দু ভাষা শিক্ষার জন্য পদমদী ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ রওনা হয়। মশাররফের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন বাংলা জানতেন না, বাংলা বিদ্যাকে বিদ্যা বলে মনে করতেন না। জমিজমার কাগজপত্র সই করতেন ফারসীতে। মীর পরিবারকে গ্রামের সম্ভ্রান্ত জোতদার হিসাবে ধরে আমরা ঐ যুগের বাংলার মুসলমান বনেদী শ্রেণীর মানুষের মনোভাবটি অনুধাবন করতে পারি।

২ গোপাল হালদার—বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৮৩ (৩য় সং)।

এবং পরে লেফটেন্যান্ট গবর্নরের অধীনে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম শাসিত হতে থাকে। ১৮৭৪ সালে আসাম একজন চীফ কমিশনারের অধীনে পৃথক হয়ে যায়। আধুনিক শহররূপে কলিকাতা গড়ে উঠলে জীবিকার নানা উপায় সেখানে বেড়ে যায়। জীবিকার সন্ধানে ব্রিটিশ ভারতের সব অঞ্চলের ভাগ্যান্বেষী মানুষেরা কলিকাতায় ভিড় করতে থাকে। শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বান লোকেরা শহরের সুবিধা ভোগ করার জন্য এগিয়ে আসেন। তাই কলিকাতায় বাংলার বাইরের প্রদেশগুলি থেকে উর্দু ভাষাভাষী লোকদের আগমন ধারা অব্যাহত ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় পাঞ্জাব থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত অঞ্চলসমূহ ছিল। কলিকাতা মাদ্রাসায় কাশ্মীর থেকে ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসত। ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের, ১৭৯৯ সালে মহীশূরের ও ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতন হয়। বিদ্রোহ এড়াবার জন্য কোম্পানী ঐ সব রাজ-পরিবারকে সরকারী খরচে কলিকাতায় নিজ তত্ত্বাবধানে রাখতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব গার্ডেনরীচে, মহীশূরের নবাব টালিগঞ্জে এবং অযোধ্যার নবাব মেটিয়াবুরুজে বহু সংখ্যক চাকর-বাকর, দাস-দাসী নিয়ে স্থায়িভাবে বসবাস শুরু করেন। সঙ্গে অনুরাগীরাও এসেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ শাসকদের দরবারে এঁদের মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁরা উর্দু ভাষার সমর্থক ছিলেন।

ঢাকার নতুন নবাব পরিবারের মৌখিক ভাষা উর্দু ছিল। পূর্ব পুরুষ কাশ্মীর থেকে ব্যবসায় করতে এসে প্রথমে শ্রীহট্টে ও পরে ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। খাজা আবদুল গণির চতুর্থ পুরুষ হাফিজুল্লাহ ১৮১২ সালে প্রথম ভূ-সম্পত্তি কিনে জমিদারীর গোড়াপত্তন করেন। আবদুল গণি সিপাহী বিদ্রোহে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করেন। তার প্রতিদানে তিনি বংশ পরম্পরায় 'নবাব' উপাধি পান। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনেদী অথবা নতুন, উভয় শ্রেণীর জমিদার বংশ-কৌলিন্য, সামাজিক প্রতিপত্তি ও আর্থিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য পুরাতন মোঘলাই সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতেন। তাঁরা উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। আরবী-ফারসী শিক্ষাকে তাঁরা সংস্কৃতিবানের শিক্ষা বলে মনে করতেন। যত দূর জানা যায়, রংপুর-পায়রাবন্দের 'সাবের' পরিবার, টাঙ্গাইল-করটীয়ার 'পন্নী' ও দেলদুয়ারের 'গজনবী' পরিবার, ময়মনসিংহ-ধনবাড়ির 'চৌধুরী' পরিবার, বগুড়ার 'চৌধুরী' পরিবার, সায়েস্তাবাদের 'চৌধুরী' পরিবর, মেদিনীপুরের 'সোহরাওয়ার্দী' পরিবার প্রভৃতি উর্দু-ফারসীর চর্চা করতেন। নব্যশিক্ষিত আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী,

আবদুর রহিম, আবদুল জব্বার খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা প্রমুখ উর্দু-ফারসী ও ইংরাজী ভাষার সেবা করেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষিত মৌলবী-মৌলানারাও উর্দু-ফারসীর সমর্থক ছিলেন। তাঁরা ঐ ভাষাতেই শিক্ষা লাভ করতেন। তাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ওয়াজ-নসিহত করতেন উর্দুতে। তাঁরা বাংলা ভাষাকে বাঙালী হিন্দুর ভাষা বলে মনে করতেন।

১৮৩৭ সালে ফারসীর স্থলে ইংরাজী রাজভাষা হলে মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ সময় থেকে সরকার ক্রমশঃ একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে থাকেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসী বিভাগ এবং হুগলী মাদ্রাসায় ইঙ্গ-আরবী বিভাগ খোলা হয়। ১৮৩৫-৩৮ সালে এ্যাডাম তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে মুসলমানদের জন্য শহরে উর্দু ও গ্রামে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। ১৮৫৪ সালে উডের 'ডেসপ্যাচে' প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হলে গ্রাম-গ্রামান্তরে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যায়। পাটের চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য গ্রামের কৃষকের হাতে টাকা আসে। ঠিক এ সময় আবদুল লতিফ, আমীর আলী ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী লাভ করে অনেকে বেরিয়ে আসেন। সমাজের মধ্যে আধুনিক চেতনার বীজ তাঁরাই ছড়িয়ে দেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃত্তি, নর্মাল, এন্ট্রান্স, বিএ-বিএল পাশ যুবকেরা বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বাংলা বাঙালীর মাতৃভাষা, হাজার বছরের পরীক্ষায় এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ ভাষার চর্চার দ্বারাই সমাজের, দেশের উন্নতি সম্ভব। উর্দু কোন কালে বাঙালীর মাতৃভাষা ছিল না। একে বাঙালীর মাতৃভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসও বৃথা। নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ক্রমে এ উপলব্ধি জাগ্রত হয়। তখন উর্দুপন্থীদের সাথে তাঁদের বাংলা-উর্দু প্রসঙ্গে বিতর্ক উপস্থিত হয়।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রথম আন্দোলন করেন আবদুল লতিফ। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত পূর্বাপর কর্মসূচী ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, তিনি মূলতঃ আরবী-ফরসী-উর্দু ভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সমর্থন করেছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল চাকুরী-বাকুরীর ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। বাঙালী মুসলমানের জীবনে ও চিন্তায় বিপ্লব আসুক, এমন কথা তিনি কোথাও বলেননি। অর্থাৎ মনোভাবের দিক থেকে তিনি প্রায় পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি বরাবর মাদ্রাসা শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। ১৮৮০ সালে মুসলমান শিক্ষা বিষয়ক এক পুস্তিকায়

সৈয়দ আমীর হোসেন মাদ্রাসা তুলে দিয়ে আধুনিক কলেজ করার পরামর্শ দিলে আবদুল লতিফ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির সভা করে এর প্রতিবাদ করেছিলেন।[১] লতিফের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুর রহমান পিতার আদর্শ রক্ষা করে চলেন এবং মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির মাধ্যমে মাদ্রাসা-পদ্ধতির শিক্ষার সপক্ষে ওকালতি করেন। হুগলী মাদ্রাসার রিপোর্টে আরবী-ফারসী শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে আবদুল লতিফ বলেছিলেন, "Unless a Mahomedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mahomedan society ; i.e., he will not be regarded or respected as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mahomedan Community. Consequently a Mahomedan who has received an English education, and has omitted the study of the Persian and Arabic, is little able to impart the benefit of that education to the members of his community. But, if he knows Persian and Arabic along with English, he acquires influence in society and is of course sure to use his influence in the interests of the Government. The Government should, therefore, in my humble opinion, devise such means whereby the Mahomedans may be taught at once English and Persian and Arabic "[২] আবদুল লতিফের এই উক্তির মধ্যে সে-কালের শরীফ মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিজেও সে মনোভাবের ধারক ছিলেন। 'হিতকরী' পত্রিকায় (১০ পৌষ ১২৯৭) 'আমাদের শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মীর মশাররফ হোসেন বলেছেন, "সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন।...সমাজে ছাত্রবৃত্তির আদর নাই, এন্ট্রান্সেরও সেই দশা। জাতীয় বিদ্যায় আলাপ জাতীয় রীতিনীতি পদ্ধতি রক্ষা করিতে না পারিলে, না জানিলে, এক প্রকার বিপদ, অপ্রস্তুতের একশেষ। কাজেই উর্দু, ফারসী শিক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন। শুধু ইংরাজী শিখিলে আমাদের কোন লাভ নাই। ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আদৃত, সমাজ প্রচলিত উর্দু ফারসী শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয়; উর্দু ফারসী শিক্ষা অবহেলা করিয়া, শুধু

১ Syed Ameer Hossein—*A Pamphlet on Mohammadan Education in Bengal,* Bose Press, Calcutta, 1880.

২ *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents,* p. 23

ইংরাজী, কি কেবলই বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে সমাজে সুখ পাইবার উপায় নাই। বাধ্য হইয়া প্রথম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ফরসী শিক্ষা করা সর্বতোভাবে আবশ্যক।"[১] মীরের এই উক্তিতে আবদুল লতিফের বক্তব্যের প্রতিফলন আছে।

পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ বাড়াবার জন্য আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেছিলেন। সোইটির মাসিক, বার্ষিক, বিশেষ, জরুরী সব রকম সভায় আলোচনায়, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ পাঠে ইংরাজী, উর্দু, আরবী ও ফারসী ব্যবহার হত, সেখানে বাংলার স্থান একেবারেই ছিল না। সোসাইটির প্রতিষ্ঠার দিন প্রথম সভায় (২ এপ্রিল ১৮৬৩) আবদুল লতিফ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ফারসীতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশনে এফ. জি. তীলে সাহেব 'বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক তারবার্তা' সম্পর্কে ইংরাজীতে প্রবন্ধ পাঠ করলে আবদুল লতিফ উপস্থিত শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য তা উর্দুতে আক্ষরিক অনুবাদ করে শোনান। আবদুল লতিফের ব্যক্তিগত সব রচনা হয় ইংরাজীতে অথবা ফারসীতে লেখা হয়। ১৮৬৩ সালে আলিপুরে সরকারী উদ্যোগে প্রথম কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। প্রদর্শনী কমিটির সদস্য হিসাবে আবদুল লতিফ মেলার উদ্দেশ্যে ও উপযোগিতার বিষয় তুলে ধরে উর্দুতে প্রচারপুস্তিকা লেখেন, স্যার সিসিল বীডন সেটি অনুমোদন করেন এবং বাংলায় তর্জমা করার পরামর্শ দেন। আবদুল লতিফ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, I translated it into Bengali, and circulated several thousands of copies in the Mofussil with the best results."[২] সম্ভবতঃ এটিই আবদুল লতিফের বাংলা চর্চার একমাত্র নিদর্শন। আবদুল লতিফ ভাল বাংলা জানতেন বলে 'রইস ও রায়ত' (১৫ জুলাই ১৮৯৩) পত্রিকায় লেখা হয়। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) আবদুল লতিফকে উৎসর্গ করেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, আবদুল লতিফ 'বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন' করতেন। সুতরাং আবদুল লতিফ বাংলা ভাষা জানতেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৮৮২ সালে হান্টারের শিক্ষা কমিশনের কাছে পরামর্শপত্রে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানের শিক্ষার মাধ্যম উর্দু এবং গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। আবদুল লতিফের ভাষায়,

১ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩২৬ (২য় সং)

২ *Nawab Bahadur Abdul Latif ; His Writings Related Documents*, p. 174

"Briefly sumerised, my opinion as regards Bengal is that Primary instruction for the lower classes of the People, who for the most part are ethnically allied to the Hindoos, should be in the Bengali Language—purified, however, from the superstructure of Sanskritism of learned Hindoos and supplemented by the numerous words of Arabic aod Persian Origin which are current in everyday speech : for this the Bengali of the Low-Courts furnishes a good example.

For the middle and the upper classes of Mahomedans, the Urdoo should be recognised as the vernacular. ...The middle and upper classes of Mahomedans are descended from the original conquerors of Bengal, or the pious, the learned and the brave men, who were attracted from Arabia, Persia and Central Asia to the Service of the Mahomedan Rulers of Bengal ; or from the Principal Officers of Government, who...were appointed and sent from the Imperial Court, many of whom permanently settled in these parts. All these, for the most part, naturally retain the Urdoo as their vernacular."[১]

এটি ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে কমিশনের চতুর্থ জবাব। তিনি বাংলার মুসলমানের ভাষার সঙ্গে জাতিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বাঙালী মুসলমানের বাংলা, বাঙালী হিন্দুর বাংলা অভিন্ন নয়, মুসলমানের বাংলা সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত ও আরবী-ফারসী শব্দযুক্ত হবে। শিক্ষা, ভাষা, বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে আবদুল লতিফের এই ধারণাকে সেকালের প্রভাবশালী সমাজপতিদের ধারণা বলে ধরা যায়। এটা যে সেকালের সাংস্কৃতিক সংকট, তাতে সন্দেহ নেই। এই সংকট বাংলার মানুষের জন্য কি ফল নিয়ে এসেছিল সে-সম্পর্কে মন্তব্য করে বদরুদ্দীন উমর বলেন, "বাংলাদেশের মুসলমানেরা আরও বেশ কিছুকাল মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে শুধু আরবী, ফারসী, উর্দু জবান রপ্ত করার চেষ্টা চালালেন। তার ফলে ইংরেজ শাসনের নতুন কাঠামো এবং আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে জীবিকার উপযুক্ত সংস্থানের অভাবে এ জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানেরা মাদ্রাসা-মক্তবে মৌলবীগিরি, মসজিদে ইমামতী, পীর-মুর্শিদী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হলেন এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিকে দারুণভাবে ব্যাহত করলেন।"[২]

১ *Ibid.*, p. 225

২ বদরুদ্দীন উমর—পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃঃ ১১

আবদুল লতিফের পরেই সৈয়দ আমীর আলীর স্থান। তাঁর পিতা সাদত আলী ছিলেন অযোধ্যার অধিবাসী, তিনি অযোধ্যা থেকে উড়িষ্যা হয়ে চুঁচুড়ায় বসতি স্থাপন করেন। আমীর আলীর জন্ম উড়িষ্যার কটকে। তিনি এক পুরুষে উর্দু জবান ছেড়ে বাংলা ধরতে পারেন না। রংপুরের শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদকৃত 'আরবজাতির ইতিহাস' (১খণ্ড, ১৩১৭) পড়ে আমীর আলী লণ্ডন থেকে এক পত্রে (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১) তাঁকে লিখেছিলেন, "বাংলা ভাষায় আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে বিচার করে বলা যায়, আমার শর্ট হিষ্টিরি অব দি সারাসীন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ অপূর্ব হয়েছে।"[১] আমীর আলী বাংলা শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষার চর্চা করেননি। তাঁর দৃষ্টি ছিল সমস্ত ভারতের মুসলমানের কল্যাণের উপর। তাঁর সমস্ত রচনা ইংরাজীতে লেখা যেগুলিতে ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্যের কথা আছে। তিনি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন গঠন করে নব্যশিক্ষিতদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলেছিলেন। এসোসিয়েশনের কাজকর্ম ইংরাজী ও উর্দুতে সম্পন্ন হত। সেখানে বাংলার স্থান ছিল না।

হুগলীর দেলওয়ার হোসেন আহমদ, কুমিল্লার সিরাজুল ইসলাম ও সৈয়দ শামসুল হোদা, শ্রীহট্টের আবদুল করিম, মেদিনীপুরের আবদুল রহিম ও ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, বর্ধমানের আবদুল জব্বার খান বাহাদুর সরকারী অফিস, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সভা-সমিতিতে প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা উর্দুর সমর্থক ছিলেন। আবদুল করিম বিএ পাশ করে (১৮৮৫) 'দারুল সলতানত' নামে উর্দু পত্রিকার সম্পাদক হন। 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' গ্রন্থখানি ইংরাজী, বাংলা, উর্দু তিন ভাষাতেই রচনা করেন।[২] মোহাম্মদ ইউসুফ উত্তর প্রদেশ ও সৈয়দ আমীর হোসেন বিহারের অধিবাসী ছিলেন, তাঁরা কর্মোপলক্ষে দীর্ঘদিন ধরে কলিকাতায় ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁরাও সমাজে নেতৃত্ব দেন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুর রহিমের উদ্যোগে কলিকাতা মুসলমান শিক্ষাসভার একটি অধিবেশনে কড়েয়া অঞ্চলে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে শিক্ষা দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড ডেনিসন রস (১৯০৩-১১) একটি প্রস্তাবে বলেন, "∠মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেননা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং

১ শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—আরবজাতির ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ব্রাহ্মণমিশন প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯

২ Muhammad Ali Azam—*Life of Moulvi Abdul Karim,* p. 37

বাঙ্গলা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলে।"[১] উক্ত সভায় সৈয়দ আমীর আলী, স্যার আবদুর রহিম, সৈয়দ শামসুল হোদা, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মি. রস-এর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উপস্থিত বাঙালী সভ্যগণ যে মি. রসের সহিত অভিন্ন মত পোষণ করতেন এতে তাই প্রমাণিত হয়। মিহিরের সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম বলেছেন, "বাঙ্গালাকে একটা ভাষা বলিতে যাও, তাহাতেই অনেকের আপত্তি আছে। বিশেষ ওপাড়ার কয়েকজন নবাব বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, ডাক্তার, কবিরাজ ও অনেক বড় বড় x y z এঁরা পর্যন্ত ইহাকে এখনও ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাহার সাহিত্য এবং তাহার আবার চর্চা, এ সম্পূর্ণ বাতুলতা।"[২] মোজাফফর আহমদ একটি প্রবন্ধে উর্দুপন্থীদের সম্পর্কে বলেছেন, "কতিপয় অবাঙালী মোসলমান কার্যব্যাপদেশে কলিকাতা শহরে বাস করেন। অনেকে স্থায়ী অধিবাসীও হইয়া গিয়াছেন। ইহারা মাতৃভাষা উর্দুর উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু উর্দুভাষীরা যে বাংলাদেশের মোসলমানদিগের মধ্যে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চালাইবার চেষ্টা করেন এইটা তাহাদের বড় অন্যায়। এইরূপ চেষ্টা যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে আবার একদল 'ফেউ' আছেন। এই 'ফেউরা' প্রায় খাঁটি বাঙালী।"[৩] মোল্লারাও উর্দু সমর্থন করতেন। মোজাফফর আহমদ বলেন, "আর একদল লোক আছে, যাহারা বক্রাক্ষর দেখিলেই আত্মহারা হইয়া যায়। অর্থাৎ আরবী অক্ষরে যাহাই লিখিত হউক না কেন তাহাদের নিকট তাহাই সত্য, তাহাই পবিত্র উর্দু যখন আরবী অক্ষরে লিখিত হয় তখন ইহার সব কথাই ধর্মের কথা।... আবার কেউ কেউ মনে করেন উর্দু সাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় পেঁৗছিয়াছে, তাই বাঙালী মোসলমান মাত্রেরই উর্দু শেখা উচিত। তাহা না হইলে তাঁহারা ইসলামী সভ্যতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"[৪] কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসাগুলি ঐ সব মোল্লা তৈরী করত। ইংরাজী ও বাংলা বিদ্যা না থাকায় তাঁরা সরকারী চাকুরী পেতেন না। তাঁরা গ্রামে ফিরে গিয়ে মক্তব-মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা দান, সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালন এবং জলসা-মিলাদ মহফিলে ওয়াজ-নসিহত করতেন। তাঁরা শহরের রইসদের অনুকরণে উর্দুতে কথাবার্তা বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন। 'নূর-অল-ইমান' উর্দুপন্থী বাঙালী

১ মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯

২ মিহির, জানুয়ারী ১৯৮২

৩ মোজাফফর আহমদ—উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মোসলমান, আল এসলাম, শ্রাবণ ১৩২৪

৪ ঐ, আল এসলাম, শ্রাবণ ১৩২৪

অনুগতদের 'খেদমৎগার' নামে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেন, "শরীফ সন্তানেরা এবং তাঁহাদের খেদমৎগারগণ উর্দু বলেন, বাঙ্গালা ভাষা ঘৃণা করেন, কিন্তু সেই উর্দু জবানে মনের ভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পশ্চিমা লোকের লিখিত চর্বিত শব্দগুলিও অনেকে যথাস্থানে শুদ্ধ আকারে যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করিতেও অপারগ। অথচ বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুবিধা হইলেও, ঘৃণা করিয়া তাহা হইতে বিরত হন।"[১]

শেখ আবদোস সোবহান বাংলার মুসলমান জমিদারদের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ও বিরূপতার সমালোচনা করে বলেন, "আপনারা (জমিদারগণ) কেহ কেহ, কখনও কখনও বলিয়া থাকেন 'আমরা আসল বিলাতি আশরাফ...দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের বংশ হিন্দুস্থানে আসিয়াছে, আমরা কি বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে পারি! বাঙ্গালা কি আলীমান্দান মোগলমানের জন্য?...বাঙ্গালার উপরই আপনাদের সমস্ত বিষয় কার্য, পত্র, পত্রোত্তর নির্ভর করিতেছে---কেবল তাহাতে আপনার নামের পারসির গুটী চারি 'তোগরা' অক্ষর দ্বারা স্বীয় শিরের কুঠারাঘাত করিতেছেন—তাতেও আবার বাঙ্গালার প্রতি ঘৃণা?"[২]

কোন কোন বাংলার লেখকও উর্দুর প্রতি নমনীয় মনোভব পোষণ করতেন। তাঁরা উর্দুকে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বা সর্বভারতীয় মুসলমানের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা বাঙালী মুসলমানের জন্য উর্দু চর্চাকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে' (১৩২৫) সভাপতির অভিভাষণে মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন, "...উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোসলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।"[৩] সবচেয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁর 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা' (১৯২৭) গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, "উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয় ভাবহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তা বিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।...বঙ্গের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মোসলমান সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক বাঙ্গালা লইয়া একেবারে মাটি। ভারতের অন্যান্য

১ নূর-অল-ইমান, ভাদ্র ১৩০৭

২ সেখ আবদোল সোবহান —হিন্দু মোসলমান, ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃঃ ৯৭

৩ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫

প্রদেশের মোসলমানগণ হইতে তাহারা এই ভাষা বিভ্রাটে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"[১] এই উক্তিতে মি. ব্লসের অভিমতের প্রতিধ্বনি রয়েছে।

অক্ষয়কুমার সরকার ও মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্যের প্রকৃত পটভূমি ছিল এটাই। ভাষা সম্পর্কে এরূপ প্রতিকূল মনোভাবের সম্মুখীন হয়ে সে যুগের বাংলার লেখকগণকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে লেখনি ধারণ করতে হয়েছিল। বাংলা সাময়িকপত্রের মাধ্যমে এ আন্দোলনটি জোরদার হয়। উনিশ শতকের নয় দশকের গোড়া থেকেই মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। পত্রিকাগুলি অনুষ্ঠানপত্রে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং প্রবন্ধাবলীতে বাংলা-উর্দুর দ্বন্দ্বের কথা তুলে মাতৃভাষা বাংলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। 'হিতকরী' (১০ পৌষ ১২৯৭) পত্রিকায় 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে মীর মশাররফ হোসেন বলেন, "বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা 'বাঙ্গলা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। বিশেষ সাংসারিক কাজ কর্মে মাতৃভাষারই সম্পূর্ণ অধিকার। মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি নাই। ইস্তক ঘরকন্যার কার্য, নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন।"[২] মাতৃভাষায় আস্থাহীন ব্যক্তি 'মানুষ' নয়— এরূপ আক্রমণ তিনিই প্রথম করেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বাংলা ভাষা যে বাঙালী মাত্রেরই মাতৃভাষা, সে বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। দৈনন্দিন কাজকর্মে কথাবার্তায় যে মাতৃভাষা মাতৃস্তন্যের মত পান করা হয়, সে ভাষা ত্যাগ করে তার স্থলে অন্য যে কোন ভাষার চিন্তা করাকে তিনি 'মূর্খের কল্পনা' বলে মনে করেছেন; এমন কি তিনি বাংলা ভাষার কোনরূপ বিকারও পছন্দ করেননি; সম্ভবতঃ তিনিই প্রথম বঙ্গদর্শনের ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, "কোন অধঃপতিত সমাজের বা জাতির যদি কখনও কিছু হওয়ার আশা থাকে, তবে তাহা জাতীয় ভাষার সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। বঙ্গভাষা ত্যাগ করিতে গেলে একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকেও ত ত্যাগ করা হইবে।...যাহাই বলুন না কেন? হিন্দু মুসলমান একই পাদপের দুইটি প্রধান শাখা বা একই দেহের দুইটি অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।"[৩]

১ মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা ১৩৩৫ (৪ সং) 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

২ আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, পৃঃ ৩২৭

৩ আবদুল করিম—যোগ কালন্দর, ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩ পৃঃ ২১-২২

সমাজের এই দেহে যারা ফাটল ধরাতে চায়, আবদুল করিম তাদের 'স্বদেশদ্রোহী' ও 'স্বজাতিদ্রোহী' বলে অভিহিত করেছেন। জাতীয় ভাষার নামে মাতৃভাষাকে যারা বিকৃত করতে চায়, তিনি তাদের 'বকধার্মিক স্বজাতিহিতৈষী' বলে চিহ্নিত করেছেন। "বঙ্গভাষা দেবভাষা সংস্কৃতের দুহিতা হইলেও মুসলমানধাত্রীর ক্রোড়াশ্রয়েই ইহা প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।" সুতরাং বাংলা ভাষা হিন্দু মুসলমানের যৌথ সম্পদ, একে পরিত্যাগ করার অর্থ 'স্বাধিকারচ্যুত' হওয়া।[১]

'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়চিত্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা, এ ভাষা ব্যতীত 'আমাদের ন্যায় গরীব দুঃখীদের গত্যন্তর ও মতান্তর' নেই। লেখকের মতে উচ্চ পদ বিশিষ্ট অনেক মুসলমান বাংলাকে মাতৃভাষা রূপে স্বীকার করতে চান না, তাঁরা উল্টো উর্দুকে বাঙালীর মাতৃভাষার আসন দিতে চান। তাঁদের মতে, বাংলা 'ভীরুর ভাষা', সমগ্র ভারতে মুসলমানদের একই ভাষা হবে এবং সেটি হবে উর্দু।[২] সৈয়দ এমদাদ আলী এমতের বিরোধিতা করে বলেন, "যে ভাষা ধীরে ধীরে সামান্য মুসলমান কৃষকদিগকেও আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিয়াছে, সেই ভাষাকে স্থানচ্যুত করিয়া অন্য ভাষার প্রচলন করা কি সম্ভবপর?...বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রতি যে একটা পরিবর্ধমান টান অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার বেগ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। এতদিনে মোহনিদ্রা পাশ ছিন্ন করিয়া আজ যদি সমাজ শিক্ষার জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল, তবে তাহার সেই গতিরোধ করিবার জন্য আমাদের সমাজে তথাকথিত নেতাগণের এই বৃথা সঙ্কল্প কেন?"[৩] সৈয়দ এমদাদ আলীর দৃষ্টি ছিল বাস্তব—ভাষার সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষার সঙ্গে উন্নতি জড়িত, ভাষাসমস্যার কথা তুলে সমাজে শিক্ষা ও উন্নতি ব্যাহত করা অবিবেচকের কাজ হবে। 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ইসমাইল হোসেন সিরাজী মাতৃভাষার সেবা ও জাতীয় উন্নতি সাধনকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর মতে, "মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা—ইহা পবিত্র ও পূজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধর্ম হয়।"[৪] সমাজে ইংরেজীর

১ আবদুল করিম – বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃঃ ৫৭
২ নবনূর, পৌষ ১৩১০, পৃঃ ৩৪৮
৩ ঐ, পৃঃ ৩৪৪
৪ ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯০২

মত বাংলা শিক্ষাও অধর্ম ছিল।[১] এখন বাংলা শিক্ষা না করলে অধর্ম হবে—সমাজে এ দাবী উঠেছে। সমাজে পরিবর্তনটি এভাবে সূচীত হয়েছে। মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দান এবং সে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালী মুসলমানের জাতীয়তাবোধেব প্রথম উন্মেষ হয়।

বাংলা-উর্দু ভাষা কেন্দ্রিক বিতর্কের সঙ্গে আরবী-ফারসী-সংস্কৃত শব্দ কেন্দ্রিক বিতর্ক শুরু হয়। এ বিতর্ক হিন্দু সমাজেও সম্প্রসাবিত হয়। হিন্দু লেখকগণের সংস্কৃত শব্দ বহুল বাংলা নয়, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে আরবী-ফারসী শব্দ মিশ্রিত যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, সে ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হবে। বলতে গেলে, আবদুল লতিফ বিতর্কের সূচনা করেন হান্টার কমিশনকে প্রদত্ত উত্তর পত্রে। তিনি আরবী-ফারসী শব্দের মিশ্রণ দ্বারা বাংলা ভাষায় একটা 'মুসলমানী চরিত্র' দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এর ফলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষে ধর্মশিক্ষা সহজ হবে এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির সহিত সংযোগ স্থাপিত হবে। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বাংলা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সংস্কৃতঘেঁষা বাংলার বিরোধিতা করেছেন।[২] বাংলার মুসলমান লেখকেরা এই ভাবদ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা কেউ কেউ একটা স্বতন্ত্র 'জাতীয় ভাষা' সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। যেহেতু ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি মুসলমানদের সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়, সেহেতু আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার কতক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ধর্মসম্পৃক্ত কতকগুলি শব্দের পরিভাষাও সম্পূর্ণ অচল। 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১) নামে একখানি সমাজ উন্নয়নমূলক 'কওমী পুস্তিকা' প্রণয়ন করেন মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। গ্রন্থে আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার আছে। ইউসুফ আলী বলেছেন, "বহু শতাব্দী হইতে যে সকল আরবী, ফারসী, হিন্দী ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ নানা কারণে বাংলার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত ভাষাব সহিত রক্ত মাংসের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-সরোবরে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তজ্জন্য সেই দুগ্ধ-সরোবর সমালোচনা কালে কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, মুসলমানের বাবুর্চিখানায় পক্ক দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এই

১ বাংলা ইংরাজী পড়া কহয়ে 'হারাম'
বাঙ্গালার মোল্লাদের চরণে সালাম।—ইসমাইল হোসেন শিরাজী
ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১, পৃঃ ৩০৮

২ *Vernacular Education in Bengal*, p. 10

জন্য আমরা এ দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।"[১] মির্জা ইউসুফ আলী এটাকে সহজভাবে নিতে পারেন নি। তাঁর সম্পাদনায় নুর-অল-ইমান পত্রিকা প্রকাশিত হলে তার মাধ্যমে তিনি কৈফিয়ৎ স্বরূপ কতকগুলি বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায়:[২]

"আমরা মোসলমান। আমরা নিজে, আমাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ, আমাদের দাস-দাসী, গোলাম-বান্দী, পাড়া-পড়শী সকলে বাঙলাভাষার যে শব্দ আরামের সহিত মনের ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ শব্দ ইহার মধ্যে বেশ থাকিবে।

বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, প্রাতঃস্মরণীয়, মহাত্মা বিদ্যাসাগর যখন স্বহস্তে বঙ্গভাষার অঙ্গে বেশভূষা পরাইয়া দিতেছিলেন, তিনি 'বাদশার' 'দরবারে' 'মেজর' 'বন্দোবস্ত' না করিয়া 'রাজাধিরাজ চক্রবর্তী রাজসভায়' 'উচ্চ কাষ্টমঞ্চের আয়োজন' দ্বারা বঙ্গভাষার কোমল বাল্যপদে কঠিন লৌহ শৃঙ্খল পরাইতে নারাজ ছিলেন।

করুণাময় অনুগ্রহ করিলে, নুর-অল-ইমান বঙ্গভাষার কমনীয় জোলফে বসরার গোলাপ ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিতে পারে।"

পত্রিকায় আরও লেখা হয়, "বাঙ্গালা পাঠশালায় হিন্দু শিক্ষকের নিকট হিন্দুর প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা তোতা পাখীর মত সংস্কৃতমূলক সাধু বাঙ্গালা শিখিয়াছেন। বলিবার সময়ে ও লিখিবার কালে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের 'এস্তেমালী' সাধু ভাষা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এসলাম ধর্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওজু, গোসল, ফরজ ওয়াজেব, হালাল, হারাম, আল্লাহ, রসুল ইত্যাদি শব্দগুলিও যাবনিক বলিয়া ঘৃণা করেন এবং তৎসমুদয়ের সংস্কৃতমূলক সাধু বাংলায় তর্জমা করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।...সতেজ স্বাভাবিক বাঙ্গালা ভাষা স্বাধীনতা পাইলে, তৎসঙ্গে পল্লীবাসী মোসলমান সমাজের উন্নতির যুগান্তর উপস্থিত হইবে।...বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।"[৩] 'মাতৃভাষা ও বঙ্গ মুসলমান' প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী যা বলেছেন, তাতে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভাষার আভাসটি স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি লিখেছেন, "এই বঙ্গভাষা রূপ নূতন দুর্গের মধ্যে আমরা নিরাপদে আমাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করিয়া

১ ভাষা সম্বন্ধে নুর-অল-ইমানের কৈফিয়ৎ, নুর অল-ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭

২ সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত, পৃঃ ৩২৮-২৯

৩ নুর-অল-ইমান, ভাদ্র ১৩০৭

লইতে পারি এবং তাহা করাই আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। নতুবা হিন্দু-ভাব ও হিন্দু আদর্শপূর্ণ সাহিত্য পাঠে মুসলমান সমাজ ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিশেষত্ব বর্জিত হইয়া এক অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিবে।...ইহাতে মুসলমান সমাজ প্রচলিত বঙ্গভাষা হিন্দুর ভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষার বা বঙ্গদেশের কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং বল সঞ্চয় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ সমাজ বিশেষের ছাপ বক্ষে ধারণ করিলেও বঙ্গভাষা বঙ্গভাষাই রহিয়া যাইবে।"[১] ইসলাম-প্রচারকের সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের বক্তব্যেও অনুরূপ ধ্বনি শোনা যায়। তিনি লিখেছেন, "যেদিন আমরা এই মাতৃভাষা বাঙ্গালায়, জাতী ভাষা আরবী, ফারসী, উর্দু প্রভৃতি হইতে জাতীয় বহুল শব্দ, জাতীয় ভাব, জাতীয় তেজ, জাতীয় ধর্মপ্রাণতা আনয়ন করিতে পারিব, সেইদিন এই মাতৃভাষা দ্বারা আমরা যথোচিত ফল লাভ করিতে সক্ষম হইব।... আরবী, ফারসী, উর্দু ভাষার আলোচনা এদেশ হইতে উঠিয়া গেলে, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িব, তাহা হইলে কালে বৌদ্ধদিগের ন্যায় আমাদিগের অস্তিত্ব হিন্দুদিগের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।"[২] উক্তিগুলিতে কেবল হীনমন্যতাবোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ফুটে উঠেনি, এর মধ্যে পশ্চাৎবর্তী মধ্যবিত্তের স্বার্থবুদ্ধিও ক্রিয়া করেছে। 'বঙ্গভাষা রূপ নূতন দুর্গে'র অবলম্বন চাওয়ার অর্থ হল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপারগতা। হিন্দুত্ব ভীতিকে ব্যবহার করা হয়েছে আবরণ হিসাবে।

ভাষা ও শব্দমালার মত সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়েও পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হয়। 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকায় থিয়েটারের 'বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা' প্রকাশিত হয়। 'মিহির ও সুধাকরের রুচি-বিকৃতি' শিরোনামে এননে মাওজ ইসলাম-প্রচারকে কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ লিখেন। লেখকের ধারণা, "নাট্যাভিনয় মানেই পাপানুষ্ঠানের প্রশস্ত দ্বার স্বরূপ। এই সংক্রামক বিষে এদেশের যুবদিগের যে মনে অনিষ্ট সাধন করিতেছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এগুলি সাধারণতঃ ব্যভিচারাদি পাপের শিক্ষাক্ষেত্র।"[৩] এ ধরনের রচনা দ্বারা সমাজের ক্ষতির আশংকা করে তিনি আরও বলেছেন, "থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশ দ্বারা যদি একটি মাত্র মুসলমানের দেহ কলঙ্কিত হয়, আধ্যাত্মিক অবনতি ঘটে, তবে কি স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সাহেব দায়ী হইবেন

১ নবনূর, পৌষ ১৩১০, পৃঃ ৩৪৯
২ ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৭, পৃঃ ২১ (পাদটীকা)।
৩ ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০, পৃঃ ২৮৫

না? পাপের প্রশ্রয় দান কিরূপ মহাপাপ, আমরা চৌধুরী সাহেবের শিক্ষাগুরু ও সভাসদ মৌলবী সাহেবদের নিকট ফতোয়া তলব করি।"১ থিয়েটার ও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের গভীর সম্পর্ক। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের বিরোধিতা দ্বারা নাট্যশিল্পেরই বিরোধিতা করা হয়। নাচ-গানের মত যাত্রা-থিয়েটার ইসলাম ধর্মে অননুমোদিত, এরূপ বিশ্বাস থেকেই বিরোধী মনোভাবের উদ্ভব।

১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে 'লহরী' প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার সমালোচনা করে ইসলাম-প্রচারকের সম্পাদক মন্তব্য করেন, "সর্বপ্রথম মুসলমান কবির সম্পাদিত কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকাখানি যে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে সেই বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের অবস্থা দেখিয়া ভয় ও ভাবনা হয়। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। শিক্ষিত নামে অভিহিত ব্যক্তিদিগকে জীবনীশক্তিশূন্য দেখিতেছি। আমরা নিখুঁত ইংরেজী ছাঁচে ঢালা কবিতার পক্ষপাতী নহি। মুসলমানদিগের ভাষা সমন্বিত কবিতাবলীও উপেক্ষার সামগ্রী নহে, ভরসা করি সুযোগ্য সম্পাদক সাহেব একথা স্মরণ রাখিবেন।"২ 'ইংরেজী ছাঁচে ঢালা কবিতা' বলতে সমালোচক সম্ভবতঃ আধুনিক গীতিকবিতার কথা বুঝাতে চেয়েছেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে'র বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে তিনি 'ভাবময়ী' কবিতার বিরোধিতা করেছেন। সুপ্তিমগ্ন ও জীবনীশক্তিশূন্য জাতিকে জাগাতে হলে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাময়ী কবিতার প্রয়োজন, তিনি প্রকারান্তরে এটাই বলতে চেয়েছেন। প্রায় অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কল্পনাসর্বস্ব, সারবস্তুহীন, রসকল্প রচনার বিরোধিতা করেছেন। তিনি নিজেই একজন সৃষ্টিশীল লেখক, তৎসত্ত্বেও কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সঙ্গীত ইত্যাদি সুকুমার সাহিত্যের প্রযোজনীয়তা অধঃপতিত সমাজের জন্য স্বীকার করেননি। যুগ ও সমাজের চাহিদা মিটাবার জন্য ঐ শ্রেণী রচনা অপেক্ষা ধর্ম ও নীতিশিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাবোদ্দীপক রচনার উপযোগিতা অধিক বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি 'সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন' নামে একটি প্রবন্ধ 'নবনূরে' প্রকাশ করেন। জাতি সংগঠন ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহিত্যশক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সকল শ্রেণীর সাহিত্য দ্বারা সেটি সম্ভব অপেক্ষাও নয়। তাঁর মতে, 'সাহিত্যের মূল্য জগতের সমুদয় রাজকোষের ধনরত্নের অধিক।...পক্ষান্তরে কদর্য সাহিত্যের কুৎসিতভাব, কুকল্পনা এবং কুচিন্তার কলুষ-

১ ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮০
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী স্বত্বাধিকারী ও শেখ আবদুর রহিম সম্পাদক ছিলেন

২ ঐ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯, পৃঃ ১৯০-৯১

রাশি, জগতের সমুদয় পাপ প্রলোভন অপেক্ষাও ভয়াবহ'। তিনি 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ছড়াছড়ি' এবং 'গল্পগুজবের বাড়াবাড়ি' দেখে আশঙ্কা করে বলেছেন, "সাপ্তাহিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাময়িক পত্রিকা পর্যন্ত প্রায় সমস্তই গাঁজাখুরী গল্প এবং নায়ক-নায়িকার উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়যুগলের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ।...উপন্যাস পাঠে যে উপকার, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, জীবনী, প্রাণিতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনায় কি তদপেক্ষা বহুল উপকারের আশা নাই?"[১] হিন্দু লেখকের অনুকরণে মুসলমান লেখকের এমন 'কামিনী-কোমল উপন্যাস' এবং 'বনিতার ন্যায় কোমল কবিতা' লেখা উচিত নয়, কেননা মুসলমান সমাজ অধঃপতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। এখন তেজোদীপ্ত, উচ্চ লক্ষ্যযুক্ত সাহিত্য আবশ্যক, পচনশীল সাহিত্য নয়। তাঁর আবেদন, "ভ্রাতৃগণ সাবধান হও—বঙ্গীয় মুসলমান পাপে পাপে মরিয়া গিয়াছে, এখন আর সেই মৃতদেহ বিষাক্ত প্রেম-রস-বারি সিঞ্চনে পচাইওনা। তাহা হইলে উহাতে আর জীবনীশক্তি সঞ্চারের আশা থাকিবে না।"[২] 'রায়-নন্দিনী' (১৩২২) উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'য় ইসমাইল হোসেন শিরাজী লিখেছেন, "একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সর্বদা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্যামীর গৌরব গানে বিভোর হইয়া...অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জাগাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুন তাড়নায় 'রায়-নন্দিনী' রচনা করিয়াছি।"[৩]

ধর্মচিন্তা ও নীতিবোধকে সামনে রেখে সাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছেন কায়কোবাদও। তিনি 'শিব-মন্দির' (১৯২১) কাব্যের ভূমিকায় লিখেন, "অধঃপতিত ও নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায়ই সৎসাহিত্যের আলোচনা।...অকবি রচিত পাপের পূতিগন্ধময় নিকৃষ্ট চরিত্র সমাজকে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে টানিয়া নেয়। এই কাব্যখানাতে আমি পাপ-পুণ্যের সংকট দেখাইয়া পাপের পতন দেখাইয়াছি।"[৪] হিন্দু লেখকগণ স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধের কথা বলতে গিয়ে ধর্মের কথা, জাতির অতীত গৌরব কাহিনী, পুরাণ ও ইতিহাসকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু

১ নবনুর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃঃ ৫৯-৬০
২ ঐ, আষাঢ় ১৩১০, পৃঃ ১০৮
৩ শিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড), পৃঃ ৫
৪ কায়কোবাদ—শিব-মন্দির, ১৯২১, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

করেছিলেন। মুসলমান লেখকগণও অনুরূপভাবে অতীতের গৌরবময় কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচন এবং ধর্মকথা প্রচার করে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন। নবজাগরণের কালে অতীতের বীরকাহিনী, মহৎ জীবন জাতিকে প্রেরণা জোগায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ওয়াহাবী-ফারায়েজী আন্দোলনের ফলে শাস্ত্রধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়, ঐ শতকের আট দশকের দিকে আমদানী হয় প্যান-ইসলামী চেতনা। প্যান-ইসলামবাদ দেশ ও রাষ্ট্রের সীমানা মানে না— বিশ্ব-মুসলমানের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব কামনা করে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে ওয়াহাবীরা মুসলমান শাসিত আফগানিস্তানে 'হিজরত' করার মত প্রচার করেছিলেন। এসব কারণে ভারতীয় মুসলমানরা আরব-ইরানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত। এদিকে হিন্দু-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যপ্রীতিও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুয়ানি বিষয় বর্জনের প্রশ্ন দেখা দেয়। মুসলমানদের আত্মাভিমান এমন স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল যে, আবদুল লতিফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে ইসলাম-বিরোধী ইংরাজী পুস্তকেরও বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, 'ইলিয়ড' পড়ে গ্রীক-পুরাণ উপাখ্যান জানার চেয়ে এদেশের ছাত্রদের পক্ষে 'রুস্তম-সোহরাব' পড়ে প্রাচ্য বীরযুগকে জানার প্রয়োজনীয়তা অধিক।[১] গ্রামের বাংলা-বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচীর হিন্দুয়ানি ভাবের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তোলেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। হিন্দু লেখকগণের রচিত পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক বিষয় প্রাধান্য পায়। মুসলমান ছাত্ররা তাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। সাহিত্যে ও ইতিহাসে যেখানে মুসলমানের কথা আছে, সেখানে তাদের খুনী, জঙ্গী, দুর্ধর্ষ রূপে দেখান হয়েছে, এসব পাঠ করে মুসলমান ছাত্রদের মনে পূর্বপুরুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মে। নওয়াব আলী চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন, "Should we send our boys to Schools only to learn of the vices and not of the virtues of our civilzation and our forefathers?"[২]

ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র ১৮৮৬-৮৭ সালের বার্ষিক অনুষ্ঠান-পত্রে লেখা হয়, "শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মধ্যে অনেকেই যীশুখ্রীস্টের প্রপিতা-মহের জীবনচরিত বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের যোলশত গোপিনীর নামকরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাহার

১ *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents* p. 220

২ *Vernacular Education in Bengal*, p. 11

চক্ষুস্থির।...আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্কুলসমূহে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই।...তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগের ইংরেজী ও বাঙ্গলা শিক্ষার বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্মশিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজ-বন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে, উহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।"[১] পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে 'নূর-অল-ইমানে' লেখা হয়, "পাঠশালার যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে হিন্দুদিগের পৌরাণিক কাহিনী রাম-রাবণের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের লীলা পড়িতে হয়। তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার মুখস্থ করিতে হয়। তাহা করিয়াও নিস্তার নাই। কোমলমতি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে মোসলমানের নিন্দা, এসলামী আচার-ব্যবহারের কুৎসা এবং মোসলমান জাতিকে ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি নামে ঘৃণা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পাঠশালায় শিক্ষার্থীগণের হৃদয়ে কিরূপে আত্মসম্মান ও জাতীয় প্রেম জন্মিতে পারে?"[২] 'বাসনা' পত্রিকায় জনৈক প্রবন্ধকার অনুরূপ অভিযোগ তুলে মন্তব্য করেন, "যাহাতে মুসলমানী ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কথা, বীর-বীরাঙ্গনার বিবরণ, সাধু-দরবেশের আখ্যান, পয়গম্বরগণের উপাখ্যান, ধার্মিক-ধার্মিকাদের বৃত্তান্ত, নবাব-বাদশাহদের জীবন, সতী রমণীগণের গুণ কাহিনী, ইসলাম ধর্মের সারতত্ত্ব, হাদিস-দলিলের সারসংগ্রহ, নামাজ-রোজার উপকারিতা, মুসলমানী পর্বাদির কথা ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় সরল বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই উচিত।"[৩]

লেখকদের মনে এসব প্রশ্ন সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকেই উত্থিত হয়েছে। ধর্মের বিধান, সমাজের শাসন এক দিকে, অপর দিকে যুগ ও সমাজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের লেখনি ধারণ ও চালনা করতে হয়েছে। আলোচ্য যুগে মুসলমান রচিত উপন্যাস-নাটকের সংখ্যা যেমন কম, মানও তেমনি তুচ্ছ। বিষয়বস্তুতে ও আঙ্গিকে সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাচন-প্রবণতা থাকলে মুক্ত ও সাবলীল সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সমাজের চোখ রাঙানিকে মেনে নিয়ে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন, তাঁরা ভাব ও ভাষার 'দুর্গে' বন্দী। রাশ টেনে ধরে সাহিত্যের সব লেখাকে সমাজের সেবায় লাগিয়ে দিলে সমাজের সেবা হয়, কিন্তু সাহিত্য গতি, প্রাণ ও স্বচ্ছন্দতা হারায়। এ যুগের মুসলমান রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ভাব, ভাষা, শব্দ, সাহিত্যের বিতর্কে আত্মজিজ্ঞাসা ও

১ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, পৃঃ ৬-৭

২ নুর-অল-ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭

৩ বাসনা, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬

নবজাগরণের প্রেরণা এসেছে বটে, কিন্তু তা এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যচিন্তার বর্ণে রঞ্জিত হয়ে। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের এটিও একটি কারণ। এই পর্বে মুসলমান লেখকগণ বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করলেও বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ছিলেন না বলে তাদের দ্বারা উন্নত সাহিত্য রচিত হয়নি। এজন্য তাঁদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচণ্ড জীবনীশক্তি ও প্রখর সৃজনিশক্তি নিয়ে সর্বপ্রথম সমাজের এই প্রতিবন্ধকতা ভাঙতে ও অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

রাজনীতি

১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় রাজনীতির অবসান হয়। মধ্যযুগীয় রাজনীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদী সামন্ত প্রভুর রাজনীতি, তাতে জনগণের কোন ভূমিকা ছিল না। ভূমিতে ব্যক্তি-মালিকানা না থাকায় এবং অর্জিত সম্পত্তিতে ব্যক্তি-অধিকার অনিশ্চিত থাকায় রাজনীতিতে জনগণের অংশ গ্রহণ আবশ্যক হত না। শ্রমোৎপাদিত পণ্যের নির্ধারিত অংশ সময়মত রাজকোষে জমা হলে রাজপুরুষেরা প্রজাদের অভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রামের মানুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেরাই উৎপাদন করত, অন্যের উপর নির্ভর করত না। এমন কি, ছোটখাট বিচার-আচার নিজেরাই মীমাংসা করে নিত। ফলে রাজপুরুষ ও রাজনীতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা জীবন যাপন করত। চার্লস্ মেট্‌কাফ বাংলার স্বল্পতুষ্ট স্বনির্ভর গ্রামসমাজকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বলেছেন,[১] তার প্রধান কারণ এখানেই নিহিত আছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসননীতি প্রবর্তন করেন। বণিক সরকার শাসন ও শোষণের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য পুরাতন দেশীয় রাজপুরুষ, ধনী সামন্ত ও বণিক শ্রেণীকে হয় ধ্বংস করেন অথবা নিস্ক্রিয় করে তোলেন। এই প্রক্রিয়ায় মীর জাফর খান, রেজা খান, জসরত খান, জগৎ শেঠ, রানী ভবানী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বর্ধমান ও বীরভূমের জমিদার পরিবার অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এর স্থলে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক শহর কলিকাতায় একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়, যারা বণিক শাসকগোষ্ঠীর দালালী-দেওয়ানী-কেরানী-বেনিয়ানী করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল। এদের একটি অংশ ক্রমে ভূমি কিনে নতুন ভূস্বামী হন। তাঁরা ইজারাদার, পত্তনিদার, নায়েব, দেওয়ান, গোমস্তা, মুন্সী, পাইক, পেয়াদার হাতে জমিদারী পরিচালনার ও রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়ে শহরেই বসবাস

---

১ The village communities are little republics, having nearly everything they want within themselves, and almost independent of any foriegn relation. They seem to last where nothing else lasts."—Charles Metcalfe.
Report of the Select Committee of the House of Commons, 1832, vol. 111 (Appendix 84) p. 331

করতেন। যেহেতু কোম্পানীর অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের প্রধান কারণ ছিল, সেহেতু তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাননি। শাসক শ্রেণীর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে তাঁদের সেবাদাস হিসাবে কাজ করেছেন। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে কেবল অভিনন্দন জানাননি, দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কাজেও শাসকশ্রেণীকে সহযোগিতা দান করেছেন। বিশেষতঃ ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রথম একশ' বছরের ইতিহাস—এ শ্রেণীর নির্জলা আনুগত্যের ইতিহাস।

এদিকে বিদেশী বণিক সরকার এবং দেশীয় 'কমেপ্রডর' তথা নব্য মধ্যবিত্তের লোভ ও লাভের পুরো বোঝা বহন করতে হয় হতভাগ্য জনসাধারণকে। কোম্পানীর মুহুর্মুহু রাজস্বনীতির ও বাণিজ্যনীতির পরিবর্তনের ফলে তাদের জীবন-ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ে, তারা এক বর্ণনাতীত দুর্গতির সম্মুখীন হয়। ক্ষমতার হস্তান্তরেব ক্রান্তিকালীন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং সীমাহীন আর্থিক শোষণের কারণে সাধারণভাবে ভীরু, শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির হয়েও বাংলার জনগণ একাধিকবার বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে। গ্রামই বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল, গ্রামের দলপতি বা সমাজপতি ছিলেন বিদ্রোহের নেতা। বাংলার মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই একে একে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩—১৮০০), বিবিধ কৃষক ও প্রজা বিদ্রোহ, তাঁতি বিদ্রোহ (১৭৭০), লবণ বিদ্রোহ (১৭৮০), চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৯৮), সাঁওতাল বিদ্রোহ, (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), ফারায়েজী আন্দোলন (১৮৩৮) ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে, সেগুলির সাথে কৃষক-শ্রমিক-মজদুর-কুটীরশিল্পী প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এসব বিদ্রোহে ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মজনু শাহ, মুসা শাহ, ভবানী পাঠক, সমসের গাজী, বলাকি শাহ, নবাব শামসদ্দৌলা, শহীদ তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুদু মিয়া এবং নামহীন শত শত মুজাহিদ ও সিপাহী। অধিকাংশ বিদ্রোহই ছিল আঞ্চলিক এবং সম্প্রদায়গত অথবা পেশাভিত্তিক। তাঁতির বিদ্রোহে কৃষক যোগদান করেনি, কৃষকের বিদ্রোহে, তাঁতি অংশ গ্রহণ করেনি। অনুরূপভাবে লবণ বিদ্রোহে মলঙ্গী, সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতাল, নীল বিদ্রোহে নীলচাষী অংশ গ্রহণ করেছে। ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলন প্রায় সমকালে হলেও সমতালে ও মিলিতভাবে হয়নি। অর্থাৎ বিদ্রোহ ও সংগ্রামগুলি সমগ্র দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ ও সংগ্রাম ছিল না। প্রধানতঃ সংগঠন ও সমরকৌশলের দিক থেকে গ্রামীণ নেতৃত্ব অত্যন্ত দুর্বল ছিল। 'বাঁশের কেল্লা'র

যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তিতুমীর তা উপলব্ধি করতে পারেননি। দেশের কামারশালায় নির্মিত ধাতব অস্ত্র, দূর পাল্লার গোলা-বারুদের অস্ত্রের কাছে টিকতে পারে না—এ ধারণাও অনেকের ছিল না। তাঁদের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ছিল সন্দেহ নেই, কেননা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ছাড়া কেউ রক্ত দিতে পারে না, তবে তাঁদের আবেগ ও অজ্ঞতাও ছিল। শত্রুর সমরাস্ত্র ও সমর-কৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না রেখেই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। ফলে সব বিদ্রোহই ব্যর্থ হয়েছে। অধিকতর সুগঠিত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী ওয়াহাবী-ফারায়েজী আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে সনাতন নেতৃত্বের ও চেতনার কারণে। এ ধরণের রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেগ ও গোষ্ঠী মনোভাব প্রাধান্য পায়। আধুনিক রাজনীতির আদর্শ জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তার আদর্শে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা হয় ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যার আত্মপ্রকাশ ঘটে। শহরের নব্য শিক্ষিত শ্রেণী এ-ধরণের রাজনীতির নেতৃত্ব দেন। উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বের বিদ্রোহ ও আন্দোলনগুলিতে নব গঠিত মধ্যশ্রেণী যোগদান করেননি, এমন কি, সেগুলি সমর্থনও করেননি।

জনগণের ক্ষুদ্র, খণ্ড সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তাদের জীবনধারার উপর দিয়ে একের পর এক যে ঝড় বয়ে যায়, তাতে সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় এবং পুরাতন মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমশঃ তাদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হয় এবং নতুন শাসননীতি, রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। প্রধানতঃ সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের সমাপ্তির (১৮৭০) পর থেকেই এরূপ। পরিবর্তন ঘটে। শহরের নব গঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবী-দাওয়া আদায়ের রাজনীতি শুরু করেন। আন্দোলনকে জোরদার ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য তাঁরা জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। এভাবে দেশে মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের যৌথ রাজনীতির ধারা প্রবর্তিত হয়। মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে যা পাওয়ার শতাব্দী কালের ব্যবধানে তা পেয়ে গেছে। নতুন শিক্ষা-পদ্ধতিতে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। ঔপনিবেশিক সরকার তা সহজে ছেড়ে দিতে পারেন না। ফলে সরকারের সাথে তাদের বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। মধ্যশ্রেণী যে ইংরাজের আনুগত্য ত্যাগ করে বিপক্ষে গেছে, তার প্রকৃত

তাৎপর্য এখানেই নিহিত আছে। এটি সমাজ-বিকাশের ধারায় স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়েছে। কতক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক ছিল। যেমন ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত ও আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা হলে তারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ক্রমশঃ দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া তাদের পক্ষে সহজতর হয়েছে। আমরা এটাকেই নব্য জাতীয়তাবাদ বলেছি। রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং সরকারের কাছে দেন-দরবার করা সম্ভব হয়েছে এই জাতীয়তাবাদের আদর্শের কারণেই। পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তক-পুস্তিকায় দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার মহিমাকীর্তন করে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নিজেদের ধর্ম, জাতিত্ব, ভাষা, ঐতিহ্য, সনাতন রীতিনীতি ও অন্যান্য অধিকার হারাবার কারণে যখন গ্রামের সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করেছে এবং রক্ত দিয়েছে তখন শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণী দূরে সরে থেকেছে। কিন্তু যখন নিজেদের অধিকার আদায় এবং স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজন হয়েছে তখন জাতীয়তাবাদের নামে তারা দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-ঐতিহ্য-জাতিত্বের গৌরব প্রচার করেছে। এমনিতেই মধ্যবিত্তের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবিধ বিরোধ আছে, তদুপরি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে ইংরাজের হাতে-গড়া দেশীয় মধ্যবিত্তের নানাবিধ দুর্বলতাও ছিল। মধ্যবিত্তের দেশপ্রেমের চেয়ে আত্মপ্রেম বেশী। তারা জনগণকে সাথে নিয়েছে যতটা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ততটা জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নয়।

উনিশ শতকের বাংলার রাজনীতির মোটামুটি এটাই উপর কাঠামো (extra-structure)। এর একটা আন্তর-কাঠামো (intra-structure) ছিল যা আলোচনা না করলে আমাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা অস্পষ্ট ও অব্যক্ত থেকে যায়। বাংলার রাজনীতির আন্তর-কাঠামোটি হল দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্বিরোধের নানা কারণ ছিল তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।[১] এই অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে ইংরাজগণ 'ভেদনীতির শাসন' (devide and rule policy) চালিয়েছেন। এটা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে তিক্ত ও বিভক্ত করেছে। উপরন্তু মুসলমানের রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র ধারা ছিল যা হিন্দুর রাজনীতির সাথে

১ এই অধ্যায়ের 'সমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য।

মিলে না। যেমন ক্রুসেড বা জিহাদ এবং প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্ব-মুসলিমবাদের নীতি ও আদর্শ কখন হিন্দুর রাজনীতির আদর্শ হতে পারে না। উনিশ শতকের মুসলিম রাজনীতিতে জিহাদ ও বিশ্ব-মুসলিমবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জিহাদ নীতির কারণে ওয়াহাবীগণ ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পারেনি, হিন্দুর পক্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নেওয়ার এরূপ কোন বাধা ছিল না। আবার বিশ্ব-মুসলিমবাদের কারণে মুসলিম নেতৃবর্গের দৃষ্টি ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তানে প্রসার লাভ করে। এগুলি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে মিলনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এর বিপরীত বিন্দুতে বর্ণহিন্দুর 'আর্যাভিমান' ছিল যার সূত্র ধরে হিন্দুর নবজাগরণ, নব অধ্যাত্মবাদ ও জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। তারা তাদের ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা আন্দোলনে মুসলমানদের সঙ্গে নেননি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ অনুসন্ধান করতে হলে এসব সূত্র ধরেই করা সংগত।

ব্রিটিশ আনুগত্য

উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশে আবদুল লতিফ কর্মক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হন। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয়েছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে দিল্লীর ম্রিয়মান শক্তির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা ছিল; এর জন্য সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে অধিক দায়ী করেন। ঐ সময় কলিকাতায় অবস্থানরত অযোধ্যার বৃত্তিপ্রাপ্ত নবাব ওয়াজেদ আলীকে আটক করা হয়। ফারায়েজী আন্দোলনের নেতা দুদু মিয়াকেও গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। ওয়াহাবী আন্দোলনকে সরকার যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। ১৮৭০-৭২ সালে পর পর দুটি হত্যাকাণ্ড ইংরাজদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। বিচারপতি নরম্যানকে আবদুল্লাহ এবং বড়লাট লর্ড মেয়োকে শের খান হত্যা করেন। সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে ওয়াহাবীদের ব্যাপক ধর-পাকড় করেন এবং রানীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ এনে অনেককে জেল-জুলুম-ফাঁসি-দ্বীপান্তর দিয়ে ওয়াহাবী আন্দোলন দমন করেন। সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে সৈয়দ আহমদের ও আবদুল লতিফের প্রথম কাজ হল ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরাজগণের যে সন্দেহ আছে, তা দূর করা। তাঁরা উভয়ে সিপাহী বিদ্রোহের বিপক্ষে রায় দেন এবং সভা ডেকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সৈয়দ আহমদ উর্দুতে 'ভারতের বিদ্রোহের কারণ' (১৮৫৯) বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে সরকারের সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা করেন।[১]

---

১ সৈয়দ আহমদ রচিত গ্রন্থখানির নাম 'আসবাব-এ বাগাওয়াত-এ হিন্দ'।

আবদুল লতিফ কলিকাতায় সভার আয়োজন করেন। সেখানে মৌলানা কেরামত আলী ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম'। রানীর ঘোষণাপত্র অনুযায়ী যেহেতু ধর্মপালনে বাধা নেই, সেহেতু শাসক বিধর্মী হলেও ধর্মের কারণে জেহাদ অসিদ্ধ, স্নুতরাং যাঁরা জেহাদ করবেন, তাঁরা ধর্মের চোখেও দণ্ডণীয় হবেন।[১] এ-সময়ে উইলিয়ম উইলসন হান্টার 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' (১৮৭১) পুস্তক রচনা করে মুসলমানের অসন্তোষ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন এবং সে অসন্তোষ দূর করার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি কেরামত আলীর প্রতিধ্বনি করে বলেন যে, সরকার প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না বলে মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসকের প্রতি অনুগত হলে তা ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে যায় না।[২]

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে রানী ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক 'ঘোষণা-পত্রে' (১ নভেম্বর ১৮৫৮) বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার সম্প্রসারণ নীতি পরিহার করে চলবে, ভারতীয়রা যোগ্যতা অনুসারে সরকারী চাকুরী পাবে এবং আইন-প্রণয়নে তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে। রানী ঐ ঘোষণাপত্রে ভারতীয়-দের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ সময় ভারতবর্ষ রানীর সরাসরি শাসনাধীনে চলে যাওয়ায় ভারতীয়রা ব্রিটিশের অন্যান্য প্রজার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে। এসব ঘটনা এদেশের মানুষের বিরূপ মনোভাব পরিবর্তনের সহায়ক হয়। আবদুল লতিফ ও তাঁর সহযোগীরা প্রথমে 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৫৫) এবং পরে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীকে এবং শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করেন। তিনি ইংরাজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কথা প্রচার করেন। সরকারী ও সওদাগরী অফিসে ইংরাজী জ্ঞান ছাড়া প্রবেশ করা যায় না। সরকারের প্রতি অনুগত থেকে চাকুরীতে প্রবেশ করে ভাগ্যোন্নয়ন করতে হবে—সমাজোন্নতি সম্পর্কে এই ছিল তাঁর ধারণা।

সৈয়দ আমীর আলী সমাজোন্নতির পথ ও পদ্ধতি ব্যাপারে আবদুল লতিফের সাথে একমত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসো-সিয়েশন' (১৮৭৮) রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। তিনি এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সমাজের দাবী-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরেন। লর্ড রিপনের কাছে প্রদত্ত

---

১ *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, p. 87

২ *The Indian Mussalmans*, 1871

১৮৮২ সালের বিখ্যাত 'স্মারকলিপি' তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সমকালীন সমাজ-চিন্তার প্রকৃষ্ট দলিল। যেহেতু মুসলমানরা শিক্ষায়-দীক্ষায় পিছিয়ে আছে, সেহেতু চাকুরীতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমান প্রার্থীর যোগ্যতা শিথিল করতে হবে এবং মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট পদ-সংখ্যা সংরক্ষিত রাখতে হবে।[১] অগ্রসর-মান হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করে আমীর আলী এরূপ বাড়তি সুযোগ-সুবিধা চেয়েছিলেন। নচেৎ সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর ছিল না। তাঁর সংগঠনে নব্য শিক্ষিতের সংখ্যা বেশী ছিল। সারা দেশে এসোসিয়েশনের শাখা ছিল, এজন্য তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তাধারা কলিকাতা শহর ছেড়ে মফস্বল শহরেও বিস্তার লাভ করে। আবদুল লতিফ কেবল উপর-তলার মানুষের উন্নতির কথা বলেছেন, যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। সাধারণ শ্রেণীর মানুষের স্বার্থকে তিনি তাঁর আন্দোলনের সাথে জড়াতে চাননি, এজন্য তিনি শহর ও মফস্বলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিধান দিয়েছিলেন। আবদুল লতিফের ও আমীর আলীর চিন্তাধারার মধ্যে এখানে গুণগত পার্থক্য ছিল।

রাজপুরুষেরা যখন কার্যভার গ্রহণ অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করতেন তখন তাঁরা সংগঠনের মাধ্যমে অভিনন্দন ও বিদায় সম্বর্ধনা দিয়ে সমাজের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করতেন। এজন্য সমকালের পত্র-পত্রিকা তাঁদের রাজনীতিকে 'আবেদন-নিবেদন'র রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করে।[২] আমীর আলী সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ক বিবিধ রচনা প্রকাশ করেন। তিনি এসোসিয়েশন এবং রচনার মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র প্রতি-নিধিত্ব দাবী করেন। হিন্দুগণ নির্বাচন প্রথার সমর্থক ছিলেন, কারণ তাঁরা সংখ্যায় বেশী ও যোগ্যতায় উন্নত ছিলেন। হিন্দুগণ চাকুরীর ক্ষেত্রেও মেধা, দক্ষতা ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুযোগ বৃদ্ধি ও সুবিধা বণ্টনের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন মত পোষণ করেছে। আমীর আলী ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মত উচ্চ সরকারী পদে 'মনোনয়ন প্রথা'র দাবী করেন ঐ একই কারণে যে, মুসলমানরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছে। মুসলমান পরিচালিত সমকালের বাংলা-ইংরাজী পত্র-পত্রিকা শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে জনমত প্রচার করে। তাঁদের এ-আবেদন বিফলে যায়নি। ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই

১ *Ameer Ali : His Life and Works*, pp. 23-40
২ *The Moslem Chronicle*, 3 October 1896

এক সরকারী গেজেটে বলা হয়, যে মুসলমানরা সরকারী চাকুরীতে পূর্ণ অংশ পাচ্ছে না ; সুযোগ সৃষ্টি হলেই স্থানীয় সরকার ও উচ্চ আদালতসমূহ এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা চালাবে এবং উক্ত সম্প্রদায়ের প্রার্থী নিয়োগ সংক্রান্ত নির্বাচন-অনুষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।[১] ১৮৯৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর প্রচারিত সরকারী সার্কুলারটি ছিল এরূপ : "If there be two candidates for one appointment, each of them possessing the requisite qualifications, preference should be given to the Muhammedan candidate."[২] এটি বাংলার শিক্ষা বিভাগের চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। বেকার সমস্যায় জর্জবিত হিন্দুগণ সরকারের এই নীতিকে প্রীতির চোখে দেখেননি। তাঁরা এ সবের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। 'মুসলমানের পিঠ চাপড়ান' নীতির পেছনে সরকারের ভেদনীতি কাজ করেছে বলে অভিযোগ করা হয় এবং সরকার অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন বলে 'গভর্নমেন্টের পুষ্যপুত্র' বলে তাদের অভিহিত করা হয়।[৩] এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয় ও তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলমান

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে' (১৮৮৪) যোগদানের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়। আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী কংগ্রেসে যোগদান করেননি। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, কংগ্রেসে যা আলোচিত হয় এবং যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাতে মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। উপরন্তু কংগ্রেসের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানের পক্ষে সমীচীন হবে না ; কারণ অশিক্ষা

১ Gazette of India, July 1885 ; *The Moslem Chronicle*, 15 August 1895 p. 344
মূল প্রস্তাবটি ছিল এরূপ : "The Governor-General in Council desires that in those provinces where Muhammedans do not receive their full share of State employment, the Local Governments and the High Courts will endeavour to redress this inequality as opportunity offers, and will impress upon subordinate officers the importance of attendings to this in their selection of candidates."

২ Goverment Circular no. 588 42 T. G. Darjeeling, 15th September, 1897 ; *The Moslem Chronicle*, 16 July 1898

৩ নবনূর, আষাঢ় ১৩১২, পৃঃ ১২৩

ও দারিদ্র থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের জন্য ঐ সময়ে ইংরাজের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক ছিল। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে আবদুল লতিফ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির পক্ষ থেকে লিখেন, "This committee of Muhammadan Literary Society of Calcutta regret their inability to accept your invitation as they not anticipate any benefit to be derived from further discussion of the difficult and momentous questions likely to occupy the deliberations of the Congress."[১] সৈয়দ আমীর আলী সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রায় একই মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, "This Committee (C.N.M.A.) that no possible advantage will result either to their community or the country at large by assuming attitude of uneasiness towards the Government and the steps it has taken and intends to take."[২]

১৮৮৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৮৮৮ সালের ১৬ মার্চ মীরাটের বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ করেন। আলীগড়ে 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' (আগস্ট ১৮৮৮) গঠন করে তিনি কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন।[৩] ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও তার তরঙ্গ উত্থিত হয়। বাংলার সদর ও মফস্বলের শহরগুলিতে বিবিধ এসোসিয়েশন ও আঞ্জমন ছিল। সেগুলির অধিকাংশ সৈয়দ আহমদের আবেদনে সাড়া দেয় এবং কংগ্রেস-বিরোধী 'স্বাক্ষরতা অভিযান' চালায়। ঢাকায় খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে একটি 'কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন কমিটি' গঠিত হয়। ঢাকার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত রাখাই ঐ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ঢাকার আঞ্জমনে ইসলাম কংগ্রেসের পক্ষে ছিল।[৪] ময়মনসিংহের মহামেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক হামিদউদ্দীন আহমদ এতদঞ্চলে সন্তোষজনক আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্রোত্তর দেন। হুগলীর ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক আশরাফউদ্দীন আহমদও অনুরূপ পত্রোত্তর দেন।[৫]

১ *The Statesment and Friend of India*. 25 December 1886

২ *Ibid.*, 19 December 1886

৩ মুজিবর রহমান (অনূদিত)—স্যার সৈয়দ আহমদ, ঢাকা ১৯৬৯, পৃঃ ৩০৬-৩৯

৪ *Hindu Muslim Relations in Bengal*, pp. 116

৫ *Ibid.*, pp. 117, 123

নব্বই দশকের মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ও ইংরাজী পত্র-পত্রিকার বেশীর ভাগই সৈয়দ অহমদের আন্দোলনকে সমর্থন দেয় এবং জনমত গড়ে তুলতে প্রচার অভিযান চালায়। সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকরের ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যায় (২৭ পৌষ ১৩০৭) 'কংগ্রেস সম্বন্ধে কয়েকটী কথা' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলার মুসলমান কেন 'কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী' সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে ঐ নিবন্ধে লেখা হয়, "আমরা কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিযোগী নহি। কিন্তু যে প্রণালীতে কংগ্রেসের কার্য চলিয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের আপত্তি।...আমরা দেখিতেছি, প্রজার প্রকৃত হিতসাধনের পরিবর্তে কংগ্রেস এখন নানাবিধ অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয়ের অবতারণা করিয়া সাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে রাজপুরুষদের চক্ষে ঘৃণিত ও হেয় করিয়া তুলিতেছেন। ...এই চাকুরীজীবী বাঙ্গালী এই কংগ্রেসের জন্য রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইয়াছেন।...একতা লইয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস মন্দিরে কংগ্রেস পাণ্ডাদের মধ্যে সে একতা কোথায়? বাঙ্গালাদেশ কংগ্রেসের উদ্ভব ক্ষেত্র, কিন্তু বাঙ্গালী সম্পাদকেরা, কংগ্রেসের অধিনায়কেরা আত্মদ্রোহে নিমগ্ন।...স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেব প্রথমে কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বুঝিয়া সেই কর্মবীর তাহার প্রতি সহানুভূতিশূন্য হন। আমরা তাই নানা কারণে কংগ্রেস দ্বারা সুফল লাভের আশা করিতেছি না। অনেকে বলেন—আমরা কংগ্রেসের বিরোধী।...আমরা কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি পূর্ণ। কিন্তু ইহার বর্তমান কর্ম প্রণালীর বিরোধী।"

মাসিক হাফেজের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭) সেখ ওসমান আলী বিএল 'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগদানে অনিচ্ছুক কেন সে বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি বলেন, "কংগ্রেস যেরূপভাবে গবর্ণমেণ্টের কার্যাবলীর সমালোচনা প্রতিবাদ আদি করিয়া থাকে, তাহাতে বোধ হয় কংগ্রেস গবর্ণমেণ্টের বিরোধী, সুতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়া গবর্ণমেণ্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিত নহে।...মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেস দ্বারা কোন ফল লাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বণ্টন করিয়া লইবে, মুসলমানেরা কিছুই পাইবে না।" মাসিক প্রচারকের ১৩০৮ সনের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় (৩য় বর্ষ ৮-৯ম সংখ্যা) এ.উ. আহমদ 'কংগ্রেস ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্যকলাপে সন্দেহ পোষণ করে বলেন, "ডিস্ট্রিক বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন প্রথা প্রচলন করিয়া গভর্ণমেণ্ট অবশ্য কংগ্রেসের নেতাগণের অনুমোদিত

কার্যই করিয়াছেন।...এই সমস্ত অধিকার হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানগণ সকলেই পাইয়াছে, পাইয়া ফল কি দাঁড়াইয়াছে? প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতেই হিন্দু মেম্বারগণই মনোনীত হইয়াছে, লাট সাহেবের সভায় হিন্দু মেম্বরগণই নির্বাচিত হইতেছে। প্রথম বারে দেখাইবার নিমিত্ত খান বাহাদুর সেরাজুল ইসলাম সাহেবকে চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে মনোনীত করিয়াছিলেন; তারপর হইতেই সেন, বাঁড়ুয্যে, মুখুর্যদেরই এক চেটিয়া হইযাছে।...কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চের উদ্ভাবিতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে স্বার্থপরতার নিকট হার মানিয়াছে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন প্রথা প্রচলন হওয়ার পর হইতে যে সমস্ত মুসলমান মেম্বর দেখিতে পাই, তাহার সমস্তই গভর্ণমেণ্ট নির্বাচিত মেম্বর।" এফিনউদ্দীন আহমদ অভিন্ন শিরোনামে (Muhammedans and the Congress) ইংরাজী সাপ্তাহিক মোসলেম ক্রনিকলে (১০ জানুয়ারী ১৮৯৫) বলেন, Among these one of the most import is the profound want of confidence felt by them (Muhammedans) in their Hindu compatriots, who have, all along been demanding power in the name of the people at large." ক্ষমতার দাবিতে কংগ্রেস নেতাদের স্বার্থপরতার জন্য মুসলমানরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত আছে। মৌলভী শামসুল হুদা এমএ বিএল 'Indian Politics and the Muhammedans' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ মোসলেম ক্রনিকলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) প্রকাশ করেন। এখানে মুসলমানদের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাবের একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলমানের একটি শ্রেণী কংগ্রেসের বিপক্ষে ছিল, আবার একটি শ্রেণী পক্ষেও ছিল। কংগ্রেসের ব্যতিক্রম ছাড়া অধিবেশনে প্রায় সব মুসলিম প্রতিনিধি যোগদান করেছেন।[১] গুনিরাউকের আবদুর রসুল, বর্ধমানের আবুল কাসেম, দেলদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবী, পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী কংগ্রেসকে সমর্থন দেন। 'সোলতানের (১৯০১) মত দু'একটি পত্রিকাও কংগ্রেসের পক্ষে জনমত প্রচার করে। চট্টগ্রামের মৌলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান সোলতানের সম্পাদক ছিলেন। এক ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ছাড়া এদের নেতৃত্ব ছিল আঞ্চলিক, তাঁরা বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হন।

১ পরিশিষ্ট—১ (ঘ) দ্রষ্টব্য।

মুসলিম জাতীয়তাবাদ

উনিশ শতক পর্যন্ত আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর প্রভাবই সর্বাধিক ছিল। আমীর আলী কেবল শিক্ষা, চাকুরী ও প্রশাসনে মুসলমানের অধিক সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের দাবী উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বিবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করে ইসলামিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন দ্বারা সমাজের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলা যায়, এটি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ও কর্মের দ্বিতীয় ধারা ছিল। ফারায়েজী ও ওয়াহাবী আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক দিক ছাড়াও একটি ধর্মীয়-সামাজিক দিক ছিল—সেটি হল ইসলামীকরণ। অনৈসলামিক রীতিনীতি ও আচার-আচরণ মুসলিম সমাজকে পঙ্গু ও হীনবীর্য করে রেখেছে। এজন্যই পতন, দারিদ্র ও দুর্গতি। মৌলানা কেরামত আলীও (১৮০০-৭৩) দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এ-ধারায় আন্দোলন চালিয়ে যান। হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুধু মিয়ার সাথে কেরামত আলীর সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তিনি তরিকার আধ্যাত্মিক দিক অক্ষুণ্ন রেখে ধর্ম ও সমাজের সংস্কারে মনোযোগী হন। ইসলামী-করণের সাথে ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনের চেতনা যুক্ত হয়ে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাধারা এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। নব্বই দশকে বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব হলে এ-দুটি বিষয়ই সেগুলির আলোচনার প্রধান বস্তু হয়ে উঠে। স্বসমাজ সম্পর্কে এই নববোধ 'মুসলিম জাতীয়তা' সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এটি মূলতঃ আমীর আলীরই দান। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে অনুসরণ করে অচিরেই কয়েকজন লেখক, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী আত্মপ্রকাশ করেন যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে 'বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদে'র জন্ম দেন। এঁদের মধ্যে আছেন মীর মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ মেরাজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, নওয়াব আলী চৌধুরী, আবদুল করিম বিএ, তসলিমুদ্দীন আহমদ বিএ, শেখ ওসমান আলী বিএ প্রমুখ। নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ইসলামের গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার দাবী তোলেন। নবাব আবদুল লতিফ সর্ব প্রথম পাঠ্যপুস্তকের অনৈসলামিক ও সমাজের নিন্দামূলক বিষয়গুলি বাদ দেওয়ার কথা বলেন এবং 'সেন্ট্রাল টেকস্ট বুক কমিটি'তে বেশী মুসলমান সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব দেন। 'পাঠ্যপুস্তক শুদ্ধি আন্দোলনে'

কমবেশী সকল কবি-সাহিত্যিক এগিয়ে আসেন এবং আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁরা অনুবাদ, গবেষণা ও অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেও ইসলামী ঐতিহ্য তুলে ধরেন। প্রধানতঃ খ্রীস্টান ও হিন্দুয়ানী বিষয় ও ভাবধারার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হয়েছিল। মাতৃভাষাকে আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করায় ক্রমে বাঙালী মুসলমানের 'আত্ম-পরিচয়-বোধে'র উন্মেষ হয়। আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর আন্দোলনে বাঙালী হিসাবে আত্ম-পরিচয়ের ধারণাটি স্পষ্ট ছিল না; তাঁরা নিজেরাই উর্দু-ফারসীর সমর্থক ছিলেন। উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করে বাঙালী মুসলমান আত্ম-পরিচয়ের স্পষ্ট সাক্ষর দেন।

অনেকে বলেন, দোভাষী পুথির বিষয়গত ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। দোভাষী বাংলায় কোন হিন্দু লেখক পুথি রচনা করেননি। পুথিকারগণ উর্দু-হিন্দী-ফারসী-বাংলার মিশ্রণে মুসলমানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে গড়া বাংলা মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ ধারণা আবদুল লতিফেরও ছিল। এজন্য তিনি বাংলা স্কুলে আদালতের দলিলপত্রের ভাষায় শিক্ষাদানের পরামর্শ দেন। দোভাষী পুথি শেষ পর্যন্ত টিকেনি সত্য, কিন্তু যতদিন তা চালু ছিল, ততদিন বাঙালী মুসলমানের সহিত্যরস পিপাসা মিটিয়েছে এবং আত্মজিজ্ঞাসার সন্ধান দিয়েছে। বাঙালী মুসলমানের আত্ম-পরিচয়ের প্রথম ক্ষেত্র-প্রস্তুত করে দোভাষী পুথি। ইসলামীকরণের যে প্রক্রিয়া ওয়াহাবী-ফারায়েজীগণ শুরু করেছিলেন, দোভাষী পুথিতে তারই প্রতিফলন আছে। বাংলার কৃষক-মজুর-মাঝি-মাল্লার-তাঁতি-জেলে সকল স্তরের মানুষ পুথির অনুরাগী পাঠক অথবা মনোযোগী শ্রোতা ছিল।

১৮৭১, '৮১, '৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট, কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের লেখা বাঙালীর ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, খোন্দকার ফজলে রাব্বির 'হকিকাতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) ইত্যাদিতে নতুন ভাবে বাঙালী মুসলমানের আত্ম-পরিচয় জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়। নব্য শিক্ষিত মুসলমান লেখক-সাংবাদিকগণ বাংলা সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে তারই সমাধান খুঁজেছেন। পরবর্তীকালে এটি আরও পল্লবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। সুতরাং ইসলামীকরণের আন্দোলন এবং মুসলমান হিসাবে আত্ম-পরিচয়ের অনুসন্ধিৎসা 'মুসলিম জাতীয়তা'র বীজ বপন করে। হিন্দু জাতীয়তার পাশে মুসলিম জাতীয়তা স্থান করে নেয়। সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয়তার চেতনা হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিকে দ্বিখণ্ডিত ও

দ্বিমুখী করে। মাতৃভাষার প্রশ্নে বাংলাকে গ্রহণ করে বাঙালী মুসলমান অবাঙালী মুসলমান থেকে পৃথক হয়েছে, আবার জাতীয়তার প্রশ্নে স্বভাষী হিন্দুর সাথেও ঐক্য স্থাপন করেনি। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থে দেশ-ভাষা-রক্ত-ঐতিহ্যের চেতনা চাপা পড়ে যায় এবং উভয়ে দুটি বিবদমান জাতিতে পরিণত হয়।

বিশ্ব-মুসলিমবাদ

এর সাথে 'প্যান-ইসলামিজম' বা বিশ্ব-মুসলিমবাদের বিষয়টি আলোচনা করলে বাংলার মুসলমানের রাজনীতির স্বতন্ত্র চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়। বিশ্ব-মুসলিমবাদের প্রবক্তা ছিলেন আফগানিস্তানের সৈয়দ জামালউদ্দীন (১৮৩৮-৯৭)। তিনি ইরাকে লেখাপড়া করেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল তুরস্ক। তুরস্কের সুলতান সমগ্র মুসলিম বিশ্বে 'খলিফাতুল মোসলেমীন' বা আধ্যাত্মিক প্রতিনিধির মর্যাদা পেতেন। জামালউদ্দীন আফগানী খলিফাতুল মোসলেমীনের সূত্র ধরেই বিশ্ব-মুসলিমবাদের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি একাধিক বার ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি ১৮৮০-৮২ সালে কলিকাতায় অবস্থান করেন এবং মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। সৈয়দ আমীর আলী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ভ্রমণ করে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেরূপ প্রবল হয়ে উঠেছে, তাতে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। এজন্য তিনি ইসলামের সৌভ্রাতৃত্বের নীতিতে বিশ্ব-মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্য-সূত্রে বাঁধার চিন্তা করেছিলেন। এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কোরানের বাণী প্রচার করে তিনি ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করে মুসলমানদের একতা ও সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এটাই ছিল প্যান-ইসলামের ভাবাদর্শ। খলিফাতুল মোসলেমীনের আদর্শ ধর্মীয়, প্যান-ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি রাজনৈতিক। স্বয়ং আমীর আলী এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলার অনেক লেখকও এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী জামালউদ্দীন আফগানীর সাক্ষাৎ ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁর 'সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) গ্রন্থখানি প্যান-ইসলামী ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়। ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন। প্রচারক পত্রিকায় (পৌষ ১৩০৭) সম্পাদক মেয়রাজুদ্দীন আহমদ বলেছেন, "সমাজ ও সংস্কারকের প্রচারে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান নবজীবন লাভ করিয়াছে, স্বার্থ

বলিদান করিতে শিখিয়াছে এবং কার্যক্ষম হইয়াছে। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ লেখকও প্যান-ইসলামী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের রচনায় আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তানের গৌরব যুগের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিবরণ বেশী স্থান পেয়েছে। সৈয়দ আমীর আলী প্রথম এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে ও গ্রন্থে তার স্বাক্ষর আছে।

১৮৭৭ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ হয়। তখন তুরস্কের সিংহাসনে আবদুল হামিদ খান (১৮৪২-১৯১৮) অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া তুর্কী সুলতানের অধীনে ছিল। এগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী তুললে রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি ও ইংলণ্ড চতুঃশক্তি তাদের মদদ জোগায়। আবদুল হামিদ খানের শাসন-সংস্কারেও (১৮৭৬) সন্তুষ্ট না হয়ে রাশিয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে। গাজী ওসমান পাশা প্লেভনা দুর্গ জয় করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ১৮৭৮ সালের ৩ মার্চ রুশ-তুর্কীর মধ্যে 'সান স্টেফানো চুক্তি' হয়। এতে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে তুরস্কের ক্ষমতা লোপ পায়। যুদ্ধকালে ইংলণ্ড রাশিয়াকে সমর্থন দিলেও, চুক্তির শর্তে রাশিয়ার এক তরফা প্রাধান্যে ইংলণ্ড খুশি হয়নি। জার্মান এ ব্যাপারে ইংলণ্ডকে সমর্থন দিলে রাশিয়া বার্লিনের বৈঠকে মিলিত হয়ে সান স্টেফানো চুক্তি সংশোধন করতে বাধ্য হয়। এ-সময় ইংলণ্ড সুলতানের এশিয়ার রাজ্যগুলিকে 'আশ্রিত রাজ্য' (protectorate states) হিসাবে ঘোষণা করে।

অন্যূন এক বছরের রুশ-তুরস্কের এই যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলাফল, চুক্তির শর্ত ইত্যাদি ভারতের মুসলমানদের নানাভাবে আলোড়িত ও বিচলিত করে। বহু লোক প্রাণ হারায়, অনেকে আহত হয় ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তুরস্কের এরূপ ক্ষয়ক্ষতিতে ভারতের মুসলমানরা মর্মাহত হয়; তারা যুদ্ধাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত তুর্কীদের সাহায্যের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করে দান হিসাবে সেখানে প্রেরণ করে। কলিকাতায় 'মহাম্মদি আখবার' নামে একটি বহু ভাষী পত্রিকা (৪ জুন ১৮৭৭) যুদ্ধের কথা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার ও তাদের সহানুভূতি উদ্রেক করার উদ্দেশ্যেই জন্ম লাভ করে। অধিকাংশ সম্পাদকীয় নিবন্ধ যুদ্ধের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে লেখা হত। ১৫ জুন ১৮৭৭ সালের ৪র্থ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয় "ভাইগণ! রাশিয়া লালচ ও আদাওতের সববে রুমের 'পরে চড়াই করিয়াছে, কারণ এই যে, মক্কা, বায়তুল মোকাদ্দস, মদিনা ও কারবালা হাত করিয়া মুসলমানদের ইমানের হানি করে। তুর্কি মুসলমানেরা ইমানকে জান

হইতে অধিক জানে; এই বিপদ টালিবার জন্য জোরু, লাড়কা, জানমাল শুদ্ধা খোদার রাহে দিতে আছে। ....হাজারও হাসপাতালে কতোকতো জখমি পড়িয়া আছে, হাজারও বেওয়া আওরত অনাথ ও লাচার বসিয়া আছে। ঐ জখমিদের জন্য আর ঐ বেওয়াদের জন্য....তাহাদের খবর নিতে টাকা পাঠাও। দেখো সওয়াব সস্তায় বিলাইতেছে। কিনে লহ। বেহেস্ত অল্প পয়সায় পাওয়া যাইতেছে। আর বুঝিও না যে, আমাদের ইংলণ্ডের বাদশা তোমাদের উপর নারাজ হইবেন। ....আমি 'দারুল খেলাফত' নামক তুর্কি পত্রিকায় দেখিয়াছি এবং কর্ণেল লিস সাহেবের পত্রে জানিয়াছি যে, তুর্কির প্রতি ইংলণ্ডের ধনী প্রজারা অনেক মদদ করিতেছেন, আর চাঁদা কমিটিও স্থাপিত করিয়াছেন—যাহাতে সরকার কোন বাধা দেন নাই।"

রুশ-তুর্কীর যুদ্ধকে ঐ পত্রিকা মুসলমানদের জন্য 'জেহাদ' বলে উল্লেখ করেছে, জেহাদে অংশ গ্রহণ করা মুসলমান মাত্রেরই পুণ্যের কাজ। ঐ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গণি এবং নবাব আহসানউল্লাহ ২০ হাজার টাকা, নবাব আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা, সৈয়দ আমীর আলী 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ৫৭৮৩ টাকা তুরস্কে প্রেরণ করেন। বোম্বাই-এ তুরস্কের রাজদূত হোসেন হাবিব আফেন্দীর মাধ্যমে ভূপালের বেগম ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা প্রেরণ করেন।[১] আবদুল লতিফ আত্মজীবনীতে (মাই পাবলিক লাইফ) লিখেছেন যে, তুর্কী-সার্ভিয়ার যুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সমানুভূতি সুলতান ও তুরস্কের জনগণের প্রতি পুরামাত্রায় ছিল। তিনি বাংলা সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৮৭৭ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে কলিকাতার টাউন হলে সভা করেন। এতে একটি সাহায্য তহবিল গঠন এবং তুরস্কের সুলতানকে রানী ভিক্টোরিয়া যাতে সহযোগিতা করেন সেজন্য তাঁর নিকট একটি স্মারকপত্র প্রেরণের প্রস্তাব নেওয়া হয়।[২] 'দি ইংলিশম্যান' (৯ অক্টোবর ১৮৭৭) ঐ সভার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বলেছে যে, এত বড় সভা কলিকাতা শহরে বা অন্যত্র হয়নি; আমীর থেকে মজদুর পর্যন্ত বহু লোক সমবেত হয়েছিল। আবদুল লতিফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং উর্দুতে বক্তৃতা দেন। তিনি রুমের সহিত ব্রিটিশ সরকারের মিত্রতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, জেহাদ নয়। ঐ পত্রিকা

১ আবদুল কাদির—মহাম্মদি আখবার, মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, ঢাকা ১৩৬৬, পৃঃ ২২

২ *Nawab Bahadur Abdul Latif: His Writings and Related Documents*, p. 176

এই সভাকে মুসলমানদের পক্ষে অন্যতম 'রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' বলে মন্তব্য করে।[১] আবদুল লতিফ বলেছেন, তাঁর এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তুর্কীর সুলতান প্রতিদানে তাঁকে 'মুজিদী' উপাধি দেন।[২] মহাম্মদি আখবার এক সংখ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৭৭) বলেছে যে, ঐ সময় হিন্দুরা 'রুশ-মৈত্রী'র প্রতি কটাক্ষ করেছে। তবে উদারপন্থী নেতারা বাঙালী মুসলমানদের সমর্থন দিয়েছেন। 'দি বেঙ্গলি'র সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪) পূর্বোক্ত সভা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আবদুল লতিফকে সাহায্য করেছিলেন।[৩] যুদ্ধের সময় মুসলমনরা মসজিদে মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করে।[৪] তুর্কীর প্রতি এই সহানুভূতির রেশ দীর্ঘদিন চলে। ১৯০০ সালে 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে' নির্মাণের সময় চাঁদা সংগ্রহের আন্দোলন হয়। এ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তুরস্কে প্রেরণ করা হয়।[৫] তুর্কীর সুলতানের সিংহাসন আরোহণের 'রৌপ্য জুবিলী উৎসব' (১৯০০) খুব উৎসাহের সাথে পালিত হয়! এসবই বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনার ফল। বাঙালী মুসলমানের 'আত্ম-পরিচয়' ও 'মুসলিম জাতীয়তা'র গঠনে এসবের প্রভাব পড়েছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও শিবাজী উৎসব

হিন্দু জাতীয়তার গৌরব, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, রাম গোপাল ঘোষ যখন মোঘল-পাঠান বাদশাহদের হীনবীর্য করে এবং মারাঠা-রাজপুতদের বীরপুরুষ ও আদর্শ নেতা করে চিত্রিত করেন, তখন বাংলার মুসলিম সমাজে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুধু এই কারণে যে, মোঘল-পাঠান নবাব-বাদশাহ মুসলমান ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর

---

১ *op. cit.*, p. 185 (Appendix).

২ *Ibid.*, p. 177

৩ Nirmal Sinha—*Freedom Movement in Bengal* (1818—1905), Calcutta, 1968, p, 260

৪ C. E. Buckland—*Bengal under the Lietenant Governors*, Vol. 11, 1901, p 691

৫ ইসলাম-প্রচারক, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৬ ৭
মৌলবী মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর (উকিল, কলিকাতা হাইকোর্ট) আবদুর রহিম (ব্যারিস্টার-এট-ল), সৈয়দ জহিরুদ্দীন (ঐ), ও মোহাম্মদ আসগর (ঐ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩১২, পৃঃ ৩৩১

নিজস্ব চরিত্র আছে—মোঘল-পাঠান শাসকদের সেরূপে দেখা হয়নি। ঠিক একই কারণে বালগঙ্গাধার তিলক প্রবর্তিত 'শিবাজী উৎসব'কে (১৮৯৫) বাঙালী হিন্দুগণ যেভাবে গ্রহণ করেছেন, মুসলমানগণ সেভাবে গ্রহণ করেননি। সখারাম গনেশ দেউস্কর বাংলা দেশে ঐ উৎসবকে জনপ্রিয় করে তোলেন (১৯০২) রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজি উৎসব' (১৩১১) কবিতা রচনা করে শিবাজীর মহত্ত্ব তুলে ধরেন এবং ভারতে এক ধর্মরাজ্য গঠনের স্বপ্নের কথা প্রচার করেন। বিপিনচন্দ্র পাল এটি সমর্থন করেন এই বলে যে, শিবাজী হিন্দুর সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক' তাঁকে সম্মান করার অর্থ হিন্দুর আদর্শকে সম্মান করা।[১] সমকালের মুসলিম পত্র-পত্রিকায় 'শিবাজী উৎসবের বিরূপ সমালোচনা হয়। ইসলাম-প্রচারক, মিহির ও সুধাকর ও মোসলেম ক্রমিকলে এ-সম্পর্কে সংবাদ ও প্রতিবেদন ছাপা হত। শেখ ওসমান আলী 'বাঙালী জাতি ও শিবাজী' এবং 'শিবাজী উৎসব ও মুসলমান জাতি' শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ইসলাম-প্রচারকে (মে-জুন ১৯০২) এবং কোহিনুরে (ভাদ্র ১৩১৩) প্রকাশ করেন। তিনি বিষয়টিকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃ তে বিশ্লেষণ করেও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করছে বলে শিবাজী-উৎসবের বিপক্ষে মত দেন। তিনি এটিকে সরাসরি হিন্দুর 'সাম্প্রদায়িক উৎসব' বলে আখ্যায়িত করেন।[২] বাসনা পত্রিকায় 'শিবাজী' শিরোনামে সম্পাদকের (শেখ ফজলল করিম) মন্তব্যে বলা হয়, "বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে আজকাল 'শিবাজী উৎসব' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। যাঁহারা 'শিবাজী উৎসবে'র পক্ষপাতী তাঁহাদের হৃদয় যে শিবাজীর প্রতি অতি মাত্রায় ভক্তিমান তাহা বলাই বাহুল্য। 'আদর্শ বীর' বলিয়াই তাঁহারা শিবাজীর চরিত্র অনুকরণ করিতেছেন. কিন্তু সত্য ইতিহাসের চক্ষে শিবাজীর এই মহত্ত্ব কৃত্রিম।... যাঁহারা শিবাজীর চরিত্র সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিয়াও তাঁহাকে 'বীর' বলিতে কুণ্ঠিত নহেন, আমরা কদাপি তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে পারি না।"[৩] মিহির ও সুধাকরে (৩ অগ্রহায়ণ ১৩১১) টাঙ্গাইল থেকে আজিজর রহমান প্রেরিত একটি প্রতিবেদন ছিল এরূপ ; "শিবাজী উৎসবে মুসলমানের যোগ দেওয়া উচিত নহে, ইহা আপামর সাধারণ মুসলমান মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু ভ্রাতাদের যে কি স্বার্থ আছে, তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না ; তবে যদি মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিবার জন্য শিবাজী উৎসব করেন, সে স্বতন্ত্র কথা।

১ Bipin Chandra Pal—*The New Spirit*, Calcutta, 1907, p. 49

২ কোহিনুর, ভাদ্র ১৩১৩, পৃঃ ১১১

৩ বাসনা, বৈশাখ, ১৩২৬

যে শিবাজী ধার্মিকবর মহামান্য বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে অশেষ প্রকারে বিরক্ত করিয়াছিলেন সেই শিবাজীর উৎসবে তাঁহার কার্যকলাপের গুণ বর্ণনা কালে অবশ্য বাদশাহের কার্যকলাপের উপর দোষারোপিত হইবেই হইবে, তাহা না হইলেও যে ব্যক্তি আমাদের বাদশাহের শত্রু সে আমাদেরও শত্রু। এইরূপ কার্যকলাপের পোষকতা করা কোন মতে উচিত নহে বলিয়া আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারি না। সন্তোষের জমিদার মহোদয়গণ নাকি স্ব স্ব মুসলমান প্রজাবন্দকে শিবাজী উৎসবে যোগ দিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিযাছিলেন।...মুসলমান সমাজ গৌরব বন্ধবর মৌলভী আবদুল হামিদ খাঁ ইউসফজয়ী সাহেবের অগাধ যত্নে ও চেষ্টায় হিন্দু ভ্রাতাগণ শিবাজী উৎসব সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।" উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী গো-হত্যা বন্ধের ব্যাপারে মীর মশাররফ হোসেন কে সমর্থন দিয়েছিলেন।

হিন্দুগণের চোখে দস্যু বর্গীরা পর্যন্ত বীরপুরুষের মর্যাদা পেয়েছে। রাজপুত-মারাঠা-রাজপুরুষ বাঙালী হিন্দুর আপন জন ছিলেন না, যেভাবে পাঠান-মোঘল নবাব-বাদশাহ বাঙালী মুসলমানের আপন জন ছিলেন না। ইংরাজের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং নিজ ভাবাবেগ ও মতাদর্শের রঙ-তুলি মিশিয়ে হিন্দুগণ যে ইতিহাস ও সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে ভারতের মুসলমানগণ আঘাত পেয়েছেন; আবার হিন্দুগণের পুনর্জাগরণের যুগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সহানুভূতির সাথে না দেখে এবং দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্থলে আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে মুসলমানগণ হিন্দুর চিত্ত থেকে দূরে সরে গেছেন। স্বজাতি, স্বভাষী, স্বদেশী, সমরক্ত ও সমসংস্কৃতির মানুষ হয়েও বাংলার হিন্দু-মুসলমান এক হতে পারেনি—এই বহির্মুখী ও বিপরীতমুখী রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণেই। ঔপনিবেশিক শোষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অবিকশিত অর্থনীতি, প্রশাসনিক সুয়োরানী-দুয়োরানী নীতি, মধ্যবিত্তের অসম-বিকাশ, শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং ধর্ম-বর্ণবৈষম্যের কারণে এরূপটি হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উপসংহারে বলা যায় যে, উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানের রাজনীতির ধারাবাহিকতা ছিল, তবে রাজনীতির ধরণ ও নেতৃত্ব অভিন্ন ছিল না। ঐ শতকের প্রথম ভাগের রাজনৈতিক সংগ্রাম ধনী জমিদার, অত্যাচারী নীলকর ও বিদেশী ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে যায়, দ্বিতীয় ভাগের রাজনৈতিক চেতনা ও প্রজ্ঞা প্রধানতঃ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিদেশী শাসকের কাছ থেকে অধিকার আদায়ে নিয়োজিত হয়। এই সময় আত্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্মাদর্শ ও ঐতিহ্য চিন্তার

সমন্বয়ে মুসলিম রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র চরিত্র গড়ে উঠে। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে লর্ড ক্লাইভ পার্লামেন্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দান কালে বলেছিলেন যে, ইংরাজ যখন বিজয় গৌরবে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে তখন লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে তা দেখছিল, তারা ইউরোপীয়দের ধ্বংস করতে চাইলে কেবল লাঠি এবং পাথর দিয়েই তা করতে পারত।[১] এই উক্তিতে এদেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনার শূন্যতার ইঙ্গিত আছে। ন্যূনাধিক একশ' বছর পরে হান্টার মন্তব্য করেন যে, ভারতের মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রিটিশ ভারত-সাম্রাজ্যের একটি 'স্থায়ী বিপদ স্বরূপ' হয়ে আছে।[২] রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন যে হঠাৎ করে হয়নি তা আমাদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ও সামাজিক বিকাশের ধারায় ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে একটি জাতি চেতনার শূন্যতার স্তর থেকে চেতনার পূর্ণতার স্তরে অগ্রসর হয়েছে।

---

১ "That the inhabitants who were spectators upon that occasion. must have amounted to some hundred thousands ; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones. উদ্ধৃতি গৃহীত : অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৬৫. পৃ: ১২ (২য় সং) ।

২ *The Indian Mussalmans*, 1871

উপসংহার

১২০৩ খ্রীস্টাব্দে পাঠান শাসনকর্তা বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয়, থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত ন্যূনাধিক সাড়ে পাঁচ শ বছরকে বঙ্গ দেশের মুসলিম শাসনামল বলে গণ্য করা হয়। পাঠান ও মোঘল আমীর, সুলতান, সুবেদার, নবাব কখন দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে, কখন প্রাদেশিক স্বাধীন সামন্ত-বাদী শাসনকর্তা হিসাবে এদেশে রাজত্ব করেন। মুসলিম শাসকের অভ্যুদয়ের সাথে মুসলিম সমাজেরও গোড়াপত্তন হয়। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক, ভাগ্যান্বেষী ইত্যাদি শ্রেণীর বহিরাগত মুসলমানের অবস্থান ও আবাসভূমি নির্মাণ, দেশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মান্তর গ্রহণ, দেশী-বিদেশীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক হেতু রক্তের মিশ্রণ---এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজের বিকাশ, বিস্তার ও সমৃদ্ধি ঘটে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর তুলনায় সামান্য কম ছিল ; ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী শাসন-ব্যবস্থায় সামাজিক-অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মুসলিম সমাজ যে দেশের গভীরে শিকড় গেড়েছিল তার প্রমাণ কেবল সংখ্যা-বৃদ্ধিতে নয়, এদেশের শিল্প-সংস্কৃতিতেও আছে। ইসলামী নতুন ঐতিহ্য ও ভাবধারার প্রবর্তন, দেশীয় সংস্কৃতিতে সেগুলির প্রভাব ও মিশ্রণের কথা বিচার করলে মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও আত্মা উপলব্ধি করা যায়।

যান্ত্রিক ও প্রকৌশলী বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ফলে উনিশ শতকে ইউরোপের নানা স্থলে পরিবর্তন হয়েছিল, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক বাংলা ও ভারত বিজয়ের ফলে এ দেশেও পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। কোম্পানীর ঔপনিবেশিক শাসননীতির, অর্থনীতির ফলে এদেশে শাসক শ্রেণীর অনুগত একটি 'কম্প্রেডর' তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন করে এবং ভাব-জগতে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করে। এরাই আধুনিকীকরণ ও নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল। কলিকাতা শহরকেন্দ্রিক নবগঠিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বাংলার মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য ছিল। স্বল্প সংখ্যক মুসলমান অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার প্রতি মোহ ও আকর্ষণ দীর্ঘকাল তিরোহিত হয়নি।

সিপাহী বিদ্রোহে চরম বিপর্যয়ের পর প্রকৃতপক্ষে এই মোহের অবসান হয়। এ-অঞ্চলের মুসলমান উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করে।

বাংলাদেশে হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় মুসলিম মধ্যবিত্ত সংখ্যায় স্বল্প এবং সময়ের দিক থেকে পশ্চাৎবর্তী ছিল। হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রধানতঃ উচ্চ বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত, তাদের পুরাতন ঐতিহ্য এবং কালিক প্রবহমানতা ছিল। মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন মিশ্র, তাদের জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার অভাব ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয়-সামাজিক আদর্শ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির, এজন্য তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এক সাথে ও এক পথে এগোয়নি। এমন কি, রাজনৈতিক আন্দোলনেও তারা একত্র হতে পারেনি। হিন্দু সমাজে যখন ব্রাহ্মধর্ম ও আর্যধর্ম নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে, মুসলিম সমাজে তখন ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলন হচ্ছে। একের আন্দোলনের সাথে অন্যের আন্দোলনের আদর্শগত ও প্রকৃতিগত মিল তো নেই, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বিরোধ আছে। ইংরাজ-বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহে সিপাহী ও সামন্ত প্রভুরা জড়িত ছিলেন, ইংরাজ-সৃষ্ট মুৎসুদ্দি শ্রেণী তাতে অংশ গ্রহণ করেনি। গ্রামীণ ও নাগরিক নেতৃত্বের দিক থেকেও ভিন্নতা ছিল।

শহরকেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যবিত্ত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জেগে উঠেই দেখে যে তার অস্তিত্ব বিপন্ন। ঔপনিবেশিক শাসক ইংরাজ প্রধান শত্রু হলেও ইংরাজের সাথে বিরোধিতা করে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বরং বৈষয়িক সুবিধা ভোগের ও উন্নতি লাভের জন্য শাসক শ্রেণীর সহযোগিতা আবশ্যক। প্রশাসনে ও চাকুরিতে সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রসরমান হিন্দু মধ্য-বিত্তের সাথে সংখ্যালঘু ও পশ্চাদপদ মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুবিধা করা সম্ভব নয় বলে তারা সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। শ্রেণী হিসাবে এমনিতেই মধ্যবিত্তের মধ্যে নানা অন্তর্বিরোধ আছে, তার উপর পরস্পরের বঞ্চনানীতির ও সরকারের ভেদনীতির ফলে বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠে। অসম বিকাশ ও অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত প্রথমে দ্বন্দ্ব ও পরে বিচ্ছিন্নতার দিকে এগিয়েছে।

কলিকাতা মাদ্রাসার জুনিয়ার স্কলারশিপ পাশ আবদুল লতিফ সর্ব প্রথম মুসলিম সমাজে ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলনের জন্য আন্দোলন করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান 'মহামেডান লিটারেরী

সোসাইটি' গঠন করে তিনি মুসলমানের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীকে একত্রিত করেন। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হয়েও তিনি প্রাচীন অভিজাত ও এলিট শ্রেণীকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাঁর সোসাইটিতে উর্দু-ফারসী-ইংরাজীর চর্চা হয়েছে, বাংলার চর্চা হয়নি। মুসলমান সমাজের স্বার্থের প্রতি তিনি প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন, তাই বলে তাঁর ধর্মান্ধতাও ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ও সম্প্রীতিতে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, এমন কাজ তিনি করেননি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ও বিলাতের বার-এট-ল পাশ সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্ব ছিল উচ্চ ও বহু মাত্রিক এবং গতিশীল। তাঁর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ছিল রাজনৈতিক সংগঠন। তিনি বাংলার ও ভারতের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীকে এই সভার মাধ্যমে সংগঠিত করেন এবং মুসলিম জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করেন। ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তা তাঁর লক্ষ্য হলেও বিশ্ব-মুসলিমবাদের আদর্শ তিনি বিস্মৃত হননি। বিশ্ব-মুসলিমবাদের জন্মদাতা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীকে আবদুল লতিফ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করতে দেননি। আমীর আলী এলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। ব্রিটিশ সরকার জামালউদ্দীন আফগানীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি ইসলামী ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সভ্যতার গুণকীর্তন করে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। উর্দু তাঁর মাতৃভাষা, ইংরাজী শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার ভাষা। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার লোপ ও ইংরাজী শিক্ষার প্রচার চেয়েছিলেন। আবদুল লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষা অক্ষুণ্ণ রেখে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন। সুতরাং কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভিন্নতা ছিল। তবে মুসলিম সমাজের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আবদুল লতিফের মত আমীর আলীও অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন।

উনিশ শতকের নব্বই দশকে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর প্রেরণাকে অঙ্গীকার করে নতুন মাত্রায় ও আঙ্গিকে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয়। এ সময় মুসলমান সম্পাদক ও লেখকের প্রচেষ্টায় একাধিক বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। তাঁরা কখনও একক কখনও যৌথভাবে বাংলা গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ ও প্রচারে এগিয়ে আসেন। এঁদের কারও শিক্ষা মাদ্রাসায়, কারও শিক্ষা বাংলা-ইংরাজী বিদ্যালয়ে। কলিকাতা ও মফস্বল শহরে অবস্থান করলেও গ্রামের সাথে তাঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। মীর মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মোজাম্মেল হক, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ অলী, রওশন আলী চৌধুরী, আবদুল

করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, মুন্সী মেহেরুল্লাহ, শেখ ফজলল করিম প্রমুখ লেখকের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তাঁরা বাংলাকে মাতৃ-ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে সে-ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে, পত্রিকা সম্পাদনা করে এবং সভায় বক্তৃতা দিয়ে ইসলামীকরণ ও শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন করেন। ফলে তাঁদের আন্দোলন দেশের গভীরে প্রবেশ করে। মাতৃভাষার প্রশ্নে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে গ্রহণ করে বাংলার মুসলমান সর্বপ্রথম মুসলিম জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বর্ণ আরোপ করে। এটাই ক্রমশঃ 'বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদে' রূপান্তরিত হয়। এই সূত্রে সামাজিক-রাজ-নৈতিক নেতৃত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। শহরের উপর তলার সীমিত নেতৃত্ব লোপ পায়, শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্বের ধারা প্রবর্তিত হয়।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদেরা এদেশের সমাজ, ইতিহাস, নৃতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বাঙালী মুসলমানের জাতিতত্ত্ব ও আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। সেন্সাস রিপোর্টে বিচিত্র বিষয়ক পরিসংখ্যান ও তালিকা দেখে বাঙালী মুসলমানের আত্ম-জিজ্ঞাসা উৎসারিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মুসলমানদের দেশীয় নিম্ন বংশোদ্ভূত বলে মত প্রচার করেন। খন্দকার ফজলে রাব্বি 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) গ্রন্থে বাংলার মুসলমানের একটা বড় অংশ বিদেশাগত উচ্চ বংশজাত, সে সম্পর্কে অভিমত প্রচার করেন। ১৮৯৫ সালে লেখক স্বয়ং এর ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর অল্পকাল পরে বাংলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাঙালীর চিন্তায় বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এই আত্ম-পরিচয়ের অনুসন্ধিৎসা মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সহায়ক হয়।

বড় জ্যোতিষ্কের চারপাশে অনেক ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক বিরাজ করে। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী বড় জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তাঁদের অনুসারী ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক হিসাবে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁরা হলেন ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, নবাব সিরাজুল ইসলাম, নবাব সৈয়দ শামসুল হোদা, খন্দকার ফজলে রাব্বি, মির্জা সুজাত আলী বেগ, স্যার আবদুর রহিম, ব্যারি-স্টার আবদুর রসুল, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, আবদুল আজিজ বিএ, আবদুল করিম বিএ হেমায়েতউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, আলী নওয়াব চৌধুরী, আবদুল মজিদ চৌধুরী, আলিমুজ্জমান চৌধুরী প্রমুখ। তাঁরা প্রায় সকলেই নব্য শিক্ষিত এবং আধুনিক জীবনধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন।

তাঁরা শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতিব ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি চেয়েছেন। তাঁদের কারও নেতৃত্ব আঞ্চলিক, কারও আংশিক ছিল; তবে একথা ঠিক যে, তাঁরা স্বজাতির মৌলিক সমস্যার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের আঞ্চলিক প্রতিপত্তির কারণে তাঁদের আন্দোলন অধিক ফলপ্রসূ হয়েছে। উপরন্তু শহরের নেতৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হয় ও মফস্বলে প্রসার ঘটে। তাঁরা স্বসমাজের দুর্গতি ও অবনতিতে অধিকতর কাতর ছিলেন, এজন্য তাঁদের দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উর্ধে যেতে পারেনি। ব্রিটিশের আনুগত্য, হিন্দুর বিরোধিতা এবং স্বসমাজের স্বার্থ—এই ত্রিবিধ ধারায় তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম আবর্তিত হয়েছে।

যুক্তশক্তির মিলন ও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এযুগে বিভিন্ন ধরণের সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে। কলিকাতাস্থ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন দুটি প্রধান সংগঠন ছিল। সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলন সংগঠন দুটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানতঃ এ-দুটিরই আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় শহরে ও মফস্বলে একাধিক আঞ্জমন ও এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নব্য শিক্ষিত যুবকেরা এরূপ সংগঠনের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁরা উপরের অভিজাত ও ধনী এবং নিম্নের সাধারণ শ্রেণীকে এসব সংগঠনের মাধ্যমেই একত্রিত করেন এবং সমাজের অভিন্ন স্বার্থে উদ্বুদ্ধ করেন। অর্থাৎ এগুলির দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীব মানুষের মধ্যে মিলন-সেতু রচিত হয়েছে। সমকালীন সমস্যার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে এসোসিয়েশন ও আঞ্জমনগুলি বক্তৃতার আয়োজন করেছে, জনমত সৃষ্টি করেছে, চাঁদা সংগ্রহ করেছে, স্বপক্ষে-বিপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, প্রচার পত্র, পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি ও প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দাবী আদায়েব প্রশ্নে একের কণ্ঠের সাথে বহুর কণ্ঠ মিলে উচ্চকণ্ঠের সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবে সমাজের সংস্কার ও নবজাগরণের আন্দোলন জোরদার ও ক্ষুরধার হয়েছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালীর মাতৃভাষা যে বাংলা তা হাজার বছরের ইতিহাসের গতিধারায় প্রমাণিত হয়ে গেছে। উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা গদ্যের আবিষ্কার অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই চমকপ্রদ ও যুগোপযোগী ছিল। যন্ত্রশিল্পের মত গদ্যশিল্প সর্বস্তরে সমাজের সেবায় এসেছে। এক অর্থে গদ্যশিল্পের শক্তি অতুল, কেননা জীবনের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়ে। আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় বাংলা গদ্যের ব্যাপক ভূমিকার

কথা সকলেই স্বীকার করেন। মধ্যযুগে হিন্দুর মত বহু সংখ্যক মুসলমান কবির আবির্ভাব হলেও আধুনিক যুগে প্রবেশ করে মাতৃভাষা রূপে বাংলার স্বীকৃতি ও শিক্ষা-সাহিত্যে বাংলা গদ্যের ব্যবহারে অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা গেল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এরাই মধ্যমণি---সমাজের সংস্কার ও উন্নতির আন্দোলন এদের দ্বারাই সম্ভব হয়। হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যের চর্চা করে এসেছেন, মাতৃভাষার প্রশ্নে তাঁরা সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমান গদ্য লেখক ছিলেন না। দোভাষী পুঁথি মুসলমানের সাহিত্য-পিপাসা নিবৃত করলেও যেহেতু তা কৃত্রিম ছিল, সেহেতু সমাজে তার প্রভাব স্থায়ী ও উপযোগী হয়নি। শিক্ষিত লোকেরা উর্দুতে ও ফারসীতে শিক্ষাচর্চা ও শিল্পচর্চা করতেন, উপরন্ত তাঁদের চর্চার বিষয় ছিল প্রাচ্যমুখী ও প্রাচীনমুখী। বাংলা ভাষায় যাদের দখল ছিল, তারা উর্দু-ফারসী সম্পদ থেকে কোন জ্ঞান আহরণ করতে পারেনি। হিন্দুর রচিত শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-শাস্ত্রকথায় মুসলমানরা আকর্ষণ অনুভব করেনি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সুতরাং বাংলা গদ্যশিল্পের সামাজিক, বৈষয়িক, মানসিক উপযোগিতা থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে।

ব্রিটিশ শাসনকে মেনে নিয়ে এবং ইংরাজী ভাষা ও বিদ্যাকে গ্রহণ করে ভাগ্য-পরিবর্তন ও সমাজোন্নয়নের যে ধারা আবদুল লতিফ ও আমীর আলী শুরু করেছিলেন, মুসলিম লেখকগণ আধুনিক গদ্যের-পদ্যের চর্চায় সে-ধারা অব্যাহত রাখেন, তবে তাঁরা মাতৃভাষা হিসাবে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান ও বাংলাকে গ্রহণ করে সমাজ উন্নতির গতি বাস্তবমুখী ও সূচীমুখী করে তোলেন এবং জাতীয়তার প্রশ্নে সঠিক পথে এগিয়ে যান। তাঁরাই বাংলা ভাষায় জ্ঞানচর্চা, শিক্ষাচর্চা, শিল্পচর্চা করে বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদের বীজ প্রথম বপন করেন। ইংরজী ভাষা শিখে তাঁরা আধুনিক ভাবধারার সাথে পরিচিত হন এবং বাংলা চর্চা করে চিত্তের বিকাশ ও আত্মার উন্নতি সাধন করেন। মুসলমি জাতির জন্য এটা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলব্ধি।

একজন লেখক তাঁর রচনার মাধ্যমে পাঠকের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেন এবং তাঁর আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞানবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারেন। সেদিক থেকে লেখনি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে উঁচু ধরণের প্রতিভা বিরল ছিল। যাঁদের প্রধান লেখক রূপে চিহ্নিত করা যায়, তাঁরা কেউ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা অধিকাংশ গ্রামীণ মধ্যবিত্তের

সন্তান। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্র সম্পর্কে মুসলমান সমাজের একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। অনেকে মনে করেন যে, ওয়াহাবীরা আবেগোচ্ছ্বাসপূর্ণ সুকুমার শিল্পের বিরোধী ছিলেন। মুসলিম লেখকগণের কেউ কেউ এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে নাটক-নভেল-থিয়েটারের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা চিন্তাশীল রচনার প্রতি বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অনগ্রসর, অনুন্নত মুসলিম সমাজের জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তিপূর্ণ আলোচনাকে তাঁরা অধিক উপ-যোগী বলে মনে করেছেন। আত্ম-পরিচয় উদ্‌ঘাটনের ও নব জাতীয়তাবোধের উন্মেষের যুগে অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য-গৌরবকথার আবিষ্কার ও মূল্যায়ন হয়েছে বার বার। সমাজের অধঃপতনের কারণ এবং উন্নতির উপায় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সমকালের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি সব শ্রেণীর রচনায় কম-, বেশী এসব বিষয়ই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। এক কথায় মুসলিম লেখকগণের বাস্তব চেতনা ও গঠনমুখী ভূমিকা ছিল যার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে।

শহর ও মফস্বলের প্রধান-অপ্রধান লেখকের বিবিধ রচনার দ্বারা আত্মচেতনা দেশ-চেতনা, জাতীয়তা চেতনা ও যুগ চেতনা সম্প্রসারিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখের রচনায় উদারতার, প্রগতি-শীলতার লক্ষণ ছিল। মৌলবী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মুনশী মেহেরুল্লাহ মুনশী জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রধানতঃ রক্ষণশীল ছিলেন। কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুর রহিম, শেখ ফজলুল করিম, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী প্রমুখ মধ্যপন্থী ছিলেন। অধিকাংশ লেখক স্বসমাজের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রেখে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কামনা করেছেন। মুসলিম সমাজের চারদিকে যখন ঘোর অন্ধকার তখনই লেখকদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ ছাড়া বড় প্রতিভা আর কারও ছিল না। এজন্য মুসলমানের রচনায় উচ্চভাব, উচ্চ আদর্শের অভাব ছিল। ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ রচনা খুব কমই লেখা হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদের প্রতিভা ছিল, তবে সীমাবদ্ধতাও ছিল। উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নিম্ন মানের চাকুরীও করতেন নিম্ন মানের। তাঁরা মফস্বলবাসী ছিলেন। নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-ধারা ও মূল্যবোধ

সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা ছিল না। অথচ আধুনিক সাহিত্য মধ্যবিত্তের নাগরিক চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়েই গড়ে উঠে। অর্থাৎ আধুনিকী-করণ ও নগরায়ণ যে দুটি গুণ এযুগের ভাল সাহিত্যের জন্য আবশ্যক ছিল, তা তাঁদের ছিল না। এজন্য তাঁরা সফল সাহিত্য পাঠককে উপহার দিতে পারেননি। ন্যূন ও সাধারণ প্রতিভার মুসলিম লেখকদের সীমাবদ্ধতা আরও বেশী ছিল। সামাজিক ভাবে ও শ্রেণী হিসাবে পিছিয়ে থাকার কারণে মধু-হেম-নবীন-বঙ্কিম-দীন-দ্বিজ-রবীন্দ্রনাথের মত একজনও মুসলিম লেখকের আবির্ভাব হয়নি।

জনমত সৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাময়িকপত্র একটি ব্যয়বহুল যৌথশিল্প। এগুলি শুধু সমকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে মতামত তুলে ধরে না, সেই সাথে নিজস্ব মতাদর্শও প্রচার করে। বাংলা ভাষায় মুসলিম সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয় উনিশ শতকের নব্বই দশকে। দশ-পনের বছরে দৈনিক, অর্ধ-সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক আকারে প্রায় দু ডজন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। বেশীর ভাগ পত্রিকা ক্ষীণজীবী ও অনিয়মিত ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল দুটি---অর্থবলের ও জনবলের অভাব। এযুগে মুসলিম লেখক ও পাঠকের অভাব ছিল। প্রধানতঃ অশিক্ষা ও দারিদ্রের কারণে সাময়িক পত্র-শিল্পের বিকাশ ও প্রচার আশানুরূপ হয়নি। প্রধান-অপ্রধান অনেক লেখকই হয় সম্পাদক রূপে অথবা লেখক রূপে পত্রিকাগুলির সাথে জড়িত ছিলেন। সুতরাং লেখকদের আশা-আকাঙক্ষা, চিন্তা-চেতনা এবং পত্র-পত্রিকার আশা-আকাঙক্ষা, চিন্তা-চেতনা প্রায় অভিন্ন ছিল। আখবারে এসলামীয়া, ইসলাম-প্রচারক ইসলামপন্থী ছিল, সুধাকর, আহমদী, হিতকরী, হাফেজ, কোহিনুর, নবনূর, সোলতান মূলতঃ মধ্যপন্থী ছিল, তবে এগুলির উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। মুসলিম সাময়িকপত্রের এটি ছিল শৈশবকাল। শৈশবকালের দুর্বলতা ও সীমা-বদ্ধতা নিয়েও পত্রিকাগুলি মুসলিম সমাজের স্বার্থ তুলে ধরতে এবং জাতীয়তা-বোধ প্রচার করতে সহায়ক হয়েছে। এগুলি দেশ, সমাজ, জাতির হিতে, সম্মিলিত চেতনার সৃষ্টি করে জনজীবনে শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করেছে। একজন লেখক, একজন সমাজ সেবক একজন ধর্মনেতা, একজন বক্তা---সকলের কণ্ঠের মিলন হয়েছে এখানে।

লেখক-গবেষক-সাংবাদিক-শিক্ষাবিদ-রাজনীতিবিদ-সমাজসেবক-ধর্মনেতা-বক্তা কখন এককভাবে, কখন যৌথভাবে সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা-সাহিত্য ও রাজনীতি

প্রধানতঃ এই চারটি ধারায় তাঁদের চিন্তা ও চেতনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। জনজীবনে এসব ক্ষেত্রেই সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আধুনিক যুগে প্রবেশ করেও বাংলার মুসলিম সমাজ যুগের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে ক্রমশঃ অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়েছে। সমাজজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধর্মজীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আর্থিকজীবন বিধ্বস্ত, শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত, সাংস্কৃতিক জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট, রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন। জাতির এরূপ ভগ্নদশা ও দুরবস্থা থেকেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করে সমাজের ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলামীকরণের যে প্রক্রিয়া ওয়াহাবী আন্দোলনের মাধ্যমে চলছিল, নব্য সমাজ-সংস্কারকগণ তা সমর্থন করেন। তাঁরাও সমাজকে ও ধর্মকে কলুষমুক্ত করার আন্দোলন করেন। অনৈসলামিক রীতিনীতি ও অন্যান্য সামাজিক গলদের মধ্যে ছিল আশরাফ-আতরাফ শ্রেণীভেদ মান্য করা, বাল্যবিবাহ দেওয়া, বিধবাবিবাহ না দেওয়া, নারীর অবরোধ ও পর্দানশীলতার উপর কঠোরতা আরোপ করা, তালাকপ্রথা ও বান্দীপ্রথা টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি। নব্যপন্থীরা প্রায় সকলেই এসবের শরীয়ত বিরোধী ও অমানবিক দিকগুলির সংশোধন ও সংস্কার চেয়েছেন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা ভেবে কেউ কেউ সুদ গ্রহণ ও উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টন রীতির পুনর্বিবেচনা করতে বলেছেন। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ঐক্যের কারণে গো-হত্যা বন্ধের সপক্ষে মোশাররফ হোসেন রায় দিয়েছিলেন। গো-হত্যার পক্ষেও আন্দোলন হয়। এসব আলোচনা ও বিতর্কের মধ্য দিয়েই সমাজের স্থবিরতা দূরীভূত হয় এবং তদ্‌স্থলে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়।

শরীয়তী ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়েছে। প্রতিবেশী হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা রকম কুসংস্কার ও দেশাচার ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। মুসলমানরা কেবল হিন্দুর দেবদেবীর পূজায় ও লৌকিক মেলায় অংশ গ্রহণ করে না, তারা হিন্দুদের অনুসরণে পীরপূজা, কবরপূজা, মানত, মর্সিয়া তাজিয়া, শোক মিছিল ইত্যাদি শরীয়ত বহির্ভূত আচারও পালন করে। খ্রীস্টান পাদরী ও ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক থেকে নতুন করে আঘাত আসছে। তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন এবং মুসলমানকে তাঁদের ধর্মে দীক্ষিত করেন। ফকির-বাউলরাও ইসলামের পরিপন্থী আচরণ করত। এগুলি ছিল বহির্দ্বন্দ্ব। শিয়া-সুন্নি, হানাফী-মোহাম্মদীর মধ্যে ধর্মের ছোটখাট ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ ও অন্তর্বিরোধ ছিল। এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ও বিরোধ- বিতর্কের নিষ্পত্তি চেয়ে এযুগের ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে। মূল প্রবণতা ছিল শরীয়তের মূল

আদর্শে ফিরে যাওয়া। মূলনীতির পরিবর্তন বা সংস্কার ইসলামে অসম্ভব। ধর্ম প্রচারকগণ সে চেষ্টা করেননি। তাঁদের প্রধান ভূমিকা ছিল অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে ইসলামকে বিশুদ্ধ করা, অন্যের আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা এবং ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা। কেউ কেউ ধর্ম প্রচারের চেষ্টাও করেছেন। এসব কাজে কালক্ষেপ ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ বেশী হয়েছে, সাফল্যও বেশী অর্জিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার ভাষা, শিক্ষার বিষয়, শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করে এদেশের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার ধারায় সংকট সৃষ্টি করেন। সরকারী অনুদানে পরিচালিত মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষাপদ্ধতিতে মুসলমানরা অভ্যস্ত ছিল। ইংরাজী শিক্ষা ছিল ব্যয় বহুল। প্রধানতঃ ভাষাজ্ঞান দ্বারা চাকুরীজীবী অনুগত ও বশংবদ একটি মুৎসুদ্দি শ্রেণী সৃষ্টি করা ইংরাজী শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। দেশের লোককে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তোলার শিক্ষানীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেননি, ঔপনিবেশিক স্বার্থে সরকার তা গ্রহণ করতেও পারেন না। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। দারিদ্রের কারণে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষা গ্রহণও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। সরকারী-সওদাগরী চাকুরী বৈষয়িক উন্নতির প্রধান উপায় ছিল। হিন্দুগণ সময়মত ইংরাজী শিক্ষা লাভ করে এক্ষেত্রে অনেকদূর অগ্রসর হন। মুসলমানগণ জীবিকার কারণে শেষ পর্যন্ত ফারসীর মোহ ত্যাগ করে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সরকার সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধার প্রতি আকৃষ্ট হন। সনাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষার ও আধুনিক পদ্ধতির স্কুল-কলেজের শিক্ষার স্থান-বদল নিয়ে মুসলমানের শিক্ষা চিন্তার একটা মোটা অংশ ব্যয় হয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা একেবারে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। তাই মাদ্রাসা-শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখে আধুনিকীকরণের চেষ্টা হয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষা-সূচীতে ইংরাজী ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সরকারী সাহায্য বৃদ্ধি, বৃত্তি-বৃদ্ধি, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণ, মুসলমান ছাত্রের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা, নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে অন্দোলন হয়েছে। একটা শ্রেণী ইংরাজী ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যার বিরোধী ছিল। প্রধানতঃ ওয়াহাবীরা যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তখন থেকে একরূপ মনোভাবের উদ্ভব হয়।

খ্রীস্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচার এ ধর্মান্তরীকরণের নীতি দেশবাসীর মনে সন্দেহ বৃদ্ধি করে। অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকেই বাংলাকে শিক্ষা-চর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেননি। অথচ এদেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ-দুটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। তাই ফারসীর স্থলে ইংরাজীকে এবং উর্দুর স্থলে বাংলাকে শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যম করার আন্দোলন হয়েছে। এ-ব্যাপারে পুস্তক, পত্রিকা, সভা-সমিত, বক্তৃতামঞ্চ, স্মারকলিপি প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান হয়েছে। শেষের দিকে মানুষের মতিগতির পরিবর্তন হয় ও সমাজের অগ্রাভিযান শুরু হয়।

আধুনিক গদ্য ও পদ্যকে সামাজিক সংগঠনের কাজে মুসলিম লেখকগণ বেশী ব্যবহার করেছেন, এজন্য মননশীল ব্যবহারিক সাহিত্য অধিক রচিত হয়েছে, রসধর্মী সৃজনশীল রচনার সংখ্যা খুবই কম। অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে সংগ্রামরত জাতীয় চেতনা এরূপ রসধর্মী ও নান্দনিক সাহিত্য কর্মের বিপক্ষে ছিল। পচনশীল সমাজকে ইন্দ্রিয়োত্তেজক, ভাবাবেগ প্রধান নাটক-নভেল-থিয়েটার দ্বারা আর অধিক না পচানোর জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী পরামর্শ দেন। অনেকে মুসলিম সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন দ্বারা ইসলামী সাহিত্য অর্থাৎ জাতীয় ভাবধারা অবলম্বনে জাতীয় সাহিত্য রচনার কথা বলেছেন। ইসলামী ভাবাদর্শের অনুসরণে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সেগুলি পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করার আন্দোলনে একই মানসিকতার পরিচয় রয়েছে। আরবী-ফারসী-উর্দু অনুবাদে এবং ধর্ম-ইতিহাসাদি মৌলিক গ্রন্থে বিশ্ব-ইসলামের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। ইসলামের অতীত-বর্তমানের গৌরবময় কাহিনী, এমন কি, অলৌকিক বীরকাহিনী অবলম্বনে সাহিত্য রচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য জাতীয় চরিত্র গঠন দ্বারা সমাজ জীবনে উদ্দীপনা সঞ্চার। বাংলা ভাষায় আরবী-ফারসী-সংস্কৃত শব্দের ব্যবহাররীতি ও পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ঐ একই কারণে—হিন্দুয়ানি প্রভাব থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও জীবনধারার সাথে সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা। কেউ কেউ মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য কামনা করেছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদ এসব ধারণা থেকে জন্ম লাভ করেছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়ার্ধে এই রাজনীতির ধারা পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে যায়। আঞ্চলিক ও সাময়িক ছোটখাট বিদ্রোহ ছাড়া তিনটি বড় ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিদ্রোহ হয়েছে; সেগুলি হল ওয়াহাবী আন্দোলন,

ফারায়েজী আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ। ওয়াহাবী ও ফারায়েজী আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অঞ্চলভিত্তিক ছিল। ফারায়েজী আন্দোলন মূলতঃ বাংলা-দেশে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষক আন্দোলন ছিল। ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয়; গ্রাম-শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে ছিল। উভয়ই একান্ত-ভাবে মুসলমানের আন্দোলন ছিল; হিন্দুগণ আন্দোলনের সম্পূর্ণ বাইরে ছিলেন। আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ও ধর্মীয় চরিত্রের কারণেই এরূপটি হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ ছিল সর্বভারতীয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভু ও বঞ্চিত দেশীয় সিপাহীর মিলিত সংগ্রাম শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নব্য ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অংশগ্রহণ করেননি, এমন কি সমর্থনও দেননি। তাঁরা উল্টো ব্রিটিশকেই সমর্থন ও সাহায্য দান করেছেন। সরকার কঠোর হস্তে সিপাহী বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী আন্দোলন দমন করেন। এতে ব্রিটিশ-বিরোধী মুসলিম রাজনীতির সংগ্রামী ধারায় ছেদ পড়ে। মধ্যবিত্তের নব্য শিক্ষিতের নেতৃত্বে নিয়ম-তান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমান মধ্য-বিত্তের সামাজিক অবস্থান অভিন্ন হলেও শ্রেণীচরিত্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে মিলতে পারেননি, বরং কায়েমী স্বার্থরক্ষা ও সুবিধা আদায়ের জন্য পরস্পরের মধ্যে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব পোষণ করেছেন। ক্রমে তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের ভেদনীতির শিকার হয়ে পরস্পর বিবদমান শিবিরে পরিণত হয়েছেন। এর ফলে ক্রমেই এদেশের মাটিতে রক্ত-বর্ণ-ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতির আবরণে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম রাজনীতির স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল, যেমন জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ এবং প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্ব-মুসলিমবাদ। শাসক যদি বিধর্মী হন এবং ধর্ম পালনে বিরোধিতা করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ আছে। ধর্মযুদ্ধে মরলে শহীদ, জয়ী হলে গাজী— ইহলোকে ও পরলোকে উভয়ের সম্মান উচ্চে। একজন ধর্মবিশ্বাসী মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে আস্থা রাখতে পারেন না। ধর্মের কারণে এরূপ জেহাদী মনোভাব অন্য শ্রেণীর মধ্যে ছিল না। সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী প্রবর্তিত ও প্রচারিত বিশ্ব-মুসলিমবাদ ছিল উনিশ শতকের একটি নতুন রাজ-নৈতিক চেতনা। ইসলামের সাম্য সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা বিশ্ব-মুসলিম-বাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্ণ ও শ্রেণীবিভক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। গো-হত্যা ও গো-রক্ষার ব্যাপারেও উভয়

সম্প্রদায় একমত হতে পারেনি। হিন্দু মধ্যবিত্তের ও মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ সমকালে সমতালে সমমানে এবং সমপরিমাণে না হওয়ার দরুন সরকারী সুযোগ-সুবিধা লাভের ও ভোগের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জেগে উঠে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিন্নমুখী ও ভিন্নগামী হয়। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিতে ঐক্য স্থাপিত হয়নি। বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ এসবের মধ্যে নিহিত আছে। নেতৃত্ব বদল ও নেতৃত্বের প্রকৃতি বদল এযুগের মুসলিম রাজনীতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপুটাশ্রিত এই রাজনীতিতে সংগ্রামীচেতনা ও স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল না। মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে পরিচালিত রাজনীতিতে সম্প্রদায়গত সংহতি স্থাপিত হয় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে যৌথ-চেতনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

পূর্বাপর সামগ্রিক আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, এযুগের বাংলার মুসলিম সমাজ নানা ভাবদ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গেছে। সমাজ সচেতন একটি শ্রেণীর চেষ্টায় আধুনিক ধারার প্রবর্তন হয়েছে। অবশ্যই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা এসব আন্দোলন বিপ্লবাত্মক ছিল না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির চিন্তা ও চেতনা না থাকায় রেনেসাঁস সম্ভব হয়নি। এযুগের আন্দোলনের মূল প্রবণতা ছিল সংস্কার সাধন, বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা দেশের সার্বিক মুক্তি সাধন নয়। ঔপনিবেশিক শাসননীতি ও অর্থনীতিতে এরূপ পরিবর্তন সম্ভবও নয়। ধর্মীয় চিন্তা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির আলোকে মুসলিম সমাজের যে আংশিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আমরা তাকে 'মুসলিম নবজাগরণ' বলেছি।

পরিশিষ্ট-১

গ্রাজুয়েট-তালিকা (১৮৫৭-১৯০৫)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।[১]

বিএ (অনার্স) ও এমএ

১৮৬৮	আমীর আলী	ইতিহাস	হুগলী কলেজ
১৮৭১	আলী রেজা খান	আরবী	আগ্রা ,,
১৮৭৭	আমজাদ আলী	,,	বেনারস ,,
	আশরাফ আলী	,,	,, ,,
	রাজা হোসেন	ফারসী	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
১৮৮২	হাসমত উল্লাহ	আরবী	,, ,,

এমএ

১৮৮৫	গোলাম হায়দার খান	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৬	আবদুর রহিম	,,	,, ,,
	আবদুস সামাদ	,,	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
১৮৮৭	আহমদ	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ কল্লন	ফারসী	শিক্ষক
	মুবারক হোসেন	,,	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
১৮৮৮	মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী ,,
	আজিজুর রহমান খান	,,	ম্যুইর সেন্ট্রাল ,,
১৮৮৯	মোহাম্মদ আব্বাস আলী	,,	প্রেসিডেন্সী ,,
	সোহরাওয়ার্দী জাহাদুর রহিম জাহিদ	ফারসী	প্রাইভেট
	সৈয়দ শামসুল হুদা	,,	,,
১৮৯০	মোহাম্মদ মোস্তফা খান	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আশফাক হোসেন	ফারসী	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
১৮৯১	শাহ বাহাদুর আলী	আরবী	এম. এ. ও. ,,
	গোলাম গাউস	ফারসী	প্রেসিডেন্সী ,,

১. তালিকাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত *The Calendar for the year 1920*, Part II, vol. 1 (Calcutta, 1932) গ্রন্থের সাহায্যে সংকলিত।

১৮৯২	মোহাম্মদ আজিজুল হক	ইংরাজী	প্রাইভেট
	সৈয়দ কল্লন	আরবী	শিক্ষক
	নূর বক্স	,,	এম. এ. ও. কলেজ
	এম. মঈনুদ্দীন আহমদ	ফারসী	প্রাইভেট
১৮৯৪	দাউদ ভাই	আরবী	,,
	কমর আলী	,,	,,
	এস. এম. খলিল আহমদ	ফারসী	,,
	মোহাম্মদ আখতার	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯৫	মোহাম্মদ আমীর	আরবী	প্রাইভেট
	শেখ আহসানানুল্লাহ	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল মজিদ	,,	,, ,,
	এ. কে. ফজলুল হক	গণিত	,, ,,
১৮৯৬	শেখ বাহারাম আলী	ইংরাজী	,, ,,
	এম. নিজামুদ্দীন আহমদ	ফারসী	প্রাইভেট
১৮৯৭	নাসিরুদ্দীন আহমদ	ইংরাজী	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	আবু নসর মোহাম্মদ ওহিদ	আরবী	প্রাইভেট
	জিয়াউদ্দীন আহমদ	গণিত	এম. এ. ও. কলেজ
১৮৯৮	আনিসুজ্জামান খান	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী ,,
	সোহরাওয়ার্দী আবদুল্লাহ মামুন	আরবী	প্রাইভেট
	আলফাজউদ্দীন আহমদ	গণিত	জেনেরাল এ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশন
১৮৯৯	ফিদা আলী খান	আরবী	এম. এ. ও. কলেজ
	মোহাম্মদ নাসরুল্লাহ খান	ফারসী	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	আবু আহমদ আবদুল বাসিত	ফারসী	শিক্ষক
১৯০০	মোহাম্মদ ইকবাল	আরবী	প্রাইভেট
	মোহাম্মদ জলিল	ফারসী	শিক্ষক
	সৈয়দ আবদুল কাদির	,,	,,
	আবদর রহমান মাহমুদ	,,	প্রাইভেট

	আবদুল মজিদ	ন্যাচুরাল এণ্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৯০১	আবদুল হাসান খান চৌধুরী	ইংরাজী	,, ,,
	আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইসহাক	আরবী	পাটনা ,,
	সৈয়দ আমীর আলী	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী ,,
১৯০২	সৈয়দ আতা হোসেন	ফারসী	প্রাইভেট
	নাসিরুদ্দীন আহমদ	,,	,,
	মোহাম্মদ রাজা খান	,,	পাটনা কলেজ
১৯০৩	কামালউদ্দীন আহমদ	আরবী	প্রাইভেট
	মোস্তাফিজুর রহমান	ফারসী	,,
	কামালউদ্দীন আহমদ	,,	,,
	সৈয়দ মুন্সী কাজিম	,,	,,
	সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হাসান	,,	,,
১৯০৪	মোহাম্মদ হাসান জান	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবু মোহাম্মদ মাহফুজ	ফারসী	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	আলী আহমদ	,,	প্রাইভেট
	আবুল মোহাম্মদ রশীদ	,,	,,
	এ এফ এম আবদুল আলী	,,	,,
১৯০৫	আকরামুজ্জামান খান	,,	,,
	মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ	,,	,,

বিএ (অনার্স)

১৮৮৫	তাবরেজ আলী	গণিত	হুগলী কলেজ
১৮৮৬	আহমদ	ইংরাজী	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আবদুস সামাদ	,,	,, ,,
	আবদুর রহিম	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আজমত আলী ফিরোজ	,,	ম্যুইর সেন্ট্রাল ,,
	মোহাম্মদ হোসেন আজমী	,,	,, ,,
	আবদুল করিম	,,	প্রেসিডেন্সী ,,
	আবদুস সামাদ	,,	পাটনা ,,

	জহুরুল হক	ইংরাজী	ঢাকা	কলেজ
	সোহরাওয়ার্দী জাহাদুর রহিম জাহিদ	ফারসী	,,	,,
	মুবারক হোসেন	,,	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	হাফিজ ইবাদুল্লাহ	,,	আগ্রা	,,
	মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	,,	পাটনা	,,
১৮৮৬	আবদুল মজিদ	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী	,,
	মোহাম্মদ আজিজ মির্জা	,,	এম. এ. ও.	,,
	মোহাম্মদ হাসান	,,	পাটনা	,,
	মোহাম্মদ সুলতান আলম	,,	প্রেসিডেন্সী	,,
	আবদুল মজিদ	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	,,	,,
	সৈয়দ ওয়াহিদউদ্দীন আহমদ	ফারসী	হুগলী	,,
	সৈয়দ কল্লন	,,	এম. এ. ও.	,,
	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	,,	সিটি	,,
	সৈয়দ আজিজুল হাসান	,,	পাটনা	,,
	মোহাম্মদ নাসিম	আরবী	ক্যানিং	,,
	মোহাম্মদ আজিজ মির্জা	ইতিহাস	এম. এ. ও.	,,
১৮৮৮	আব্বাস আলী	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী	কলেজ
	আব্বাস আলী	মেন্টাল এণ্ড মোয়াল সান্সে	,,	,,
	মোহাম্মদ শাখাওয়াৎ হোসেন	ফারসী	বেরেলী	,,
	সৈয়দ আহমদ আলী	,,	পাটনা	,,
	মঈন ভাই আবদুল হোসেন	গণিত	জব্বলপুর	,,
১৮৮৯	মোহাম্মদ মোস্তফা খান	ইংরাজী	পাটনা	,,
	সৈয়দ গালিব হোসেন	,,	,,	,,
	মোহাম্মদ আজিজুল হক	গণিত	প্রেসিডেন্সী	,,
	মাহবুবুব রহমান	সংস্কৃত	,,	,,
	অশফাক হোসেন	ফারসী	,,	,,
১৮৯০	গোলাম গাউস	,,	,,	,,
	শেখ মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	,,	পাটনা	,,

	শাহাবুদ্দীন খান	ফারসী	সেন্ট জেভিয়ার্স কলে:	
	এইচ এস ই করিম	,,	,,	,,
	এস জেড আহমদ	,,	,,	,,
	আলিমুদ্দীন আহমদ	,,	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৯১	আবদুল কাদির	ইংরাজী	,,	,,
	জামিল আখতার	ফারসী	পাটনা	,,
	শেখ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	,,	,,	,,
	ওয়াসি আহামদ	,,	প্রেসিডেন্সী	,,
	মোহাম্মদ জহুর আলম	,,	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন	
	সৈয়দ আবদুল মালেক	ইতিহাস	রাজশাহী কলেজ	
১৮৯২	ওয়ালি মোহাম্মদ	ইংরাজী	পাটনা	,,
	মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	,,	প্রেসিডেন্সী	,,
	ফজিলত হোসেন	ফারসী	পাটনা	,,
	ওয়ালি মোহাম্মদ	,,	,,	,,
	এহসান আলী	,,	প্রেসিডেন্সী	,,
	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	,,	পাটনা	,,
	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	গণিত	,,	,,
১৮৯৩	আফজর রহমান	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী	,,
	মোহাম্মদ আখতার	ফারসী	পাটনা	,,
	আবু ইমাম ফজলুর রহমান	,,	হুগলী	,,
	শেখ জলিল আহমদ	,,	পাটনা	,,
	সৈয়দ মোহাম্মদ নকি	,,	,,	,,
	সৈয়দ ইজহার হোসেন	,,	,,	,,
১৮৯৪	আবদুল মজিদ	ইংরাজী	পাটনা	কলেজ
	নুরুদ্দীন আহমদ	,,	প্রেসিডেন্সী	,,
	এ কে ফজলুল হক	গণিত	,,	,,
	মতলব আহমদ খান চৌধুরী	,,	,,	,,
	মোহাম্মদ আমীর	আরবী	টি এন জুবিলী কলেজ	
	আবদুল মজিদ	ফারসী	পাটনা	,,
	এস এ মোহাম্মদ আবদল বরকত	,,	,,	,,

	এ কে ফজলুল হক	ফিজিকস ও কেমিস্ট্রি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯৫	সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	ফারসী	,, ,,
	আবদুল আজিজ খান	,,	হিসলপ ,,
	আবদুল মজিদ	,,	শিক্ষক
	ওয়ালি আজম	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আলফাজুদ্দীন আহমদ	গণিত	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন
১৮৯৬	নাসিরুদ্দীন আহমদ	ইংরাজী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল করিম	,,	জেনেরাল এ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশন
	জাহাদুর রহিম	গণিত	সিটি কলেজ
	আবদুল বারি	ফারসী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবু নসর মোহাম্মদ আলী	ফিজিকস ও কেমিস্ট্রি	,, ,,
১৮৯৭	আনিসুজ্জামান খান	ইংরাজী	পাটনা ,,
	সাদাত আলী খান	সংস্কৃত	ঢাকা ,,
	আবু নসর মোহাম্মদ ওহিদ	আরবী	শিক্ষক
	মইনুল হক	ফারসী	টি এন জুবিলী কলেজ
১৮৯৮	সোহরাওয়ার্দী আবদুল্লাহ আল মামুন	ইংরাজী	ঢাকা ,,
	,,	আরবী	,, ,,
	আবু আহমেদ আবদুল বাসিত	ফারসী	,, ,,
	মোহাম্মদ জলিল	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	মীর মোহাম্মদ করিম	,,	বি এন কলেজ (বাঁকিপুর)
	আবদুল হাফিজ	,,	,, ,,
	মোহাম্মদ নসিরুল্লাহ খান	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ তাহারত করিম মালিক	,,	বি এন ,,
	শামসুদ্দীন হায়দার	,,	প্রেসিডেন্সী ,,
১৮৯৯	সৈয়দ আবদুল লতিফ	দর্শন	ঢাকা ,,
	আবদুর রহমান মাহমুদ	ফারসী	,, ,,
	মোহাম্মদ আলী হাক্কানী	,,	শিক্ষক

	আবদুর রউফ	ফারসী	শিক্ষক
	মোহাম্মদ নাসিরুল হক	,,	,,
	শেখ সিরাজুদ্দীন আহমদ	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ নুরুল হাসান	,,	বি এন ,,
	আবদুল মজিদ	ফিজিকস ও কেমিস্ট্রি	ঢাকা ,,
১৯০০	মোহাম্মদ ইরফান	আরবী	শিক্ষক
	সৈয়দ মোহাম্মদ ইয়াকুব	ফারসী	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আমীর আলী	,,	প্রেসিডেন্সী ,,
	তাজাম্মল আলী	,,	ঢাকা ,,
	আবদুল মজিদ	,,	টি এন জুবিলী কলেজ
	আলাউদ্দীন আহমদ	,,	,, ,,
	আমীর হোসেন	,,	পাটনা ,,
	আবদুল হাকিম	,,	,, ,,
	সৈয়দ আমীর আলী	দর্শন	প্রেসিডেন্সী ,,
১৯০১	সালেহ আহমদ	ইংরাজী	,, ,,
	নাসিরুদ্দীন আহমদ	ফারসী	টি এন জুবিলী ,,
	আবদুল মজিদ	,,	প্রেসিডেন্সী ,,
	আবদুল হামিদ	,,	টি এন জুবিলী ,,
	আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইসহাক	,,	পাটনা ,,
	মোহাম্মদ আবদুল গণি	,,	হিসলপ ,,
১৯০২	আবদুল মজাফফর আহমদ	ইংরাজী	ঢাকা ,,
	কামালউদ্দীন আহমদ	আরবী	প্রেসিডেন্সী ,,
	সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হোসেন	ফারসী	পাটনা ,,
	মোহাম্মদ রাজা করিম	গণিত	,, ,,
১৯০৩	মোহাম্মদ হানিফ	ইংরাজী	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	আবদুল গাফফার	,,	প্রেসিডেন্সী ,,
	আবদুল নাঈম	ফারসী	টি এন জুবিলী ,,
	সৈয়দ খালেক রহমান	,,	পাটনা ,,
১৯০৪	আবুল হাসনাত মোহাম্মদ হাই	,,	ঢাকা ,,
	আবু মোহাম্মদ মহফেজ	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,

	আলী আহমদ	ফারসী	শিক্ষক
	আমানত হোসেন	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	,,	বি. এন. ,,
	আবুল আলী মোহাম্মদ চৌধুরী	,,	শিক্ষক
১৯০৫	নাজিরুদ্দীন আহমেদ	ইংরাজী	ঢাকা কলেজ
	এম এইচ আহমদ সোহরাওয়ার্দী	ফারসী	পাটনা ,,
	সৈয়দ হাসান আসকারী	,,	,, ,,
	সৈয়দ আবু তাহের	,,	হুগলী ,,
	আবদুর রহমান	,,	পাটনা ,,
	নাজিরুল হক	,,	শিক্ষক

বিএ (পাশ)

১৮৬১	আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৬৫	মহম্মদ দায়েম	,, ,,
১৮৬৬	আবদুল আজিজ	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
১৮৬৭	আমির আলী	হুগলী ,,
	মহম্মদ ইউসুফ	প্রেসিডেন্সী ,,
	সুরজাত ইসলাম	ঢাকা ,,
	সৈয়দ হোসেন	প্রেসিডেন্সী ,,
১৮৬৮	আহমদ হামিদুদ্দিন	শিক্ষক
	ওবেদুর রহমান	বহরমপুর ,,
১৮৬৯	ফজল কাদির	প্রেসিডেন্সী ,,
	মহম্মদ ওয়াজেদ	শিক্ষক
১৮৭০	আবদুল বারি	ক্যাথেড্রল মিশন ,,
	মহম্মদ আলী রেজা খান	আগ্রা ,,
১৮৭১	মমতাজ আহমদ	রিপন ,,
১৮৭৩	আবদুল খায়ের	হুগলী ,,
	আবদুল খালেক	,, ,,
	সৈয়দ মুজহার ইমাম	পাটনা ,,
১৮৭৪	ফজল রসুল	বেরেলী ,,
	ফজুল্লা এম এন	ম্যুইর সেন্ট্রাল ,,
	সৈয়দ আলী আশরাফ	পাটনা ,,

১৮৭৫	আহমদ হাসান খান	বেরেলী	কলেজ
১৮৭৬	রাজা হোসেন	,,	,,
১৮৭৭	আবুল ফজল	শিক্ষক	
	আমজাদ আলী	বেনারস	,,
	আশরাফ আলী	,,	,,
	ইজাদ বক্স	হুগলী	,,
	নিজামউদ্দীন হাসান	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	সাঈদ ফয়জুদ্দীন হোসেন	,,	,,
	সৈয়দ খয়রাত আহমদ	শিক্ষক	
	তসলিমউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৭৮	ফজলুল করিম	হুগলী	,,
	মজহারুল আনোয়ার	,,	,,
	সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন	,,	,,
১৮৮০	ফরিদউদ্দীন আহমদ	হুগলী	কলেজ
	মহম্মদ ইসমাইল	পাটনা	,,
	সৈয়দ মহম্মদ ফজল হক	,,	,,
	করিমউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	ওমর বক্স	লাহোর	,,
১৮৮১	আলী আহমদ	পাটনা	,,
	আমজাদ আলী	,,	,,
	এইচ এম আবদুল গণি	হুগলী	,,
	হাসমতুল্লাহ	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	সৈয়দ আহমদ আলী	পাটনা	,,
১৮৮২	মহম্মদ শফি	লাহোর	,,
১৮৮৩	আবদুর রহমান	হুগলী	,,
	আবদুর রব চৌধুরী	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	ফজলুল করিম	ঢাকা	,,
	হাফাজত করিম	পাটনা	,,
	ওয়াজিদ হোসেন	,,	,,

১৮৮৪	আবদুল হাকিম	পাটনা কলেজ
	আবদুল জব্বার	হুগলী ,,
	আবদুল জওয়াদ	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আবদুল লতিফ	এম. এ. ও. কলেজ
	আবদুল মজিদ	ঢাকা ,,
	আসগর আলী খান	পাটনা ,,
	গোলাম হায়দার খান	,, ,,
	মহম্মদ আইনুল হক	,, ,,
	মহিবুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	রিয়াজুদ্দীন	ম্যুইর সেন্ট্রাল ,,
	সমিরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	সাজ্জাদ হোসাইন	এম. এ. ও. ,,
	সঈদ হোসাইন	,, ,,
	শামসুল হুদা	প্রেসিডেন্সী ,,
	সৈয়দ আহমদ হোসেন	পাটনা ,,
	সৈয়দ ইউসুফ আলী	,, ,,
	সৈয়দ ওয়াজির হোসেন	,, ,,
	একিনউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,
১৮৮৫	আবদুর রহিম	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আহমদ হাসিম খান	এম. এ. ও. কলেজ
	বজলুর রহিম	ঢাকা ,,
	ইমতিয়াজ আলী	ক্যানিং ,,
	লুৎফর রহমান	হুগলী ,,
	মহম্মদ আজিমুদ্দীন	ম্যুইর সেন্ট্রাল ,,
	মহম্মদ ইব্রাহিম	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	মহম্মদ ওয়াজির আহমদ	বেনারস ,,
	তবরেজ আলী	হুগলী ,,
১৮৮৬	আবদুল হক	শিক্ষক
	আবদুল করিম	প্রেসিডেন্সী ,,
	আবদুল ওয়াজিদ	ঢাকা ,,
	আবদুর রহমান	প্রেসিডেন্সী ,,

	আবদুস সামাদ	পাটনা	কলেজ
	আবদুস সামাদ	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন	
	আহমদ	প্রেসিডেন্সী	কলেজ
	আজমত আলী ফিরোজ	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	হাফিজ ইবাদুল্লাহ	আগ্রা	,,
	হেদায়েতউদ্দীন আহমদ	ঢাকা	,,
	মহম্মদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	মির্জা ওয়াহিদ আলী বেগ	ক্যানিং	,,
	মোবারক হোসেন	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	মহম্মদ হাবিবুল্লাহ	পাটনা	,,
	মহম্মদ হোসাইন আজমি	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	মহম্মদ ইসফাক	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন	
	মহম্মদ ইসরাইল	প্রেসিডেন্সী	কলেজ
	নাজির হোসেন	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন	
	সোহরাওয়ার্দী জাহাদুর রহিম জাহিদ	ঢাকা	কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ আলী	এম. এ. ও.	,,
	ওয়াজির আহমদ	বেরেলী	,,
	ইয়াওয়ার হোসেন খান	পাটনা	,,
	জহুরুল হক	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৮৭	আবদুল মকারম	,,	,,
	আবদুল আজিজ	শিক্ষক	
	আবদুল আজিজ খান	হুগলী	কলেজ
	আবদুল মজিদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	আলমদার হোসেন	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	আলি মহম্মদ	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন	
	আলিম-উজ-জমান	হুগলী	কলেজ
	আজিজুর রহমান খান	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	কবিরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	মাশুক আলি	এম. এ. ও.	,,
	মির্জা কালব আলী বেগ	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	মহম্মদ আবদুল্লাহ	সিটি	,,
	মহম্মদ আজিজ মির্জা	এম. এ. ও.	,,

	মহম্মদ হাসান	পাটনা	কলেজ
	সৈয়দ আজিজুল হাসান	,,	,,
	সৈয়দ কল্লন	এম. এ. ও.	,,
	শাহেনশাহ হোসেন রিজভি	ক্যানিং	,,
	ওয়াহিদউদ্দীন আহমদ	হুগলী	,,
	জিল্লুর রহমান	শিক্ষক	
	মহম্মদ নাসিম	ক্যানিং	কলেজ
	মহম্মদ সুলতান আলম	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৮৮	আবদুল হামিদ	শিক্ষক	
	আহমদউল্লাহ	প্রেসিডেন্সী	কলেজ
	আলী হাসান	পাটনা	,,
	এস. রিয়াজউদ্দীন কাজী	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	ইজাদ বকস	হুগলী	,,
	মিঁয়াভাই আবদুল হোসেন	জব্বলপুর	,,
	মির্জা বেদার বখত্	হুগলী	,,
	মহম্মদ আব্বাস	প্রেসিডেন্সী	,,
	মহম্মদ হাসান	ঢাকা	,,
	মহম্মদ মুঘল আলম	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	সামসুজ্জোহা	পাটনা	,,
	এস এম ইসহাক	ম্যুইর সেন্ট্রাল	,,
	সৈয়দ গোলাম দরবেশ	পাটনা	,,
	সৈয়দ মহমদুল হাসান	আগ্রা	,,
	সৈয়দ মুহম্মদ মুফতাব	,,	,,
	ওয়ালিয়ার রহমান	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৮৯	আবদুল মহম্মদ	,,	,,
	আমির আলী	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	আসফাক হোসেন	প্রেসিডেন্সী	,,
	ফজলুল হক	রিপন	,,
	ইজাহার হোসেন	পাটনা	,,
	খলিলুদ্দীন আহমদ	জব্বলপুর	,,
	খলিলুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,

	খলিলুর রহমান	পাটনা	কলেজ
	মাহবুবুর রহমান	প্রেসিডেন্সী	,,
	মনিরুদ্দীন হায়দার	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	মনজির, এম	বিশপ	,,
	মহম্মদ শওকত হোসেন	বেরেলী	,,
	মোফাখারুল ইসলাম	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	মহম্মদ আজিজুল হক	প্রেসিডেন্সী	,,
	সৈয়দ গালিব হোসেন	পাটনা	,,
	সৈয়দ গণি হায়দার	,,	,,
	সৈয়দ করম হোসেন	,,	,,
	মহম্মদ হাবিবুল্লাহ	প্রেসিডেন্সী	,,
	মহম্মদ মুস্তফা খান	পাটনা	,,
	মহম্মদ তাহের	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	সৈয়দ আবদুল মাহমুদ	পাটনা	,,
	সৈয়দ আবদুল মালিক	রাজশাহী	,,
১৮৯০	আবদুল আজিজ	প্রেসিডেন্সী	,,
	আবদুল গাফফার খান	পাটনা	,,
	আবদুল হামিদ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	আবদুল লতিফ	হুগলী	,,
	আফসারউদ্দীন মহম্মদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	আলি করিম	,,	,,
	আলিমুদ্দীন আহমদ	,,	,,
	এনায়েত করিম	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	ফখরুদ্দীন আহমদ	পাটনা	,,
	গোলাম গউস	প্রেসিডেন্সী	,,
	হাবিবুল্লাহ কাদের ভাই এম	জব্বলপুর	,,
	মির্জা ওয়াজারাত হোসেন	শিক্ষক	
	এম. মঈনউদ্দীন	সেন্ট জেভিয়ার্স	কলেজ
	মকবুল আলী	ঢাকা	,,

	কসীমুদ্দীন খান	পাটনা কলেজ
	সঈদ আবদুল গাফফার	র্যাভেনশ ,,
	শাহাবউদ্দীন খান	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	শেখ মহম্মদ আবদুল মজিদ	পাটনা ,,
	সৈয়দ আলী হাসান	হুগলী ,,
	এস. জেড. আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	তাজাম্মল আলি	র্যাভেনশ ,,
	ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
১৮৯১	আবদুল হামিদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	আবদুল কাদির	,, ,,
	এ এস এইচ হোসেন	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	জামিল আখতার	পাটনা ,,
	মির্জা মহাম্মদ ফসিহ	,, ,,
	মহম্মদ জহির	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	মহম্মদ জহুর আলম	,, ,,
	সা'দ আবদুল ফজইল	প্রেসিডেন্সী ,,
	শেখ মহম্মদ আবদুল হাকিম	পাটনা ,,
	সৈয়দ আবদুল সালেক	রাজশাহী ,,
	সৈয়দ আলি মজাহার	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	ওয়াসি আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,
১৮৯২	আসফ খান	,, ,,
	এহসান আলি	,, ,,
	গোলাম মহম্মদ	,, ,,
	কামালউদ্দীন	পাটনা ,,
	এম চয়নউদ্দীন	রাজশাহী ,,
	মহম্মদ আবদুল্লাহ	পাটনা ,,
	মহম্মদ মহিবুর রহমান	,, ,,
	মহম্মদ খান	শিক্ষক
	মহম্মদ ইউসুফ আলী	প্রেসিডেন্সী কলেজ

	সংখাত আলি	সেন্ট জেভিয়ার্স	কলেজ
	সৈয়দ আবদুল মজিদ	,,	,,
	সৈয়দ আলী আশরাফ	প্রেসিডেন্সী	,,
	সৈয়দ মহম্মদ হোসেন	পাটনা	,,
	সৈয়দ নুরুল হাসান	,,	,,
	ওয়ালি মহম্মদ	,,	,,
১৮৯৩	আবদুল আজিজ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	আবদুল আজিজ	ঢাকা	,,
	আবদুল হামিদ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	আবদুল মকসুদ	,,	,,
	আবদুর রহিম	প্রেসিডেন্সী	,,
	আবু ইমাম ফজলুর রহিম	হুগলী	,,
	আফজাবর রহমান	প্রেসিডেন্সী	,,
	আমিনুল ইসলাম	,,	,,
	আতাই এলাহী	হুগলী	,,
	এইচ এম আবদুল গণি	পাটনা	,,
	মহম্মদ আখতার	,,	,,
	মহম্মদ সোলায়মান	হুগলী	,,
	সৈয়দ মোহসীন আলী	,,	,,
	শাহামত হোসেন	টি এন জুবিলী	,,
	শেখ কাদের বক্স	শিক্ষক	
	শেখ খলিল আহমদ	পাটনা	,,
	সৈয়দ জয়নুদ্দীন	বি এন	,,
	তালাতুফ হোসেন	ঢাকা	,,
	ওয়াহিদুন নবি	সিটি	
	এস এম ফজলুর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	সৈয়দ আতা হোসেন	পাটনা	
	সৈয়দ ইজাহার হোসেন	,,	,,
	সৈয়দ মহম্মদ ইসমাইল	,,	,,
	সৈয়দ মহম্মদ নকী	,,	,,
১৮৯৪	আবদুল গফুর	,,	,,

	আবদুল হাদি	মরিস	কলেজ
	আবদুল কাসিম	প্রেসিডেন্সী	,,
	আবদুল মালেক	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	আবদুল মাজেদ	পাটনা	,,
	এ কে ফজলুল হক	প্রেসিডেন্সী	,,
	আলাউদ্দীন আহমদ	ঢাকা	,,
	আনোয়ার করিম	পাটনা	,,
	হাবিব আহসান	,,	,,
	মজিবুর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	মাসুদুল হোসেন	,,	,,
	মহম্মদ সাদউদ্দীন	পাটনা	,,
	মহম্মদ আমির	টি. এন. জুবিলী ইনস্টিটিউশন	
	মহম্মদ ইয়াসিন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ	
	মতলব আহমদ খান চৌধুরী	প্রেসিডেন্সী	,,
	নাজিরুল হক	পাটনা	,,
	নুরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	এম.এ. মুহম্মদ আবদুল বরকত	পাটনা	,,
	শেখ আহসানুল্লাহ	প্রেসিডেন্সী	,,
	শেখ বাহারাম আলি	পাটনা	,,
	শেখ মহম্মদ ইসমাইল	মেট্রোপলিটন	,,
	ওসমান আলি	প্রেসিডেন্সী	,,
	সৈয়দ আবদুল হায়াত	পাটনা	,,
	সৈয়দ আলি মহসিন	শিক্ষক	
	সৈয়দ হোসেন আলি	প্রেসিডেন্সী	,,
	সৈয়দ খালিক বকস	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	জহিরুল হক	শিক্ষক	
১৮৯৫	আবদুল আজিজ খান	হিসলপ	,,
	আবদুল গণি	রিপন	,,
	আবদুল মজিদ	শিক্ষক	
	আবদুল ওয়াদুদ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	আবরার হোসেন	সিটি	,,

	আলফাজউদ্দীন আহমদ	এফ.সি. অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ	
	মহম্মদ এসকান্দর আলি	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	মহম্মদ আবদুস সামাদ	,,	,,
	মহম্মদ শামস্সুজ্জোহা	এফ.সি. অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ	
	পি. মহিউদ্দীন	বিশপ	,,
	শেখ আমিরুদ্দীন আহমদ	সিটি	,,
	শেখ ওয়াহেজুদ্দীন	প্রেসিডেন্সী	,,
	সৈয়দ আবদুল কাদির	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	সৈয়দ খায়ের আলি	,,	,,
	সৈয়দ খলিল আহমদ	পাটনা	,,
	জিয়াউন নবি	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	সৈয়দ মহম্মদ আবদুল্লাহ	প্রেসিডেন্সী	,,
	ওয়ালি আজম	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
১৮৯৬	আবদুল আজিজ খান	হিসলপ	,,
	এ. মজিদ খান	,,	,,
	আবদুল আজিজ খান	টি.এন. জুবিলী	,,
	আবদুল গাফফার বারি	প্রেসিডেন্সী	,,
	আবদুর রাজ্জাক	পাটনা	,,
	আলি আকবার	ঢাকা	,,
	খাজা এম. ইসমাইল	পাটনা	,,
	মহম্মদ মুসলেহউদ্দীন	,,	,,
	মহম্মদ সাদউদ্দীন	,,	,,
	মহম্মদ আবদুল মমিন	প্রেসিডেন্সী	,,
	মহম্মদ আল মামুন	ঢাকা	,,
	মহম্মদ মুস্তফা খান	হিসলপ	,,
	নাসিরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী	প্রেসিডেন্সী	,,
	সোহরাওয়ার্দী মহম্মদ অল মামুন	ঢাকা	,,
	তসাদ্দক হোসাইন	পাটনা	,,
	ওয়ায়েজুল হক	,,	,,
	বিলায়েত হোসেন	এম.এ.ও.	,,

	জাহাদুর রহিম জাহিদ	সিটি কলেজ
	জকিউদ্দীন আহমদ	জেনেরাল এসেমব্লি ইনস্টিটিউশন
১৮৯৭	আবদুল হামিদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	আসগর আলি	রিপন ,,
	আনিসুজ্জামান খান	পাটনা ,,
	আসাদুজ্জামান	প্রেসিডেন্সী ,,
	ফয়েজনর আলি	,, ,,
	লুৎফর রহমান	সিটি ,,
	মইনুল হক	টি.এন. জুবিলী ,,
	মহম্মদ ইসমাইল	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	রেজা করিম আহমদ	,, ,,
	সাদদ আবদুল মাসুদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	সাদাত আলি খান	ঢাকা ,,
	শরাফত আলি খান	,, ,,
১৮৯৮	আবদুল হাফিজ	বি.এন. ,,
	আবদুল হাকিম	,, ,,
	আবু আহমদ আবদুল বাসিত	ঢাকা ,,
	আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল জব্বার	,, ,,
	আতাউর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	দলিলউদ্দীন আহমদ	রিপন ,,
	দলিলুর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	এলাহ নওয়াজ খান	প্রেসিডেন্সী ,,
	হামিদুর রহমান	ঢাকা ,,
	মহম্মদ জলিল	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	মহম্মদ নসরুল্লাহ খান	,, ,,
	মহম্মদ আকবর আলি	ঢাকা ,,
	মহম্মদ ইরফানউল্লাহ	শিক্ষক
	মহম্মদ সাঈদ	পাটনা ,,
	মীর মহম্মদ করিম	বি.এন. ,,
	মির্জা শেগুফতা বখ্‌ত	প্রেসিডেন্সী ,,
	মহিউদ্দীন আহমদ	পাটনা ,,

	এস.এ. সামাদ	পাটনা	কলেজ
	শামসুদ্দীন হায়দার	প্রেসিডেন্সী	,,
	সোহরাওয়ার্দী আবদুল্লাহ আল মামুন	ঢাকা	,,
	সৈয়দ তাহাইরত করিম মালিক	বি.এন.	,,
	জিয়াউল হক	র‍্যাভেনশন	,,
১৮৯৯	আবদুর মজিদ	ঢাকা	,,
	আবদুর রউফ	শিক্ষক	
	আবদুর রাজ্জাক	পাটনা	,,
	আবদুর রহমান মাহমুদ	ঢাকা	,,
	আবদুর রশিদ	পাটনা	,,
	আ ুল হাসেম খান চৌধুরী	প্রেসিডেন্সী	,,
	মহম্মদ মাওলা বকস	,,	,,
	মহম্মদ আসগর আলি	হিসলপ	,,
	মহতাবউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	মোশারফ হোসেন	হুগলী	,,
	মহম্মদ নাসিরুল হক	শিক্ষক	
	মহম্মদ আবদুস সুবাহান খান	হিসলপ	,,
	মহম্মদ আলি হক্কানী	শিক্ষক	
	মহম্মদ ইমাদউদ্দীন	রাজশাহী	,,
	মহম্মদ মুসা	বি.এন.	,,
	মহম্মদ শাফী	পাটনা	,,
	নজবত হোসাইন	,,	,,
	ফুকন আলি	সিটি	,,
	কামরুদ্দীন আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	শেখ সিরাজুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	শামসুদ্দীন আহমদ	রিপন	,,
	সৈয়দ আবদুল লতিফ	ঢাকা	,,
	সৈয়দ আলি মাহদী	পাটনা	,,
	সৈয়দ দিলাওর আলি	র‍্যাভেনশন	,,
	সৈয়দ নুরুল হোসেন	বি.এন.	,,

	ওয়ারাসত হোসেন	পাটনা	কলেজ
	জহিরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
১৯০০	আবদুল হাকিম	পাটনা	,,
	আবদুল হাসনাত সৈয়দ	,,	,,
	আবদুল মজিদ	টি.এন. জুবিলী	,,
	আবদুল মোয়াইদ খান	ঢাকা	,,
	আলাউদ্দীন আহমদ	টি.এন. জুবিলী	,,
	আলি আকবর	প্রেসিডেন্সী	,,
	আলি আসগর	সিটি	,,
	আমির হোসেন	পাটনা	,,
	আবদুস শুকুর	,,	,,
	আমিরুদ্দীন মণ্ডল	সিটি	,,
	জালালউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
	কাজি ইমদাদুল হক	,,	,,
	খবিরউদ্দীন আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	মহম্মদ গোলাম কাদির	প্রেসিডেন্সী	,,
	মফিজুর রহমান	পাটনা	,,
	মহম্মদ আসসাদ	রাজচন্দ্র	,,
	মহম্মদ হানিফ	হুগলী	,,
	মহম্মদ ইরফান	শিক্ষক	
	মহম্মদ ইসহাক	পাটনা	,,
	মহম্মদ ওমর খান	,,	,,
	মহম্মদ সাঈদ	,,	,,
	মোশাররফ হোসেন	বঙ্গবাসী	,,
	শেখ দাউদ	হিসলপ	,,
	শোজনত আলি	হুগলী	,,
	সৈয়দ আমির আলি	প্রেসিডেন্সী	,,
	সৈয়দ মহম্মদ সাজিরুদ্দীন	পাটনা	,,
	সৈয়দ মহম্মদ রশিদ	প্রাইভেট	
	সৈয়দ মহম্মদ ইয়াকুব	পাটনা	,,
	সৈয়দ রশিদন নবি	হুগলী	,,

	তাজাম্মল আলি	ঢাকা কলেজ
	ওয়াসিমুদ্দীন আহমদ	রাজশাহী ,,
১৯০১	আবদুল আজিজ	পাটনা ,,
	আবদুল হামিদ	টি.এন. জুবিলী ,,
	আবদুল মজিদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	আবুল খায়ের মহম্মদ ইশহাক	পাটনা ,,
	আহমদ আলি	প্রেসিডেন্সী ,,
	আলতাফ করিম	পাটনা ,,
	ইতরাম হোসেন	র‍্যাভেন্‌শ ,,
	খাদেম রসুল	ঢাকা ,,
	খাজা মহম্মদ নূর	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন	রিপন ,,
	মহম্মদ আবু সঈদ	এফ.সি. অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	মহম্মদ আবদুল গণি	হিসলপ ,,
	মহম্মদ আকবর	শিক্ষক
	মহম্মদ ফজলুল করিম	ঢাকা ,,
	নসিরউদ্দীন আহমদ	টি.এন. জুবিলী ,,
	সালেহ আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	সাইদুর রহমান	,, ,,
	এস. সইফুদ্দীন আহমদ	হুগলী ,,
	সৈয়দ ইজহার আল হোসাইন	প্রেসিডেন্সী ,,
	সৈয়দ মোজাফফরউদ্দীন হোসেন	,, ,,
	সৈয়দ রাহাত হোসেন	টি.এন. জুবিলী ,,
১৯০২	আবদুল গফুর	ঢাকা ,,
	আবদুল খালেক	রাজচন্দ্র ,,
	আবদুস সাত্তার	ঢাকা ,,
	আবদুল ওয়াহিদ	রাজচন্দ্র ,,
	আবদুর রহমান খান	রাজশাহী ,,
	এ.এফ.এম. মাহমুদ	রিপন ,,
	আমির হামজা	টি.এন. জুবিলী ,,

	আতোয়ার রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আজিমউদ্দীন আহমদ	,, ,,
	বাশারউদ্দীন আবুল তাহের খন্দকার	রিপন ,,
	কামালউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,
	করম নওয়াজ	,, ,,
	মকবুল হোসেন	শিক্ষক
	মহম্মদ ইব্রাহিম খান	রিপন ,,
	মহম্মদ রাজা করিম	পাটনা ,,
	মহম্মদ ইসহাক	ঢাকা ,,
	মহম্মদ আবদুল বরকত	পাটনা ,,
	মহম্মদ শাহাবুদ্দীন খান	টি.এন. জুবিলী ,,
	মোস্তাফিজুর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	মোস্তাফিজুর রহমান	,, ,,
	সৈয়দ মুসা কাজিম	পাটনা ,,
	শেখ আলি করিম	জি. বি. বি. কলেজ
	সৈয়দ আবদুল্লাহ অল মুসওয়াহিয়ুল কাদি	প্রেসিডেন্সী ,,
	সৈয়দ মহম্মদ আলি হাসান	পাটনা ,,
১৯০৩	আবদুল গাফফার	প্রেসিডেন্সী ,,
	আবদুল নাঈম	টি.এন. জুবিলী ইনস্টিটিউশন
	আবুল মহম্মদ রশিদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	এ.এফ. এম. আবদুল আলি	ডভটন ,,
	আজিজুর রহমান	সিটি ,,
	লুৎফর রহমান	রিপন ,,
	মহম্মদ আজিজুর রহমান	ঢাকা ,,
	মুহম্মদ আমজাদ	রাজশাহী ,,
	মুহম্মদ হায়দার আলি	,, ,,
	মুহম্মদ হাম্দি	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,
	মুহম্মদ হাসান জান	পাটনা ,,
	নুরুল হোসেন হাজারকা	সেন্ট জেভিয়ার্স ,,

	রশিদউদ্দীন মহম্মদ	সিটি	কলেজ
	এস. মহম্মদ তাহির	এফ.সি. অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ	
	সৈয়দ আইজউদ্দীন আহমদ	হিসলপ	,,
	সৈয়দ খলিলুর রহমান	পাটনা	,,
	সৈয়দ মহম্মদ করিম	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	সৈয়দ মুজাফফর হোসেন শফি	হিসলপ	,,
	সৈয়দ তাহিরউদ্দীন আহমদ	বি.এন.	,,
	সৈয়দ ওয়াসি আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	তৌহিদুল হাসান	জি.বি.বি.	,,
১৯০৪	আবদুল হাসনাত মহম্মদ আবদুল হাই	ঢাকা	,,
	আবু আলি মহম্মদ চৌধুরী	শিক্ষক	
	আবু মহম্মদ মহফুজ	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	আকরামুজ্জামান খান	প্রেসিডেন্সী	,,
	আলি আহমদ	শিক্ষক	
	আমানত হোসেন	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	এ.এম. হোসামউদ্দীন হায়দার	প্রেসিডেন্সী	,,
	দীন মুহম্মদ শেখ	,,	,,
	খুরশাদ হোসেন	সেন্ট জেভিয়ার্স	,,
	মহম্মদ মহসিন	বি.এন.	,,
	মহম্মদ ইয়াকুব	টি.এন. জুবিলী	,,
	সমিরউদ্দীন ভূঁইয়া	ঢাকা	,,
	সৈয়দ মহম্মদ অবদুল জব্বার	বি.এন.	,,
	সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন	ঢাকা	,,
	সৈয়দ নাজিরউদ্দীন	বি.এন.	,,
	সৈয়দ ওয়াজির হায়দার	,,	,,
১৯০৫	আবদুল গাফফার খান	শিক্ষক	
	আবদুল্লাহ	ঢাকা	,,
	আবদুর রহিম	প্রেসিডেন্সী	,,
	আবদর রহমান	পাটনা	,,

	আবু মুহম্মদ	পাটনা	কলেজ
	কাজি আবদুল ওয়াহাব	রিপন	
	খলিলুর রহমান	প্রেসিডেন্সী	,,
	মহম্মদ ইব্রাহিম	রিপন	,,
	মহম্মদ নাজির আলম	পাটনা	,,
	মহম্মদ ইয়াসিন আলি	সেণ্ট জেভিয়ার্স	,,
	মোবারক আলি	প্রেসিডেন্সী	,,
	মহম্মদ নুরহানুল হক	সেণ্ট জেভিয়ার্স	,,
	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ	প্রেসিডেন্সী	,,
	মুহম্মদ আবদুর রশিদ	ঢাকা	,,
	মুহম্মদ হাসান	পাটনা	,,
	মুহম্মদ জামিল আহমদ	,,	,,
	মুহম্মদ সা'দউল্লাহ	প্রেসিডেন্সী	,,
	নাজিরুদ্দীন আহমদ	ঢাকা	,,
	নাজিরুল হক	শিক্ষক	
	পজিরুদ্দীন আহমদ	রিপন	,,
	রেজা করিম	বি.এন.	,,
	এস.এইচ. আহমদ সোহরাওয়ার্দি	পাটনা	,,
	শেখ ইমাম আলি	রিপন	,,
	সৈয়দ আবু মহামেদ	বি.এন.	,,
	সৈয়দ আবু তাহের	হুগলী	,,
	সৈয়দ হাসান আসকারি	পাটনা	,,
	সৈয়দ মাহবুবর রহমান	ঢাকা	,,
	সৈয়দ ওয়াসিক আলি	ব্যাভেনসা	
বিএল			
১৮৬৯	আমির আলি	হুগলী	,,
	ওবায়দুর রহমান	বহরমপুর	,,
১৮৭১	মহম্মদ ওয়াজেদ	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৭২	আবদুল বারি	,,	,,
১৮৭৩	সিরাজুল ইসলাম	ঢাকা	,,
১৮৭৪	মহম্মদ দায়েম	প্রেসিডেন্সী	,,

১৮৭৫	সৈয়দ মাজহার ইমান	প্রেসিডেন্সী	কলেজ
১৮৭৯	ইজাদ বকস	,,	,,
	সৈয়দ খায়রেদ আহমদ	পাটনা	,,
১৮৮০	বজলুল করিম	ঢাকা	,,
	মজহার-উল আনোয়ার	হুগলী	,,
১৮৮১	নিজামুদ্দীন হাসান	ক্যানিং	,,
১৮৮২	মির্জা মহম্মদ ইসরাইল	পাটনা	,,
	তসলিমউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৮৩	আলি আহমদ	পাটনা	,,
	তকরিমুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী	,,
১৮৮৫	ফজলল করিম	ঢাকা	,,
	সৈয়দ মহম্মদ হোসেন	বিপন	,,
	ওয়াজিদ হোসেন	পাটনা	,,
১৮৮৬	আবদুল মজিদ	ঢাকা	,,
	আসগর আলি খান	পাটনা	,,
	গোলাম হায়দার খান	সিটি	,,
	হিম্মত আলি	ঢাকা	,,
	মহিউদ্দীন আহমদ	সিটি	,,
	মহম্মদ আইনুল হক	পাটনা	,,
	সৈয়দ আহমদ হাসান	,,	,,
	সৈয়দ ওয়াজির হোসেন	,,	,,
	একিনুদ্দীন আহমদ	সিটি	,,
১৮৮৭	আবদুল হামিদ	পাটনা	,,
	আবদুল জওয়াদ	সিটি	,,
	আবদুর রহিম	সিটি	,,
	রিয়াজুদ্দীন আহমদ	সিটি	,,
১৮৮৮	আবদুল জব্বার	রিপন	,,
	আবদুল সামাদ	পাটনা	,,
	মহম্মদ ইশফাক	মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন	
১৮৮৮	সমিরুদ্দীন আহমদ	সিটি	,,
	সৈয়দ নাজির হোসেন	মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন	

	ইয়াওয়ার হোসেন খান	রিপন	কলেজ
১৮৮৯	আবদুর রহমান	রাজশাহী	,,
	এস. ডব্লিউ. হোসেন	রিপন	,,
	মহম্মদ ইউসুফ আলি	সিটি	,,
১৮৯০	আবদুল আজিজ খান	রিপন	,,
	লুৎফর রহমান	পাটনা	,,
	মহম্মদ	রিপন	,,
	মির্জা বেদার বখত্	হুগলী	,,
	এম. মনজুর	সিটি	,,
	ওয়ালুর রহমান	ঢাকা	,,
	জাহাদুর রহিম জাহিদ	রিপন	,,
	জহুরুল হক	ঢাকা	,,
১৮৯১	মহম্মদ আজিজুল হক	হুগলী	,,
	মহম্মদ হাবিবুল্লাহ	সিটি	,,
	মহম্মদ মুস্তাফা খান	রিপন	,,
	আবদুল ওয়াজিদ	ঢাকা	,,
	আলি করিম	পাটনা	,,
	এফ. রিয়াজউদ্দীন কাজী	রিপন	,,
	হেমায়েত উদ্দীন আহমদ	ঢাকা	,,
	মাহবুবর রহমান	রিপন	,,
	মনিরুদ্দীন হায়দার	টি.এন. জুবিলী	,,
	সৈয়দ আলি বিলগ্রামী	পাটনা	,,
	সৈয়দ গালিব হোসেন	,,	,,
	সৈয়দ গণি হায়দার	,,	,,
১৮৯২	আহমদউল্লাহ	রিপন	,,
	আসিব আলি	সিটি	,,
	ফখরুদ্দীন	পাটনা	,,
	ইজাদ বকস	হুগলী	,,
	মহম্মদ তাহির	রিপন	,,
	শেখ মহম্মদ আবদুল মজিদ	পাটনা	,,
	সৈয়দ আলি হাসান	টি.এন. জুবিলী	,,

	সৈয়দ গোলাম দরবেশ	পাটনা	কলেজ
১৮৯৩	জামিল আখতার	,,	,,
	এস.ই. করিম	,,	,,
	সৈয়দ মহম্মদ হাসান	,,	,,
১৮৯৪	ফজিলত হোসেন	,,	,,
	ওয়াজি মহম্মদ	ইউনিভার্সিটি ল'	,,
	ওয়াসি আহমদ	সিটি	,,
১৮৯৫	মহম্মদ আখতার	বিপন	,,
	মহম্মদ জহিব	,,	,,
১৮৯৬	আবদুল খালেক	,,	,,
	ইজহার হোসেন	পাটনা	,,
	মহম্মদ আবদুল্লাহ	বি.এন.	,,
	মজিবর রহমান তরফদার	বিপন	,,
	মহম্মদ আমির	বি.এন.	,,
	মহম্মদ আসফ খান	সিটি	,,
	নুরুদ্দীন আহমদ	রিপন	,,
	সৈয়দ আবদুল মজিদ	সিটি	,,
	সৈয়দ নুরুল হাসান	রিপন	,,
	ওয়াহিউদ্দীন আহমদ	,,	,,
	শেখ কাদির বকস	টি.এন. জুবিলী	,,
	শেখ মহম্মদ আবদুল হাকিম	সিটি	,,
	শেখ মহম্মদ ইসমাইল	বি.এন.	,,
	শেখ ওসমান আলি	সিটি	,,
	শামসুল হক	,,	,,
১৮৯৭	আবদুল মজিদ	বি.এন.	,,
	এ.কে. ফজলুল হক	রিপন	,,
	হফাজাত করিম	পাটনা	,,
	কামালউদ্দীন	বি.এন.	,,
	মহম্মদ ইসরাইল খান	রেঙ্গুন	,,
	মফাখ্খারুল ইসলাম	রিপন	,,
	নাসিরুল হক	পাটনা	,,

	সংঘাত আলি	রিপন কলেজ
	শাহাদাত হোসেন	টি.এন. জুবিলী ,,
	সৈয়দ আজিজুল হাসান	পাটনা ,,
	সৈয়দ খায়ের আলি	সিটি ,,
	সৈয়দ খালিক বকস	,, ,,
১৮৯৮	আনোয়ার করিম	পাটনা ,,
	খাজা এম.সইদউদ্দীন	রিপন ,,
	শাহবুদ্দীন খান	,, ,,
	শেখ বাহারাম আলি	,, ,,
	ইউসুফ মহম্মদ	পাটনা ,,
১৮৯৯	আবদুর রাজ্জাক	মেদিনীপুর ,,
	আমিনুল ইসলাম	রিপন ,,
	আসাদজ্জামান	ঢাকা ,,
	নাসিরুদ্দীন আহমদ	রিপন ,,
	সৈয়দ আলি মহসিন	মেদীনীপুর ,,
	সৈয়দ ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	রিপন ,,
	জোহাদুর রহিম জাহিদ	সিটি ,,
১৯০০	আবদুল করিম	ঢাকা ,,
	আসগর আলি	রাজচন্দ্র ,,
	লুৎফর রহমান	রিপন ,,
	মহম্মদ ইয়াসিন	,, ,,
	মহম্মদ ইসমাইল	ঢাকা ,,
	সৈয়দ জয়নুদ্দীন	বি.এন. ,,
১৯০১	আনিসুজ্জামান খান	,, ,,
	হাসিবুদ্দীন আহমদ	রিপন ,,
	মহম্মদ জলিল	হুগলী ,,
	মহম্মদ ইরফানুল্লাহ	রাজশাহী ,,
	নাজাবত হোসেন	সিটি ,,
	শামসুদ্দীন আহমদ	বঙ্গবাসী ,,
	ওয়াজুল হক	পাটনা ,,
	ওয়ারাসাত হোসেন	বি.এন. ,,

১৯০২	আবদুল আজিজ খান	টি.এন. জুবিলী	কলেজ
	আবদুল হাদি	মরিস	,,
	আবদুল হাফিজ	বি.এন.	,,
	আবদুল হাকিম	রিপন	,,
	আলি আকবর	,,	,,
	মির্জা শেখ ওফ্‌তা বখত	,,	,,
	মহম্মদ শফি	বি.এন.	,,
	মুশারফ হোসেন	বঙ্গবাসী	,,
	আবদুল মজিদ	রিপন	,,
	সাদাত আলি খান	ঢাকা	,,
১৯০৩	আবদুল হামিদ	রিপন	,,
	খাজা মহম্মদ নূর	,,	,,
	মহম্মদ ইব্রাহিম হাসান	বঙ্গবাসী	,,
	মহম্মদ আসগর আলি	মরিস	,,
	এস.এ. মহম্মদ এ. বরকত	বি.এন.	,,
	সৈয়দ মহম্মদ ইয়াকুব	বঙ্গবাসী	,,
১৯০৪	আবদুল গণি	সিটি	,,
	আবদুল সাত্তার	রিপন	,,
	আবদুল শকুর	বঙ্গবাসী	,,
	এ.এফ. মাহমুদ	রিপন	,,
	আবাউদ্দীন আহমদ	টি.এন. জুবিলী	,,
	মহিউদ্দীন আহমদ	বি.এন.	,,
	মহম্মদ আবদুল সামাদ	রিপন	,,
	মহম্মদ এমাদুদ্দীন	বঙ্গবাসী	,,
	মহম্মদ ওমর খান	বি.এন.	,,
	মকবুল হোসেন	রিপন	,,
	মীর মহম্মদ করিম	বি.এন.	,,
	আমীর হোসেন	রিপন	,,
	এলাহি নওয়াজ খান	রাজচন্দ্র	,,
	ফয়জনূর রহমান	রিপন	,,
	সাইদর রহমান	,,	,,

	শেখ জোহাদুর রহমান	টি..এন. জুবিলী কলেজ
	শেখ আলি করিম	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ জামির আলি	রিপন কলেজ
	ওয়াসিমউদ্দীন আহমদ	রাজশাহী কলেজ
১৯০৫	মহম্মদ আবদুল বরকত	বি.এন. কলেজ
	মইনুল হক	টি.এন. কলেজ
	মহম্মদ হাসান জান	রিপন কলেজ
	মহম্মদ নাসিরুল হক	টি.এন. জুবিলী কলেজ
	আলতাফ করিম	পাটনা কলেজ
	আমির হামজা	বি.এন. কলেজ
	সৈয়দ রাহাত হোসেন	টি.এন. জুবিলী কলেজ

এম.বি.

১৮৭৮	সৈয়দ হোসেন	মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা

লাইসেনসিয়েট ইন ল

১৮৬৯	বারি ফজলল	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৭৩	আবদুল্লাহ ফয়েজ	,, ,,
	ফজলুল কাদির	,, ,,
	গোলাম আলতাফ	হুগলী ,,
	হামিদউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,

এম.এল.এস.

১৮৭১	লুৎফর কবির	মেডিক্যাল কলেজ, কলিকাতা
	জলনুর আলি আহমদ	,, ,,
	জুহর উদ্দীন	,, ,,
১৮৭২	আকবর খান	,, ,,
১৮৭৪	আবদুস রাজ্জাক	,, ,,
১৮৭৮	আসদর আলি	,, ,,
	ফজলুর রহমান	,, ,,
১৮৮৯	সাউদর রহমান	,, ,,
১৮৯২	আবদুর হামিদ	,, ,,
১৯০০	শাহজাহান আলি	,, ,,

	এল.এম. হাবিবুর রহমান	মেডিকেল কলেজ	কলিকাতা
	সৈয়দ মহম্মদ আফজল	”	”
১৯০২	আবদুল গফুর	”	”
১৯০৪	আবদুল সাত্তার খান	”	”
	মহম্মদ ইসমাইল খান	”	”
	সৈয়দ আলি হাসান	”	”
	খলিলউদ্দীন আহমদ	”	”

বি.ই.

১৯০০	তোফাজ্জল আহমদ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	কলেজ
১৯০৩	এস.এস. আবদুল আজিজ	”	”

এল.ই.

১৮৯০	আবদুর রহমান	”	”

(খ)

সেণ্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন
'চাঁদাদাতা সদস্যবৃন্দ ১৮৮৩'[১]

আলী আহমদ	কলিকাতা
আলী আহমদ	কলিকাতা
আলী বকস, হাজি, মোক্তার	কলিকাতা হাই কোর্ট
আলী করিম, জমিদার	ত্রিপুরা
আলী মোহাম্মদ	কলিকাতা
আলী নকি, সৈয়দ	কলিকাতা
আজম হোসেন, সৈয়দ	কলিকাতা

কলিকাতা সদর ও বাংলার মফস্বলে যাঁদের ঠিকানা আছে, কেবল তাঁদের নাম গৃহীত হয়েছে। বাংলার বাইরে যাঁদের ঠিকানা আছে, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এঁরা সকলে বাঙালী নাও হতে পারেন, আবার বাইরে যাঁদের ঠিকানা আছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালী থাকতে পারেন।

১ *Report of the Committee of the Central National Muhammadan Association* for the past 5 years (adopted unanimously at a General meeting of the Association, held on the 15th April, 1883), pp. 16-30.

আবদুল আউয়াল	কলিকাতা
আবদুল আজিজ, খাজা	কলিকাতা
আবদুল বারি, মোহাম্মদ, সব-রেজিস্ট্রার	আমতা
আবদুল গফুর, সব-রেজিস্ট্রার	ফুলবাড়িয়া, দিনাজপুর
আবদুল গাফফার	আহমদগঞ্জ, বরিশাল
আবদুল হালিম,, ব্যারিস্টার	কলিকাতা
আবদুল করিম, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বাকরগঞ্জ
আবদুল কাদের, মোহাম্মদ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নড়াইল, যশোহর
আবদুল লতিফ আহমদ	কলিকাতা
আবদুল নঈম	ঢাকা
আবদুল ওয়াহাব, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট,	জলপাইগুড়ি
আবদুল ওয়াহিদ	কলিকাতা
আবদুল ওয়াহিদ, তালুকদার	পটুয়াখালি, বাকরগঞ্জ
আবদুল ওয়াহাব, মোক্তার	করিলকাতা হাইকোর্ট
আবদুল্লাহ দগমান	কলিকাতা
আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ, অনুবাদক	কলিকাতা. হাইকোর্ট
আবদুল্লাহ আরব	কলিকাতা
আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহিদ	কলিকাতা
আবদুল্লাহ খান, চৌধুরী	চট্টগ্রাম
আবুল হাসান	কলিকাতা মাদ্রাসা
আবুল হাসান, খান, ব্যারিস্টার	কলিকাতা হাইকোর্ট
আবুল খায়ের, প্রফেসর	কলিকাতা মাদ্রাসা
আবদুর রাজ্জাক, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
আবদুর রহমান	শ্রীহট্ট
আবদুর রহমান মূসা	কলিকাতা
আবদুর রহমান, সৈয়দ	ব্যারিস্টার কলিকাতা
আবদুর রব, সৈয়দ, জমিদার	শায়েস্তাবাদ
আবদুস সামাদ, শেখ	কলিকাতা
আবদুস সামাদ	কলিকাতা
আবদুস সালাম	কলিকাতা
আদিলউদ্দীন, মোহাম্মদ	নারায়ণপুর, ফরিদপুর

আফতাবউদ্দীন, মোহাম্মদ,	উকিল ত্রিপুরা
আহমদ, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
আহমদ	কলিকাতা
আহমদ, কাজী, সৈয়দ, খান বাহাদুর, বিদেশী অফিস, কলিকাতা	
আলীমউদ্দীন	কলিকাতা
আহসানউল্লাহ, খান বাহাদুর,	নবাব ঢাকা
আজিজুল বারি	কলিকাতা
আজিজুর রহমান আহমদ খান,	সব-রেজিস্ট্রার, ত্রিপুরা
আজিমুদ্দীন	কলিকাতা
আমানত-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
আমীর আলী, সৈয়দ	কলিকাতা
আমীর হোসেন, সৈয়দ, খান বাহাদুর, ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট, কলিকাতা	
আমীরউদ্দীন, প্রিন্স	চুঁচুড়া
আনোয়ার আলী, পেস্কার	কলিকাতা হাইকোর্ট
আরিফর রহমান	ত্রিপুরা
আশরাফউদ্দীন, উকিল	ঐ
আশরাফউদ্দীন আহমদ,	মতওল্লী, হুগলী
আসমত আলী খান চৌধুরী	জমিদার বাকরগঞ্জ
আসমত জাহ বাহাদুর, প্রিন্স	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
আজমল-উদ-দৌলা বাহাদুর	ঐ কলিকাতা
আওলাদ হোসেন, সৈয়দ,	সব-রেজিস্ট্রার শ্রীনগর, ঢাকা
বদিউল আলম, মোহাম্মদ	জমিদার, চট্টগ্রাম
বদরুদ্দীন হায়দার	কলিকাতা
বজলুর রহমান	শিক্ষক, কলিকাতা মাদ্রাসা
বজলুর রহমান	পুলিশ ইনস্পেক্টর, মালদহ
বজলুল হক, জমিদার	ত্রিপুরা
বাকের, মির্জা মোহাম্মদ সিরাজী	কলিকাতা
বশীরুদ্দীন, প্রিন্স	,,
দীন মোহাম্মদ	,,
একরাম আলী খান, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
বজলর রহমান খান	কলিকাতা হাইকোর্ট

বজলুর রহমান, ডাক্তার	কলিকাতা
বজলুর রাশেদ, পুলিশ অফিসের কেরানী	কলিকাতা
ফজলুল করিম	বিদেশী অফিস কলিকাতা
ফজলুল করিম	মালদহ
ফজলুল করিম, জমিদার	ঢাকা
ফজলুল করিম, খান বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম	
ফয়জুদ্দীন হোসেন, খান বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ময়মনসিংহে	
ফররুক শাহ, মোহাম্মদ, প্রিন্স	টালিগঞ্জ, কলিকাতা
ফয়জুন্নেসা, খাতুন, চৌধুরানী.	জমিদার, হামনাবাদ, ত্রিপুরা
ফলক-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
গোলাম নবি খান, মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
গোলাম বারি	কলিকাতা
গোলাম সরোয়ার, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
হামিদ বকত, খান বাহাদুর	শ্রীহট্ট
হামিদ-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
হাবিবুদ্দীন আহমদ. পুলিশ ইনস্পেক্টর.	মালদহ
হাসান ইসমাইল	কলিকাতা
হেদায়েত হোসেন, মীর মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
ইকরাম রসুল, খান বাহাদুর,	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট. মালদহ
ইজ্জত-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
ইব্রাহিম হোসেন, মোহাম্মদ, জমিদার	ত্রিপুরা
ইমদাদ আলী, কোর্ট সব-ইনস্পেক্টর	চট্টগ্রাম
জান মোহাম্মদ কাজিম	কলিকাতা
জাফর ইস্পাহানি, মোহাম্মদ	,,
জাহান কাদের, মির্জা, প্রিন্স	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
কমরউদ্দীন আহমদ খান বাহাদুর	কলিকাতা
কমর কাদের, প্রিন্স	খিদিরপুর কলিকাতা
করিম বকস	কলিকাতা
কুদরতুল্লাহ, হেড ক্লার্ক, ক্যান্টনমেন্ট	ম্যাজিস্ট্রেট রাণীখেত
কুদরতুল্লাহ, শেখ	কলিকাতা
খোদা বকস	

খুরশেদ কাদের, সৈয়দ, ইস্কান্দার মির্জা	মুর্শিদাবাদ
লতাফত হোসেন, শাহ, মীর, মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
লুৎফুর রহমান, ব্যারিস্টার	কলিকাতা
মওলা বকস	বর্ধমান
মজাফফর আহমদ, জমিদার	নোয়াখালী
মজাফফর হোসেন, সৈয়দ	শায়েস্তাবাদ, বরিশাল
মজহাবুল ইসলাম, কোর্ট ইনস্পেক্টর	বরিশাল
মজহারুল হক, ক্লার্ক, পুলিশ অফিস	কলিকাতা
মজিদ বখত, খান বাহাদুর,	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীহট্ট
মমতাজউদ্দীন আহমদ, উকিল	যশোহর
মোফাজ্জল-উল-ইসলাম, কাজী, উকিল	গোয়ালপাড়া
মুনস্সুরম-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
মুস্তাফা হোসেন, সৈয়দ, খান বাহাদুর,	জজকোর্ট, কুষ্টিয়া
মুকসুদ আলী, শেখ	দালটনগঞ্জ
মজিরুদ্দীন আখন্দ	,,
নফিজুদ্দীন আহমদ. হেডক্লার্ক	মাগুড়া, যশোহর
মর্তুজা, আগা সৈয়দ	কলিকাতা
মুসা আলী	,,
মাহমুদ খুলজি	,,
মেহেদী হাসান, মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
মোহাম্মদ আলী, নবাব মীর, জমিদার	পদমদী, ফরিদপুর
মোহাম্মদ, খান বাহাদুর	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, ত্রিপুরা
মোহাম্মদ আখতার, কাজী	বর্ধমান
মোহাম্মদ ইব্রাহিম	কুসুমগাঁও, বর্ধমান
মোহাম্মদ জিলানী, শেখ	কলিকাতা
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
মোহাম্মদ ইউসুফ বি.এল.	কলিকাতা
মোহাম্মদ ওয়াহিজ, উকিল	বরিশাল
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
মোহাম্মদ শরীফ, মির্জা	চুঁচূড়া
মোহাম্মদ মাহমুদ, জমিদার	শ্রীহট্ট

মোহাম্মদ আলী, মির্জা	কলিকাতা
মোহাম্মদ সালেহ এলিয়াস	,,
মোহাম্মদ সোহেল, সব-রেজিস্ট্রার,	ভাণ্ডারি, চট্টগ্রাম
মোহাম্মদ ওয়াজির শেখ	পূর্ণিয়া
মোহাম্মদ খলিল সিরাজী, মির্জা	কলিকাতা
মোহাম্মদ কাসিম, মির্জা	,,
মোহাম্মদ জাফর ইমদাহানি	,,
মোহাম্মদ তৈয়ব	,,
মোহাম্মদ মেহেদী	,,
মোহাম্মদ গাজী, চৌধুরী	ভকত, ত্রিপুরা
মোহাম্মদ ফয়েজ, চৌধুরী	বাতগাঁও, ফরিদপুর
মোহাম্মদ ইউসুফ, খাজা, জমিদার	ঢাকা
মোহাম্মদ হোসেন, সৈয়দ	শায়েস্তাবাদ, বরিশাল
মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাকিম	কলিকাতা
মোহাম্মদ আবদুল রাবি, সব-রেজিস্ট্রার	হাওড়া
নূর মোহাম্মদ	কলিকাতা
নাজিরুদ্দীন, মোহাম্মদ	,,
নাজিরুদ্দীন, মোহাম্মদ	হুগলী
নাজিরুদ্দীন আবুল হোসেন, জমিদার	বগুড়া
নাজিরুল হক	কলিকাতা
নাজিবুদ্দীন	,,
নুরুল হক, ইনস্পেক্টর, ডাকঘর	,,
নূরুল হুদা, সৈয়দ, ব্যারিস্টার	,,
নওয়াবজান	,,
ওমরাও, মির্জা	খিদিরপুর, কলিকাতা
রহিমুল্লাহ চৌধুরী, জমিদার	প্রাকপুর, চট্টগ্রাম
রেয়াজুদ্দীন আহমদ, জমিদার	ত্রিপুরা
রাজিউদ্দীন আহমদ, জমিদার	ঢাকা
সদরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ, জমিদার	বোহার, বর্ধমান
সেরাজুদ্দীন আহমদ, জমিদার	বর্ধমান
সাদিক ইসমাইল	কলিকাতা

সাদেক সুন্ত্রী, সৈয়দ	কলিকাতা
সিরাজুল ইসলাম বিদ্রক	,,
সিরাজুল হক, মোহাম্মদ, খান বাহাদুর,	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বগুড়া
সোবহান হায়দার, খান বাহাদুর	চট্টগ্রাম
সমা-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
সৈয়দ আফজাল হোসেন	কৃষ্ণনগর
শফিউদ্দীন আহমদ, সব-ডেপুটি কলেক্টর	আলিপুরদুয়ার জলপাইগুড়ি
শামসুল হোদা	কলিকাতা
তাজাম্মল হোসেন, সৈয়দ	,,
তসলিমউদ্দীন আহমদ বি.এল	,,
তসাদ্দক হোসেন, পেস্কার	কলিকাতা হাইকোর্ট
তসাদ্দক-উন-নবী	মঙ্গলকোর্ট, বর্ধমান
তাহের মোহাম্মদ সালেহ মোহাম্মদ	কলিকাতা
ইকরুম-উন-নেসা খাতুন চৌধুরাণী	,,
ওবায়দুল্লাহ, খান বাহাদুর, সৈয়দ,	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, নোয়াখালী
ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী,	সুপারিন্টেন্ডেন্ট ঢাকা মাদ্রাসা
ওয়াসিবুদ্দীন আখন্দ	কলিকাতা
ওয়াহিদ জান, খাজা	শাহবাগ
ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
ইউসুফ আলী খান চৌধুরী	হাসনাবাদ, ত্রিপুরা
জিয়াউদ্দীন আহমদ, কাজী, জমিদার	ঢাকা
জহিরুদ্দীন আহমদ, ডাক্তার	কলিকাতা
জুলফিকার আলী, সুপারিন্টেন্ডেন্ট	চট্টগ্রাম মাদ্রাসা[১]

১ হিন্দু সভা : বিনোদবিহারী মল্লিক (কলিকাতা), বদ্রীদাস রায়বাহাদুর (কলিকাতা), দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ (কলিকাতা), গণেশ চন্দর চন্দ্র (এটর্নি, কলিকাতা হাইকোর্ট), হীরালাল মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কে. এম. চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার (কলিকাতা), লক্ষ্মীপত সিংহ রায়বাহাদুর (মুর্শিদাবাদ), মদনমোহন ভাট (কলিকাতা), নবীনচন্দ্র বোস (অনুবাদক), নবীনচন্দ্র বড়াল (এটর্নি, কলিকাতা হাইকোর্ট), প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর, বরিশাল), পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), মাত্রিরাম সিংহ (কলিকাতা, শ্রীরাম চন্দ্র (এটর্নি, কলিকাতা হাইকোর্ট) ও শ্যামলাল মল্লিক (কলিকাতা)।

শাখাসমূহ ঃ বগুড়া[১]

খোন্দকার খায়রুজ্জামান	তমিজউদ্দীন
মধু মোহাম্মদ	করিমুদ্দীদী
বাহারুদ্দীন	খোন্দকার হেরাসতুল্লাহ
জিয়াউল্লাহ	সৈয়দ নেওয়াজ আলী চৌধুরী
নবী বকস	সৈয়দ হাজিরুদ্দীন হোসেন চৌধুরী
মোবারক আলী চৌধুরী	সরফরাজ আলী চৌধুরী
নজবত আলী চৌধুরী	সৈয়দ আবদুল মজিদ চৌধুরী
সৈয়দ আবুল হোসেন	আবুল হাফিজ
দরুজ্জামান সরকার	আবদুর রহিম খান
মোহাম্মদ আসাদ	আশরাফ উদ্দীন
খোন্দকার সফদর আলী	আবদুর রহমান সরকার
হানিফ তালুকদার	গোলাম সুলতান
খোন্দকার মোবারক আলী	সৈয়দ আবদুল মজিদ
হাজি মোহাম্মদ আলী	আমিরুদ্দীন খান
সনজিদ খান	গোলাম সামদানী
কলিমুজ্জামান চৌধুরী	মহব্বত আলী খান
নাজিরুদ্দীন আহসান	হাজি মইনুদ্দীন
দুর্গতিয়া সরকার	রহমত উল্লাহ সরকার
আশার সরকার	মোহাম্মদ বক্স ফকির
পীর মোহাম্মদ প্রামাণিক	সৈয়দ আবদুল হোসেন
রমজান খান	হাজি হাবিবুল্লাহ
দীনাতউল্লাহ চৌধুরী	ইয়ার মোহাম্মদ মণ্ডল
মকবুলউদ্দীন মণ্ডল	সোনাউল্লাহ মণ্ডল
রতিউল্লাহ মণ্ডল	জহিরুদ্দীন মণ্ডল
খোন্দকার ইমদাদ আলী	মঈনুদ্দীন তালুকদার
তাহের আলী মিয়া	নবী বকস তালুকদার
জয়নুল্লা সোনার	মুরাদ মছুম
খোন্দকার আনোয়ারুল্লাহ	অকুল তালুকদার

১ 'কার্যকরী কমিটি'র জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভা-সমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

নূর তালুকদার	বরদুল্লাহ প্রামাণক
কলিমুদ্দীন ফকির	মনসুরুল্লাহ তালুকদার
বদশারত উল্লাহ	সৈয়দ আব্বাস আলী

চট্টগ্রাম

ইকরাম রসুল, খান বাহাদুর,	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (সভাপতি)
মোহাম্মদ সোবহান হাযদার,	খান বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট
জুলফিকার আলী (সম্পাদক),	সুপারিন্টেন্ডেন্ট, মাদ্রাসা
আবদুর রহমান খান চৌধুরী,	জমিদার
আবদুল কাদির	,,
ফযেজ আলী	,,
হামিদ আলী খান	,,
হামিদউল্লাহ চৌধুরী	,,
হেদাযেত আলী চৌধুরী	,,
আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী	,,
আবদুল আলী, মোযাল্লাম	নাখোদা
নাজমুল্লাহ মোয়াল্লাম	,,
জিনাত আলী মোয়াল্লাম	,,
আরফান আলী	মোক্তার
বদরুদ্দীন	,,
আবদুল্লাহ	সাদাবরিগ
আবদুল ওযাদুদ	,,
আসগর আলী	,,
খলিলুল্লাহ	,,
মোহাম্মদ ইযাকুব	,,
মসিউল্লাহ	,,
আহমদউল্লাহ	শিক্ষক
ফজলে আলী	,,
খয়রতি মিয়া	,,
আবদুল আজিজ	ইমাম মসজিদ
বাশারতউল্লাহ	,, ,,

নাজির হোসেন	ইমাম মসজিদ
আব্বাসউদ্দীন	কাজী
আবদুল সাত্তার	,,
আবদুর রহিম	আমিন
আমীর আলী	মক্তরী
আমীর হোসেন	,,
আসরাফ হোসেন	,,
গোলামুজ্জামন	,,
গোলাম রব্বানী	,,
হামিদুল হক	,,
লুৎফুল্লা	,,
মোহাম্মদ ইসমাইল	,,
মোহাম্মদ হোসেন	,,
মোকবুল আলী	,,
আসাদ আলী	সওদাগার
আমজাদ আলী	,,
আবদুল মজিদ	,,
বুরহানুদ্দীন	,,
ফকিরি মোহাম্মদ	,,
হোসেন আলী	,,
মোহাম্মদ আকবর	,,
ইউসুফ আলী	,,
জিন্নাত আলী	,,
তরবিয়াত খান	,,
সফর আলী	ক্যাপ্টেন ও সওদাগর
বাশারত খান	ইনস্পেক্টর
দেওয়ান আলী	উকিল, জজকোর্ট
মোহাম্মদ আজিমুল্লাহ খান	,, ,,
মোহাম্মদ ফাজুল্লাহ	,, ,,

হাকিমউল্লাহ	উকিল মুন্সেফ কোর্ট
গফর আলী	,, ,,
বয়রতি	,, ,,
ফজলে আলী	দারোগা
কলিমুল্লাহ	,,
হোসেনুজ্জামান	কাবি
ইমদাদ আলী	সব-ইনস্পেক্টর, পুলিশ
নূর আলী	হাফিজ

হুগলী[১]

জামীরুদ্দীন	প্রিন্স
আশরাফউদ্দীন আহমদ	মতওয়াল্লী, ইমামবাড়া
আবুল মোজাফফর, সৈয়দ	জমিদার
আমজাদ আলী, সৈয়দ	কর্মচারী, ডাকঘর
আইনুদ্দীন আহমদ	হেডক্লার্ক, ইমামবাড়া
আফজাল আলী, সৈয়দ	জমিদার
আতাহার আলী, সৈয়দ	,,
আহমদ আলী, সৈয়দ	,,
আহমদ হোসেন	,,
আবদুল আজিজ, চৌধুরী	,,
আবদুল্লাহ	,,
ফতেহ আলী, মির্জা	,,
গোলাম মেহেদী	,,
হেলালউদ্দীন	,,
ইদাদ আলী	,,
কোরবান আলী, মির্জা	,,
লুৎফুল্লাহ	,,
মেহেদী হোসেন	,,
আহমদ খান	,,

১ 'কার্যকরী কমিটি'র জন্য 'সভা সমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

আহসান আলী	ব্যবসায়ী
আবদুল আলী	,,
মনজুরুল হক	,,
কুদরত শাহ	,,
আলী আহমদ, মির্জা	সরকারী কর্মচারী
আহমদ বকস	,, ,,
আবদুল মজিদ	,, ,,
ফররুক হোসেন	,, ,,
কাসিমুদ্দীন	,, ,,
নজমুল হক	,, ,,
আবদুর রহিম মির্জা	কর্মচারী, ইমামবাড়া
আবদুল হোসেন	,, ,,
আশোক আলী খান	,, ,,
আফজল হোসেন, মির্জা	,, ,,
আগা আলী, মির্জা	,, ,,
আলী মোহাম্মদ আবা	,, ,,
এনায়েত আলী, মির্জা	,, ,,
ফিদাহ আলী, মির্জা	,, ,,
গোলাম হোসেন, মির্জা	,, ,,
হায়দার হোসেন, মীর	,, ,,
হোসেন জান	,, ,,
জওয়াদ শাহ, হাকিম	,, ,,
খুররম আলী	,, ,,
কুচুক নজফি, আগা	,, ,,
মেহেদী হোসেন, মীর	,, ,,
মেহেদী হোসেন খান	,, ,,
মোহাম্মদ হোসেন, সৈয়দ	,, ,,
মোহাম্মদ আলী, মির্জা	,, ,,
মোহাম্মদ হাজি	,, ,,
রহিম বকস	,, ,,
রহিমুদ্দীন	,, ,,

আবদুল কাদের, আরবী অধ্যাপক	হুগলী কলেজ
বশির, ,, ,,	,,
আবদুল জলিল, ইংরাজী, শিক্ষক	,,
আবদুল আজিজ, আরবী শিক্ষক	হুগলী শাখা স্কুল
আলী আহমদ খান বাহাদুর	,,
শেখ আবদুল্লাহ	,,
বসিরুদ্দীন, প্রিন্স	
দৌলত হোসেন, মীর	,,
গোলাম হোসেন, কারী	
মজহারুল আনোয়ার,	উকিল ও জমিদার
মোহাম্মদ খান	,,
মোজাফফর আলী	,,
মুম্মুন খান	,,
মহসিন জান	,,
মাশুক জান	,,
নাসরুল উল্লাহ	,,
মশিয়ত উল্লাহ	,,
মোহাম্মদ কাজেম, মির্জা	,,
মোহাম্মদ শরীফ, মির্জা	,,
নাজিরুদ্দীন, খান বাহাদুর	,,
নওয়াব জান	,,
হুগলী	,,
নজফ আলী, মির্জা	,,
রমজান আলী, মির্জা	,,
সদরুদ্দীন	ডাক্তার
সরফরাজ আলী	,,
সালামত আলী	,,
সাদত আলী, মির্জা	,,
সৈয়দ হোসেন, আগা	,,
বিলায়েত আলী	,,
জহুর আলী, মির্জা	,,

(গ)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দ (১৮৮৫—১৯০৫)

	নাম	পেশা	স্থান
১৮৮৬	নুরুল হক	উকিল	ইণ্ডিয়ান এ্যাসোশিয়েশন, উলুবাড়িয়া শাখা, হাওড়া
	সওগত আলী	ব্যবসায়ী	,,
	সামিরুদ্দীন আহমদ	জমিদার	রংপুর
	রজব আলী আহমদ	উকিল	নীলফামারী এ্যাসোসিয়েশন, রংপুর
	সৈয়দ বাসারতউল্লাহ	তালুকদার	বাগেরহাট পিপল এ্যাসোসিয়েশন, খুলনা
	সাউদউদ্দীন মহম্মদ	উকিল ও জমিদার	বরিশাল পিপল এ্যাসোসিয়েশন, বাকেরগঞ্জ
	খাজা আবদল আলিম	জমিদার	ঢাকা পিপল এ্যাসোসিয়েশন ঢাকা
	সৈয়দ আবদুল বারি	,,	,,
	রেজাউদ্দীন	,,	,,
	ডক্টর আতাহার আলী	ডাক্তার ও জমিদার	চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া
	ফকির আলী মিয়া	জোতদার	কাটদহ এ্যাসোসিয়েশন, নদীয়া
	ডাঃ তমিউদ্দীন আহমদ	ডাক্তার	জলপাইগুড়ি
	লতিফ হোসেন	,,	শাবাজপুর, ত্রিপুরা
	এনায়েত আলী	,,	কানস্নুয়া, ত্রিপুরা
	হামিদউদ্দীন আহমদ	উকিল	ময়মনসিংহ
	নওশের আলী খান	তালুকদার	টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ
	নওয়াব গোলাম রব্বানী	মহীশূর রাজপরিবারের ডাক্তার	বুসাপাগলা ইমপ্রুভমেণ্ট এ্যাসোসিয়েশন, ২৪ পরগণা
১৮৮৭	সৈয়দ মহম্মদ হোসেন ঘউস	জমিদার ও ডাক্তার	চুঁচুড়া, হুগলী

১৮৮৮	মহম্মদ হাফিজ	জমিদার	বাকেরগঞ্জ
	আবদুর রহমান	শিক্ষক	রাজশাহী মাদ্রাসা, রাজশাহী
১৮৮৯	সৈয়দ করিমউল্লাহ	জমিদার	ঢাকা
	শেখ হেদায়েত বকস	তালুকদার ও ব্যবসায়ী	ঢাকা
	সবদার আলী	উকিল ও জমিদার	চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া
১৮৯৬	মহম্মদ জান মহম্মদ গাজী সাহেব	ব্যবসায়ী	কলিকাতা
	হারুনর রশিদ	,,	,,
	গোলাম মণ্ডল	উকিল	বারাসত, ২৪ পরগণা
	জহিরুদ্দীন আহমদ	জমিদার	মেহদিবাগ, কলিকাতা
	সৈয়দ আলী আজম	মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
	মহম্মদ হায়াত	লিগাল প্যাকটি-শনার	আলিপুর, কলিকাতা
	আবদুল মজিদ	উকিল	আলীপুর কোর্ট, কলিকাতা
	মহম্মদ ইশফাক	,,	কলিকাতা হাইকোর্ট
	মির্জা আহমদ আলী	ব্যবসায়ী	কলিকাতা
	সৈয়দ হোসেন	ডাক্তার	,,
	আবদুল হালিম গজনভী	জমিদার	,,
	মেহের আলী আলাদিন	ব্যবসায়ী	,,
	জাফর আলী	ডাক্তার	,,
	আব্বা মিয়া আবদুল সাত্তার	ব্রুকার	,,
১৮৯৬	জেড. আর. জাহেদ	উকিল	কলিকাতা হাইকোর্ট
	বদিউল আলম	জমিদার	কলিকাতা
	আলী আজম	জমিদার ও ডভটন কলেজের প্রফেসর	,,
	কবিরুদ্দীন আহমদ	জোতদার	মহতা, বর্ধমান
	হায়দার আলী	ব্যবসায়ী	কলিকাতা
	আবদুল জওয়াদ	জোতদার	শাহজাদপুর, বর্ধমান

	ইকরামুল হক	জোতদার	বর্ধমান
	আসাদ উজ্জামান, বি.এ.	,,	কলিকাতা
১৮৯৬ ও ১৯০১	আবদুল খালেক	উকিল	বর্ধমান
	আবুল কাসেম বি.এ.	জমিদার	কলিকাতা
	মহম্মদ ইরফান	,,	পালিগ্রাম, বর্ধমান
	আবদুল হাই	,,	,, ,,
	সৈয়দ আবদুস সালাম	,,	,, ,,
	আবদুল মণ্ডল	জোতদার	বর্ধমান
	গোলাম আসফাক	উকিল	,,
	মজহারুল আনোয়ার	,,	হুগলী
	সৈয়দ জামির আলী	জোতদার	কালনা
	সৈয়দ হোসেন আলী	,,	বর্ধমান
	কাজী আবদুল মজিদ	,,	নদীয়া
	মহম্মদ জান	,,	চোপদহ, নদীয়া
	কাজী মহম্মদ শামসুজ্জুহা	,,	,, ,,
	কাজী এবাদউল্লাহ	উকিল	বনগঞ্জ, যশোহর
	হামিদুর রহমান	জমিদার	চট্টগ্রাম
	নসিরুদ্দীন	মোক্তার	রংপুর
	ইয়াকুমুদ্দীন আহমদ	উকিল	দিনাজপুর
১৮৯৮, ১৮৯৯, ১৯০০	আলিমুজ্জামান চৌধুরী	জমিদার	ফরিদপুর
১৯০১	এস.এ. আসগর	ব্যারিস্টার	কলিকাতা
	সৈয়দ নুরুল হুদা	জমিদার	,,
	এম. সামসুর রহমান	,,	,,
	আবদুর রহমান তালু.	তালুকদার	উলুবাড়িয়া, হুগলী
	মহম্মদ আহসান	জমিদার	বর্ধমান
	সৈয়দ মহম্মদ হামিদুল্লাহ	,,	,,
	আবুল কাসেম	উকিল	,,
	মহম্মদ ইয়াসিন	,,	,,

	আবদুল হামিদ	উকিল	বর্ধমান
	জিয়ানুবী	জমিদার	,,
১৯০১	সৈয়দ ওয়াহিদ বকস	,,	,,
	আজিমুদ্দীন আহমদ	ব্যবসায়ী	,,
	সৈয়দ ওয়াসি আহমদ	জমিদার	,,
	মহম্মদ ইয়াসিন	,,	,,
	আবদুর রহমান	তালুকদার	হুগলী
	মহম্মদ ইয়াকুব	জমিদার	,,
	ইমাজুদ্দীন	জমিদার ও ব্যবসায়ী	বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
	আসর আলী	,, ,,	,, ,,
	মহম্মদ আজিজুর রহমান	জমিদার	,, ,,
	তাজি আহোন রশিদ	ব্যবসায়ী	,, ,,
	মোবারক আলী	,,	বগুড়া
	চৌধুরী হাফিজুল রহিম	জমিদার	,,
	চৌধুরী আলিমুজ্জামান	,,	ফরিদপুর
১৯০১ ও ১৯০৩	চৌধুরী মহম্মদ ইসমাইল খান	জমিদার	ফরিদপুর
	আবদুল গফুর সরদার	,,	যশোহর
	হাবিবুর রহমান	জোতদার	,,
	মোল্লা আতাউল্লাহ	,,	ময়মনসিংহ
	এইচ. আহমদ	উকিল	,,
	এ.এম. গজনভী	জমিদার ও উকিল	টাঙ্গাইল
	আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	তালুকদার	পিপল এ্যাসোসিয়েশন, টাঙ্গাইল
	রিয়াজুদ্দীন আহমদ	উকিল	চট্টগ্রাম এ্যাসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম
	কাজী আবদুল করিম	ব্যবসায়ী	,,
১৯০৪	রফিউদ্দীন মহম্মদ	জোতদার	বর্ধমান
১৯০৫	খন্দকার আনোয়ার আলী	জমিদার	ফরিদপুর

এ.কে.এম. আবদুল কাইয়ুম	উকিল	বর্ধমান
মহম্মদ নুরবান	,,	মালদাহ
আবদুল হালিম গজনভী	জমিদার ও উকিল	মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
রহমতউল্লাহ	মোক্তার	সিরাজগঞ্জ, পাবনা*

(ঘ)

সরকারী উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (১৮৫৭-১৯০৫)

সি আই ই

আবদুল লতিফ, নবাব, খান বাহাদুর	১৮৮৩
সৈয়দ আমীর আলী	১৮৮৭
আহসানউল্লাহ, নবাব বাহাদুর, ঢাকা	১৮৯১
আবদুর জব্বার, খান বাহাদুর	১৮৯৫
বখতিয়ার শাহ	১৮৯৮

জি সি আই ই

মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর	১৮৯১

কে সি আই ই

জাহান কদর মির্জা, প্রিন্স	১৮৯৪
আহসানউল্লাহ, নবাব বাহাদুর	১৮৯৮

কে সি এস আই

আবদুল গণি, নবাব, ঢাকা	১৮৮৭
আলী কদর সৈয়দ হাসান, নবাব বাহাদুর, মুর্শিদাবাদ	১৮৮৭

* ১৮৮৫, ১৮৯১-৯৫, ১৮৯৭-৯৮ সালের কংগ্রেসের অধিবেশনের কোন মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান করেননি। ১৮৯০ সালে ১৫ জন প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন, কিন্তু রিপোর্টে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না।

Sufia Ahmed, Doctor—*Muslim Community in Bengal* (1884-1912) Oxford University Press, Dacca, pp. 378-393.

সি এস আই

খাজা সলিমুল্লাহ, নবাব, ঢাকা	১৯০৫
নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ, খান বাহাদুর	১৯০৫

নবাব

আবদুল গণি	১৮৭৬
আমীর আলী, খান বাহাদুর	১৮৭৬
আবদুল লতিফ, খান বাহাদুর	১৮৮০
সৈয়দ আজম আলী, খান বাহাদুর	১৮৮৬
ফয়জুন্নেসা চৌধুরীরানী, হোসনাবাদ	১৮৮৯

নবাবজাদা

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুস সোবহান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৯৫

খান বাহাদুর

কুদরতুল্লাহ, তালুকদার, বীরভুম	১৮৬০
মওলা বকস, ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০
সৈয়দ আমীর আলী	১৮৬৪
হেদায়েত আলী, ক্যাপ্টেন	১৮৬৬
খাজা আহসান উল্লাহ, নবাব	১৮৭৬
আবদুল লতিফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৭৭
তাজুম্মল আলী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৮৫
মোহাম্মদ ইউসুফ, উকিল, কলিকাতা হাইকোর্ট	১৮৮৫
সিরাজুল ইসলাম, বিএ. বিএল.	১৮৮৭
সৈয়দ রেজা হোসেন, কাজী	১৮৮৮
আবদুল সোবান চৌধুরী, জমিদার, বগুড়া	১৮৯৩
সৈয়দ আশরাফউদ্দীন আহমদ, মতওয়াল্লী, হুগলী ইমামবাড়া	১৮৯৩
সৈয়দ দিলদার হোসেন আহমদ, আরবী ও পারস্য অধ্যাপক, কলিকাতা মাদ্রাসা	১৮৯৩
দেলওয়ার হোসেন আহমদ, ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন	১৮৯৪
আজহার হোসেন	১৮৯৫
আসগর হোসেন, কামরূপ	১৮৯৫
খোন্দকার ফজলে রাব্বি, দেওয়ান, মুর্শিদাবাদ	১৮৯৬

বদরুদ্দীন হায়দার, অনারীর ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ	১৮৯৬
আলী নওয়াব চৌধুরী, জমিদার, ত্রিপুরা	১৮৯৭
গোলাম কাসিম, বসিরহাট	১৮৯৭
আবদুল মজিদ চৌধুরী, জমিদার, রংপুর	১৮৯৮
এ.এফ.এম. আবদুর রহমান	১৮৯৮
মির্জা সুজাত আলী বেগ, মুর্শিদাবাদ	১৮৯৮
রহিম বকস পেস্কার, জমিদার, জলপাইগুড়ি	১৮৯৯
বজলুল রহিম	১৯০০
এহসান হোসেন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, বীরভূম	১৯০১
সৈয়দ মোহাম্মদ খান, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট	১৯০২
সামসুজ্জোহা, অনারীর ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূম	১৯০৩
খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন, ঢাকা	১৯০৪
সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ, নবাব	১৯০৪
সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ফিরোজ জঙ্গ	১৯০৪
আহমদ, শামসুল উলামা, আরবী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ	১৯০৪
আবদুল কাদির, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট	১৯০৪
আবদুস সালাম, এমএ	১৯০৪
ইকরাম রসুল, ডেপুটী কলেক্টর	১৯০৪
আবদুল জব্বার	১৯০৪
আবদুল খালেক, ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, যশোহর	১৯০৪
মীর মাআজ্জম হোসেন, জমিদার, শায়েস্তাবাদ	১৯০৪

খান সাহেব

নওয়াব জান	১৮৮৭

শামসুল উলামা

আহমদ, আরবী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ	১৮৯১
আতাউর রহমান	১৮৯৩
জুলফিকার আলী	১৮৯৬
বেলায়েত হোসেন, সহকারী মৌলবী, কলিকাতা মাদ্রাসা	১৮৯৮
মির্জা আশরাফ আলী, আরবী অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ	১৮৯৮
মোহাম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর	১৯০৩

সাদত হোসেন, শিক্ষক, কলিকাতা মাদ্রাসা	১৯০৩
মোহাম্মদ ইয়াকুব, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, চট্টগ্রাম মাদ্রাসা	১৯০৩
আবুল খয়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, ঢাকা মাদ্রাসা	১৯০৩

কায়সার-ই-হিন্দ

মোহাম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর	১৯০১

অর্ডার অব দি ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া

বেগম শামস-ই-জাহান ফেরদৌস মহল, মুর্শিদাবাদ	১৮৯৮

অর্ডার অব দি স্টার অব ইণ্ডিয়া

সৈয়দ আজিমুদ্দিন হোসেন, খান বাহাদুর	১৮৬৮*

(ঙ)

কলিকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র মুসলমান সদস্যবৃন্দ (১৮৫৭-১৯০৫)[১]

ফাত্তাহ আলী	৭ ডিসেম্বর ১৮৫৯	কলিকাতা
আমীর আলী, খান বাহাদুর সিআইই.	৩ অক্টোবর ১৮৬০	,,
আবদুল লতিফ, খান বাহাদুর	৫ ডিসেম্বর ১৮৬০	,,
আসগর আলী, খান বাহাদুর	৪ সেপ্টেম্বর ১৮৬১	,,

* তালিকাটি নিম্নোক্ত গ্রন্থ দুটির সাহায্যে সংকলিত :

ক. *Consolidated Alphabetical Index to the Proceedings of the Government of Bengal.* Political Department (Political Branch), 1859-1908.

খ. *Who's Who is India,* 1911, Part IV, V, VIII, Calcutta.

১ কলিকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) একটি উচ্চমানের গবেষণামূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হতেন। তালিকাটি এসিয়াটিক সোসাইটির প্রসিডিংস থেকে নির্ণীত হয়েছে। কলিকাতা ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে যাঁদের ঠিকানা দেওয়া আছে, কেবল তাঁদের নাম এখানে উল্লিখিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, এঁদের অনেকে অবাঙালী ছিলেন। বনেদী সামন্তশ্রেণী ও নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়েছেন।

সদরুদ্দীন, মুন্সী	২ অক্টোবর	১৮৬১	পাণ্ডুয়া
ওয়াহিদুন্নবি, মৌলবী	৭ অক্টোবর	১৮৬৩	কলিকাতা
কবিরুদ্দীন আহমদ, নবাব	৭ এপ্রিল	১৮৬৯	,,
জাহান কদর মহম্মদ ওয়াহেদ প্রিন্স, কেসিআইই	৪ আগস্ট	১৮৬৯	গার্ডেনরিচ, কলিঃ
হাবিবর রহমান, মৌলবী	৭ জুন	১৮৭১	কলিকাতা
আহসানউল্লাহ, নবাব, খান বাহাদুর	৩ এপ্রিল	১৮৭২	ঢাকা
আবদুল হাই, মৌলবী	৯ ডিসেম্বর	১৮৭৫	কলিকাতা মাদ্রাসা
সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ, নবাব, খান বাহাদুর সিএসআই	৪ জুলাই	১৮৭৭	কলিকাতা
দেলওয়ার হোসেন আহমদ, মৌলবী	৯ ডিসেম্বর	১৮৮০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা
মহম্মদ ফারুক শাহ, প্রিন্স	৬ জুলাই	১৮৮১	কলিকাতা
গোলাম সাওয়ার, মৌলবী	১ মে	১৮৮২	,,
মহম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর	২ আগস্ট	১৮৮২	,,
আলী কদর সৈয়দ হাসান, নবাব বাহাদুর, কেসিআইই	৫ মার্চ	১৮৮৪	মুর্শিদাবাদ
ইসকান্দর আলী মির্জা, প্রিন্স	২ মে	১৮৮৪	কলিকাতা
আহমদ, শামসুল উলুমা, খান বাহাদুর	৪ এপ্রিল	১৮৮৮	প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা
সৈয়দ মহম্মদ জয়নুল আবেদীন ফিরোজ জঙ্গ, নবাব, খান বাহাদুর	৪ জুলাই	১৮৮৮	মুর্শিদাবাদ
আবদুল ওয়ালি, মৌলবী	২৭ সেপ্টেম্বর	১৮৯৪	শৈলকুপা, যশোহর
এ.এফ.এম. আবদুর রহমান ব্যারিস্টার	৬ মার্চ	১৮৯৫	কলিকাতা
আবদুল সালাম, মৌলবী	৯ মে	১৮৯৫	,,
শেখ মহম্মদ জিলানী, শামসুল উলমা	২৯ আগস্ট	১৮৯৫	,,
মহম্মদ আবদুল কদর,			

খান বাহাদুর	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫	কলিকাতা
আবদুল করিম বিএ, মৌলবী	৪ মার্চ ১৮৯৬	,,
আবদুল আজিজ খান, বিএ. মৌলবী	৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯	,,
আবদুল আলিম	৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩	,,[১]

১ হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলী ৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ সালে সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন, তিনিই প্রথম বাঙালী মুসলমান সদস্য। তিনি ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত সোসাইটির এসোসিয়েট সদস্য হিসাবে জড়িত ছিলেন। ঐ বছর তাঁর মৃত্যু হয়। চুঁচুড়ার সুলতান মহম্মদ বসিরুদ্দীন ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ সালে সদস্য হন। প্রিন্স জালালউদ্দীন ও আগা বেগ সোসাইটির সঙ্গে জড়িত থেকে যথাক্রমে ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশিষ্ট—২

(ক)

'সুরিয়া-বিজয়' (১৩০২) গ্রন্থের 'উৎসর্গ-পত্র'

অশেষগুণালঙ্কৃত, ধর্মপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, উদারহৃদয়, দানশীল, মুসলমান জমিদার-কুলরত্ন, জনাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব করকমলেষু

ধার্মিকবর,

অনিত্য আমোদোপযাচিকা সংসারপ্রতির ঘোর আবর্তনের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ভাবদীয় জীবন এবং সম্পদ যেরূপ অকাতরে পবিত্র ধর্মকার্য্যে উৎসর্গ করিতেছেন এবং সমাজহিতকর বিবিধ বিষয়ের অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, বিশেষতঃ জাতীয় ইতিহাস ও ধর্মপুস্তকাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে ধর্ম ও জাতীয় একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়াছেন। অধিকন্তু এই সকল সদেচ্ছা ও সৎপ্রবৃত্তি অপ্রতিহতভাবে রাখিয়া ধর্মের আদেশানুবর্তী হইয়া পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই ভবদীয় জীবনের মহা উদ্দেশ্য। সেই মহা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া মহোদয় আমার এক চির বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করায় কৃতজ্ঞতার দীন-চিহ্ন স্বরূপ "সুরিয়া-বিজয়" ভবদীয় করকমলে অর্পণ করিলাম। ইতি

সংগ্রহক।[১]

(খ)

'জাতীয় ফোয়ারা' (১৩১৯) গ্রন্থের 'উপহার পত্র'

যিনি জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহার নিঃস্বার্থ যত্ন ও চেষ্টায় সমাজের সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছে, সেই উদার-হৃদয়, সদগুণনিলয়, পরম ভক্তিভাজন পুণ্যপ্রাণ কর্মবীর অনারেবল নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বহাদুর সাহেবের সুপবিত্র

---

১ পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী 'সুরিয়া-বিজয়' প্রণয়ন করেন, মাসিক 'মিহিরে' (১৮৯২) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।
আবদুল কাদির সম্পাদিত—মাশহাদী রচনাবলী, ১ খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃঃ ৯৩।

করকমলে ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ প্রাণে এই অকিঞ্চিৎকর "জাতীয় ফোয়ারা" সসম্মানে উপহার প্রদান করিলাম।

হক মঞ্জেল, শান্তিপুর, নদীয়া মোজাম্মেল হক
১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ

(গ)

'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার' (১৮৯০) গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্র'

শ্রীযুক্ত হাফেজ মহমুদ আলি খাঁন চৌধুরী সাহেব মহোদয় করকমলেষু
মহাত্মন!

অলক্ষ্যে কর্তব্য সাধনই প্রকৃত মহাজনের জপনীয় মন্ত্র। আপনি সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান ধর্মের জ্যোতিঃ বিকাশ এবং মুসলমান সমাজে তৎসাধন-সুচিকা বঙ্গভাষা প্রচার করিতেছেন। এহেন কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মুসলমান ধর্মাবলম্বিদিগের উন্নতিমূলক উপকারই ভবিষ্য ভারতে আপনার যশঃ সৌরভ বিস্তার করিবে ; সুতরাং এতাদৃশ লোপশীল পুস্তকের একপ্রান্তে আপনার মূল্যবান নামাঙ্কনের কিঞ্চিদপি প্রয়োজন নাই। তথাপি ভক্তি এবং আনন্দ উচ্ছ্বাসে এই ক্ষুদ্র মুসলমান ধর্মযুদ্ধ-নীতি পুস্তকখানি আপনার বিমল করকমলে অর্পণ করিলাম। নানা দোষে মলিন থাকিলেও আপনার উদার করে ইহার পরম শোভা হইবে, ইহাই দেখিব, আমাদের একমাত্র বাসনা, ইতি।

অনুগত
রেয়াজুদ্দীন আহমদ
ও
আবদুর রহিম

(ঘ)

'জমিদার দর্পণে'র (১৮৭২) 'উপহারপত্র'

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব, পূজ্যপদেষু।
আর্য্য!

আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বলমণি বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্যন্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমিদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। এবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

আজ্ঞাবহ
মীর মোশাররফ হোসেন

(ঙ)

'বিষাদ-সিন্ধু'র (১৮৮৫) 'উৎসর্গপত্র'

পূজনীয়া শ্রীমতি করিমন্নেসা খাতুন সমীপে

মাত।

যদিও আমি আপনার গর্ভজাত সন্তান নহি, কিন্তু সদরোপম আবদুল করিম ও আবদুল হালিম অপেক্ষা আমার প্রতি কোন অংশেই কোন দিন আপনার স্নেহ-মমতার কিছুমাত্র ন্যূনতা দেখি নাই। সন্তানের উপার্জিত অর্থ অনেক মাতাই আশা করিয়া থাকেন। যদিও মা, আপনার সে আশা নাই, জীবনে কখনও হইবে কিনা সন্দেহ, তথাচ আপনার আশ্রয়ে থাকিয়া যাহা করিয়াছি তাহা আজ আপনার হস্তেই অর্পণ করিলাম। দুঃখী সন্তানের প্রদত্ত বলিয়া ঘৃণা করিবেন না, এই আমার প্রার্থনা। "বিষাদ-সিন্দু" আপনার হস্তেই অধিকতর শোভা পাইবে।

চির আজ্ঞাবহ দাস

মীর মোশাফবরফ হোসেন।[১]

(চ)

'মতিচুর' ২ খণ্ড, (১৩২৮) গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্র'

আপাজান।

আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গালা পড়াব ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমি আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবার্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিয়া ১১ বৎসর যাবত এই উর্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি, এখানেও পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দু-ভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়।

---

১ 'বিষাদ-সিন্ধু'র কেবল প্রথম সংস্করণে এই উৎসর্গপত্রটি আছে, পরবর্তী আর কোন সংস্করণে এটি মুদ্রিত হয়নি।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল—মীর মশাররফের গদ্য রচনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃঃ ৬০-৬১

আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে। স্নেহ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে ধন্য হইব। এই পুস্তকে তোমার বড় সাধের 'ডেলিশিয়া হত্যা'ও দেওয়া হইয়াছে।[১]

(ছ)

'বসন্তকুমারী নাটকে'র (১৮৭৩) 'উপহারপত্র'

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর শ্রদ্ধাস্পদেষু।
মহামহিম মিত্র।

আপনি আমাদের সমাজের একটি রত্ন। বিশেষতঃ আমার প্রতি আপনার অকপট স্নেহ। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আপনি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করেন। স্নেহ আর অনুরাগের বশম্বদ হইয়া আমার কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ইন্দ্রপুর রাজকুমারী এই বসন্তকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনার উদারচিত্ততা, মিত্রানুরাগিতা এবং সাধারণ সমাজানুরাগিতায় বিশেষ যত্ন দেখিয়া আমি বহু যত্ন প্রসূত বসন্ত কুসুম-কলিকা বসন্তকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। সাহিত্য উদ্যানে বিচরণ করিবার ফল স্বরূপ এই আমার একটি নব-কুসুম। প্রত্যাশা করি, এই কুমারীকে স্নেহ নয়নে দর্শন করিয়া সযত্নে রক্ষা করিবেন।

ভবদীয় স্নেহপাত্র চিরকৃতজ্ঞ
মীর মশাররফ হোসেন

(জ)

'কাসেমবধ কাব্যে'র (১৯০৫) 'উৎসর্গপত্র'

সুনীতি মুকুট-বিভূষিত স্বনাম খ্যাত মহাত্মা মৌলবী আবদুল করিম বিএ চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলেষু—

বঙ্গীয় শিক্ষক শ্রেণী, শিক্ষাপ্রণালীর
উৎকর্ষ সাধন তরে সেই পরিশ্রম
করেছেন অবিরত অক্লান্ত শরীরে
তাহার প্রতিদান কি দে আছে মহাত্মন।

১ রোকেয়া-রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃঃ ৭৬

তবে এই শোকোচ্ছ্বাস নদী-বংশ-বধে,
(প্রকাশ করেছি যাহে সন্তপ্ত হৃদয়ে)
ভক্তি-উপহার রূপে শোভিত চরণে।
দিবসে প্রদীপ যদি কোন মূঢ় জন
জ্বালায় গগনস্থিত প্রদীপ্ত ভাস্কর
তার প্রতি নাহি হাসে। পূর্ব উপহার
সতত সজীব যথা স্নেহ-দৃষ্টি লোভে,
সেইরূপ এ মলিন কাব্য-রত্ন-হার
শোভুক প্রদীপ্ত হয়ে ও কর পরশে।

স্নেহপ্রার্থী
এ. এম. এম. হামিদ আলী

(ঋ)

Bust (Senate House, Calcutta University)
Nawab Bahadur Abdul Latif C.I.E.
born 1829 died 1893

"This bust is erected in grateful commemoration of his life long devotion to the Spread of Eastern and Western learning among Indian Mohamedans and his strenous endeavour to accomplish their moral and intellectual advancement. He devoted his life to the promotion of two great princples, the encouragement of education among his Mahomedan fellow-subjects and this promotion of confidence and good will between those who professed his own religion and their Hindu and European neighbours. He recognised that we are all of us alike interested in advancing the prosperity of this Great Empire and in security its good Government."

Member of this Senate 1863-1893.

(ঞ)

Memorial Tablet

"With the concurrence of the Government of Bengal this table is erected by the Memorial Committee to the memory of a great benefactor of the Muhammedans of Bengal, Nawab Bahadur Abdul Latif C.I.E. in grateful commemoration of this life long services in the encouragement of Western and Oriental Education among his co-religionists, and his warm interest in the Calcutta Madrasah Hostel. He was foremost in every good work calculated to promote the moral, social and intellectual advancment of the Muhammedans of India.

Born March, 1828 Died 10th July, 1893

পরিশিষ্ট—৩
(ক)

Central National Muhammedan Association

First Five Years Report 1883.

"The present backward condition of the Indian Moslems is due partly to internal and partly to external causes. The disintegration of the Mahommedan Society, the decadence of their principal families, and the general ruin which has ever-taken all classes of the Mussulman Communty, combined with the absence of any means to represent to Government, faithfully and honestly, the views of the Mussulmans of India, have placed them in a most disadvantageous position as regards political influence and power relatively to the other Indian Committies. It may safely be afirmed that until the establishment of the Central National Mahammedan Association, there existed no political body among the Indian Mahommedan, capable of representing to the Government, from a loyal but independent stand point, the hopes and aspirations, the legitimate wants and requirements of the large body of Moslems in this country who by their number and homogeneity constitute such an important factor in all questions concerning the welfare of India. The Mohammedan Societies which had been formed here and there, were in the main, literary and scientific, having their stensible object the promotion of a desire for European knowledge among the Mahommedans. The absence of a really representative political institution occasionally forced the Government to consult the societies upon questions affecting the Mahommedan Community of particular localities. The opinion thus elicited hardly represented, however the views of

the leaders of thought among them, who were alive to the exigencies of the times. The factions and cliques into which the Mahommedan Community was divided not only prevented their acting in consert with their Hindoo and Christain fellow subject on general question of public policy, but absolutely precluded the possibility of collective action in the way of social progress and reform. In order to boviate the difficulties under which the Mahommedans have laboured hitherto. The Central National Mahommedan Association was instituted six years ago for the protection and conservation of the general interests of the community.

The Association has been formed with the object of promoting by all legitimate and constitutional means, the well-being of the Mussulmans of India. It is founded essentially upon the principle of strict and loyal apperence to the British Crown. Deriving its inspirations from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the age. It aims of the political regeneration if the Indian Mahommedans by a moral revival, and by constant endeavours to obtain from Government a recognition of their just and reasonable claims.

The Association does not, however, overlook the fact that the welfare of the Mahommedans is intimately connected with the well-being of the other races of India. It does not, therefore, exclude from its scope, the advocacy and furtherances of the public interests of the people of this country at large. It is hoped that the Association, whilst working the cause of the Mussulmans, will also be able to promote and consume the interests of their non-Moslem compatriots."[1]

---

1. *Rules and Objects of the Central National Mahommadan Branch Association*, Associations with Quinquennial and Annual Reports and list of Members, Calcutta, 1885, pp. i-iii.

(খ)

National Mahommadan Association. Rangpur Branch

(Letter to the Government of Bengal by the President Khan Bahadur Abdul Majid Chowdhury)

"All the sacred books of the Muhammadans being written either in Arabic, Persian or Urdu, it is essentially necessary for a Muhammedan to learn of first something of those languages, if he to claim any knowledge of his religion and respect from the society. The Muhammadan parents also do not like to educate their children in Bengali only, as the language is full of Hindu polytheistic ideas and thoughts, and tends to denationalise their youths. To meet this general inclination, well-to-do Muhammadans have set up Mukhtabs at their own expense.... but hitherto the Mukhtabs have neither received any aid from the Goverment nor are they being supervised by any educational officer, nor are they in any way recognized by the Government and consequently their condition, status and usefulness are not so good as could be desired.

The District Board contributes about half a lakh of rupees towards the maintenance of Bengali Paksals in Rangpur, but unfortunately nothing is spent for these Mukhtabs educating the children of the Muhammadans, who comprise more than two-thirds of the entire population of the District.

The Government has recently granted four lakhs of rupees in addition to the District Board's grant for primary education in Bengal, and out of this amount. Rs. 11,135 has been alloted to Rangpur. The District Board, has already made an ample provision for the pathsalas where only Bengali is taught. If the Mukhtabs be included in the category of the lower primary schools and out of the above grants Rs. 5,000 be specially reserved for these Mukhtabs to be expended in granting stipend

and other aids to the boys, and also in paying the salary of a qualified Maulvi with English education to be appointed as Special Sub-Inspector to supervise them, it will go a great way in solving the great educational problems of the Muhammadans of Bengal. The Mukhtabs should, of course, conform to such standard of a lower primary pathsala as might be feasibly done, without inspiring the special facility for which these Mukhtabs exist, viz, the boys should be taught Persian or Urdu as well as Bengali. Should this process be adopted in the Mukhtabs, it will be necessary to change the existing standard of the junior and senior Madrassahs to which these Mukhtabs might serve as feeders, that is to say, the students after passing the final examination from these Mukhtabs might be taken the fourth class of a junior Madrassah."[1]

(গ)

National Muhammedan Association, Mymensing Branch
(A Letter to Sir Syed Ahmed Khan by the Secretary of the Branch Association)

"Perhaps you have learnt already that we were compelled to postpone the intended meeting at Dacca. The reason was simply this that after I had left the place Babu Surendra Nath Banerjee came there and that strong headed advocate of the Congress, the president of the so-called Anjuman-i-Islamia of Dacca of whom I spoke much in my last, like a man void of all sense of honour shamelessly threw away his mash, and against all his big promices and solemn assurances again joined the Babus and allowed himself to be elected a delegate and threw me in a very awkward position. He presided in a meeting

1. Khan Bahadur Abdul Majid Chowdhury to the Govt. of Bengal. 30 November, 1902, paras 1-3. *Bengal Education Proceedings*. Sept., 1903.

in which Mr. Banerjee made a vehament speech. But your letter which I thoroughly explained to the Dacca Mohammedans was fresh in their memory they violently opposed the speaker. This discouraged the Babu so much that he thought it advisable to change his programme. Without any attempt to come here as was pre-arranged he returned to Calcutta. However Syed Abdul Basi's treachery has provoked the whole community. He has already lost the sympathy of his friends and followers. He stands alone but to make up the loss he was trying to come here to entice away fools but I got timely information and he is baffled in his attempt. He is against the Nawab of Dacca and is trying to gain notoriety by joining the Hindus. Though he has none of the qualifications of Bhimjee yet be aspires to soar like that notorious merchant. The friends of the Congress have made much out of Abdul Baris disgraceful conduct. To counteract this we intend to hold a grand meeting on the 11th November, 88 at the Nawab's palace in which we of East Bengal and all the Associations of this quarter..... The meeting will be held chiefly on the basis of your note and the prospectus of the Patriotic Association so although it is too far yet is desirable that the Patriotic Association should send some one to explain fully your views to that meeting. That will add great weight. If it be not convenient you may at least empower me or any other gentleman to do task. At the same time, I shall feel much obliged if you send me a copy of your first speech against the Congress or any other paper which may assist me in explaining your views."[1]

Dated, Mymensingh. Hamiduddin Ahmed
the 31st Oct. 1988. Hon. Secretary.

1, Quoted from *Hindu-Muslims Relations in Bengal* (1905 – 1947 by Hossainur Rahman, Bombay, 1947, pp. 117-18

(ঘ)

Malda Muhammedan Association

(Letter from Secretary Published in 'The Moslem Chronicle.')

"An Association styled the Malda Muhammedan Association was started here in the year 1891 with the object of improving upon the political, social and educational status of the Muhammedans of Malda. Meeting chiefly in connection with the establishment and maintenances of a Madrassah at the Sudder Station of the District out of the very large income of the great wakf estate of Bacis Hazari in this District were from time to time be held until as a meeting on the 15th December, 1895 it was thought fit to re-organise the Association on a firmer basis on the model of the Central National Muhammedan Association at Calcutta. Fresh rules were passed and Chowdhuri Nowahedur Rahman Saheb, a leading zemendar of the District was unanimously elected president of the Assocition....One of the resolution of the said meeting of the 15th Dec., 1895, was to the effect that the District Board of Malda be requested to appoint a sufficient number of Muhammedans in the Education Department under its charge having regard to circular no 80, dated 25th June, 1894, of the Director of Public Instruction, Bengal. The Board on a requisition from the Association passed a resolution to consider the claims of Muhammedan candidates for employment under head education and to issue one notice of a vacancy occuring. Nothing, however, has yet been done by the Board to give any material help to the Muhammedans in the direction, and the Association is carefully watching the action of the Board in filling up a vacancy that has lately occured in the post of an inspecting Pandit for which two Muhammadan candidates have applied.

The next ordinary meeting of the committee of Management of the Association was held on 8th March, 1896. It was there amongst other matters unanimously resolved that the Chairman, District Board, Malda, be requested to nominate at least six Muhammeden gentlemen for appointment as members of the District Board of Malda, regard being had to the large Muhammedan population of the District, which is close upon 50 per cent of the total population....It is much to be regretted that the leading Muhammedans of this District take little or no interest in this direction.....

The want of Boarding House for Malda students is keenly felt here. Muhammedan students from mofussil desiring to prosecute their studies in the Zillah School are sadly disappointed to find no suitable lodging for them in the town. The few Muhammedan legal practioners and officers of the Court with the limited sources at their disposal are quite unable to provide lodging for mofussil students and it will be necessary for us to resusciate proceedings with a view to ask to both the Bacis Hazari and Shah Hazari Maliks for contribution for a permanent fund to meet the cost of establishing and maintenance of a Muhammedan Boarding House here."[1]

20th June, 1896.

Abdul Aziz Khan
Secretary of Malda Mhuhammedan
Association.

(ঙ)

Muhammedan Reform Association

(A Circular Published in the Moslem Chronicle)

"All educated Muhammedan gentlemen who have applied themselves to the question of the welfare and progress of their community have long felt the use of an organisation whose

1. *The Moslem Chronicle,* 11 July 1896.

deliberations and action will be guided by a sole regard to its true interests unhampered by any other consideration and which by its constitution will be able to faithfully represent views of the Muhammedans and at the same time command the confidence of the public in general as well as of the Government. It is to supply this want of that the Muhạmmaden Reform Association has been founded. The promoters of the Muhammedan Reform Association have, therefore, considered it a matter of vital importance to introduce a rule to the effect that all office bearers shall be ellected annually by means of ballot so that the community which entrusts its interest in their hands may have a real and effective control over their actions. The special efforts of the Association will be directed to the advancement of the welfare of the Muhammedans of India by all legitimate means. At the same time it will always consider its duty to contribute its share to the promotion of of the well-being and prosperity of all classes and communites in India without distinction of race or creed. The promoters of this Association think it right state that it will always be the policy of the Muhammedan Reform Association to strengthen the hands of the Government in all just and useful measures and while it will feel itself bound to freely criticise all such actions of the Government as they think to be detrimental to the interests of the country and the Muhammedan community, it will also bear in mind that the cause of good Government in India requires that the prestige of the British Government should be in no way inspaired by violent and indiscriminate attacks. Lastly the promoters of the Muhammedan Reform Association do not share the apprehension which may possibly be felt in some quarters that this new Association is calculated

to create discord among the Muhammedans, on the other hand the Muhammedan Reform Association will always be ready and willing to work in conjunction with other Association either in Culcutta or elsewhere in all measures likely to advance the well-being of the Community.

It is earnestly hope that all well-wishers of Muhammedan community will join this Association and lend their help in ensuring its success.

Mohamed Yousuff
Vakils' Library

Abdur Rahim,
Bar Library.[1]

(চ)

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র

ভ্রাতৃগণ। আপনারা বঙ্গীয় মুসলমানদিগের বর্তমান দুরবস্থার কথা একবার নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখেন কি?...বিদ্যাশিক্ষাই মনুষ্যজাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। ...দুর্ভাগ্যবশতঃ বঙ্গের নির্জীব মুসলমানবৃন্দের মধ্যে সেই অমূল্য পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব।

বর্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অধিবাসিগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হইয়া জ্ঞানলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের জন্য 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ...অন্যদিগের সভার কিয়দংশ জাতীয় পুরুষ শিক্ষার নিমিত্ত প্রযোজিত হইবে। ...সম্প্রতি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতিতে আশান্বিত এবং মফঃস্বল সভ্যদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। ...আজি মুসলমানগণ আপনাদের দুরবস্থা পরম্পরায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট আসন লাভ করিবার অনুপযুক্ত, ইহা আপেক্ষা ক্ষোভের ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? স্মরণ করিতেও বিজাতীয় মর্মবেদনায় নিপীড়িত ও নিরাশার তীব্র বিষে বিকলচিত্ত হইতে হয়। আর কতকাল আমরা এই অজ্ঞানতমসে সমাচ্ছন্ন থাকি?...পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকদিগের স্বধর্মের

1. *The Moslem Chronicle*, 16 May, 1896.

প্রতি যেরূপ অনাস্থা এবং অনাদর তাহা স্মরণ করিলেও অভাবনীয় মর্মপীড়ায় নিপীড়িত হইতে হয়। ...শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মধ্যে অনেকেই যীশু-খ্রীষ্টের প্রপিতামহের জীবনচরিত্র বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের ষোল শত গোপিনীর নামকরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে মোহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মূলমন্ত্রগুলি (কলেমা প্রভৃতি) জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাঁহার চক্ষু স্থির! এই শোচনীয় অভাবের কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান একদেশদর্শী শিক্ষা-প্রাণালীর অঙ্গহীনতাই ইহার প্রধান কারণ। ...আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্কুলসমূহে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই। তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগের ইংরাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্মশিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ...এই সকল শোচনীয় অভাব দূরীকরণার্থে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' আমাদের সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার উপায় অনুষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বিধিমত যত্ন ও চেষ্টা করিবেন। ...প্রত্যেক জেলাতেই 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র শাখা সমিতি কিংবা সহযোগী সমিতি স্থাপন একান্ত বাঞ্ছনীয়। ভরসা করি প্রত্যেক জিলাবাসী শিক্ষিত এবং স্বজাতিবৎসল মুসলমান এবিষয়ে যত্নবান ও অগ্রসর হইবেন।[১]

(ছ)

Anjuman-i-Ashaati Islam

(Letter from The Moslem Chronicle)

"I am glad to inform you that an Association by the name of the 'Noakhali Islamic Propaganda' (Anjuman-i-Ashaasti Islam) has been established by the Mussulmans of this district... The immediate task of this Association will be to preach Islam through paid missioneries whose principal duty later on will be to travel over and preach in those parts of our country where Islam is less in rogue or not at all. The Association will have special attention towards those places where the moral degradation of the lower strata of the Mussulman community has produced in them a litigious and other ferocious spirits.

১ ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, ঢাকা, ১৮৮৭, পৃঃ ১-৭

Steps will be taken if fund allows, to encourage education among Mussulmans. At present there will be a library in connection with this Association.

This is, I believe, the first step in this direction ever taken in Bengal and as such it must meet with co-operation of our co-religionists form the more enlightened parts of our country. It is pleasing to note this undertaking has meet with warm support from all classes of people here. Our noble Magistrate Mr. S.K. Agasti has kindly given as his wards to render any assistance in his power for furthering the objects of this Association."[1]

(ছ)

Tipperah Hito Sadhinee Sava

As expected, the Contemplated transfer of the Chittagong Division to Assam has caused great consternetion among the people. The following telegram, we understand, has been sent both to the Government of Bengal and the Government of India, by Moulvi Serajul Islam Khan Bahadoor, as President of the Tipprah Hitshudhinee Sava :--

Chittagong Division much alarmed at its Proposal transfer to Assam. Prays for suspending final decision. Memorials follow.

It is a pity that Moulvi Serajul Islam is no longer in the Bengal Council, for : he would have been then in a position to do considerable service to the Division, which he represented so ably, by interpellating the Government on the subject. It is quite true that he asked a question last year and failed to elicit a satisfactory answer from the Government : but Sir Charles Elliot is no longer the ruler of Bengal, and there is no doubt that Sir A. Mackensie will deal more fairly with those members who intend availing of the privilege of inter-

1. *The Moslem Chronicle*, 12 December, 1896.

pellation than his predecessors did. Imagine the nature of the wrong, if the Chittagong Division is transfered to Assam, that a man like Moulvi Serajul Islam will no longer have of serving in the Council as a popular representative. The proposal is monstrous on the face of it : but yet it has the support of the statement. And why does the statemens support a proposal which has created such alarm in the minds of the public. Perhaps, because, it emenated from Sir Charles Elliot."[1]

(ঝ)
আঞ্জুমনে নুরুল ইসলাম
('মিহির ও সুধাকরে' প্রকাশিত একটি পত্র)

প্রায় তিন বছর হইল যশোহর মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহাতাবউদ্দীন সাহেবের প্রযত্নে 'শুভকরী' নামে একটা সমিতির স্থষ্টি হয়। সেই সমিতির ঐকান্তিক যত্ন ও প্রচেষ্টায় অত্র মনোহরপুরস্থ নিম্ন প্রাথমিক স্কুলটিকে 'প্রভাকর' নাম দিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিয়া তৎসঙ্গে মাদ্রাসা আলিয়ার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও পারসী ক্লাশ খুলিবার প্রস্তাব এবং অতি সত্বরই তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয়। তৎপর ইহার বিগত ১৩০৭ সালের ৯ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে সভ্যগণ একমত হইয়া উক্ত স্কুলটিকে স্বর্গীয় মৌলানা কারামত আলি মরহুম মাগফুর সাহেবের নামে উৎসর্গ করিয়া 'মাদ্রাসা কারামাতিয়া' নামে অভিহিত করেন। পরে বিগত ১৩০৮ সালের কার্তিক মাসে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়। আমাদের ভক্তিভাজন যশোহরের মোসলেম কুল-গৌরবরবি, স্বজাতি ও স্বধর্মহিতৈষী প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত খোন্দকার তোফেলদ্দিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তার গৌরব বর্দ্ধন করেন। আর যশোহর খড়কি নিবাসী আলেম কুলরত্ন পীর দস্তগীর জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহেব, জনাব মুনশী কাসেম আলি সাহেব এবং অন্যান্য বহুতর গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান এই অধিবেধনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে মাদ্রাসাগৃহ নতুন করিয়া বিরাট আকারে প্রস্তুত, তাহার জন্য উপযুক্ত স্থান এবং স্কুলের উন্নতির জন্য সুবন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়। তৎপরে মাদ্রাসার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি, শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

---

1. *The Moslem Chronicle*, 11 January, 1896

মাদ্রাসা ও সমিতির উদ্যোগী মেম্বর মুনশী জাহাঁ বখশ ১।। বিঘা জমি দান করেন, নসিরদ্দিন ২৫ টাকা দান করেন।

বর্তমান ১৩০৯ সালের ২৪শে শ্রাবণ শনিবার তারিখে ইহার আর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে আমার পরম ভক্তিভাজন মোসলেম কুলশিরোরত্ন যশোহরের ডিস্ট্রিক ও সেসন জজ জনাব সৈয়দ নুরুল হোদা সাহেবের যশোহরে অবস্থানের স্মরণচিহ্ন জন্য উক্ত 'প্রভাকর' সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'নুরুল ইসলাম' রাখা হয়।...১৪ই অক্টোবর অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, যশোহরে গভর্ণমেণ্ট সার্কুলার অনুসারে ৫জন স্কুল সব-ইনস্পেক্টরের মধ্যেও ৩ জন মুসলমান আর ২ জন মাত্র হিন্দু থাকিবার কথা। কিন্তু এ পর্যন্ত মাত্র ১ জন মুসলমান সব-ইনস্পেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ইহার আর একটী পদ খালি হয়। কিন্তু স্থানীয় ডিস্ট্রিক বোর্ড ও স্কুলের ডেপুটী ইন্সপেক্টরের ষড়যন্ত্রে ঐ পদে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের জনৈক এন্ট্রান্স ফেল কেরানী নিযুক্ত হন। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতাদের এই কর্মের প্রতিবাদ এবং তাহার প্রতিকার জন্য সদাশয় কমিশনারের দৃষ্টিগোচর করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনর বাহাদুর ও ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট পৃথক পৃথক দরখাস্ত পাঠান যাউক। এবং উহা শীঘ্রই পাঠান হইয়াছে।...পরম্পর শুনা যাইতেছে যে, সদাশয় কমিশনর বাহাদুর উহার জন্য ডিস্ট্রিক বোর্ডের নিকট কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছেন।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশ-চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার এই জাতীয় সহানুভূতিতে আমরা বাস্তবিক মোহিত (হইয়াছি) ও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি।[১]

(এও)

কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা

('মিহির ও সুধাকরে' প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন)

আজকাল আমাদের স্কুল কলেজে ধর্মহীন শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ অনুদিন কিরূপ ধর্ম ও নীতিবিহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষায় সে উদ্দেশ্য গঠিত হইতেছে না। পিতামাতা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্ব স্ব পুত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, শেষে তাহারা দেখিতে পান যে, পুত্রগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত

১ মিহির ও সুধাকর, অগ্রহায়ণ, ১৩০৯

হইয়া একটি কিম্ভূতকিমাকার জীবরূপে সংসারে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাহাদের দুঃখের আর সীমা থাকে না। এইরূপ ধর্মহীন শিক্ষাস্রোত যাহাতে বন্ধ হয়, আজকাল তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। খৃস্টানী স্কুল কলেজে খৃস্টান বালকদের শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে পূর্ণ হয়। কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার অঙ্গ হওয়ার কোন উপায় আজিও নির্ধারিত হয় নাই। যদি হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে যে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।...

মি. আবদুর রহিম সাহেব কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত মহোদয় উক্ত সভার সভ্যপদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য, মুসলমান ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করা।...হিন্দুস্থানী মুলমানদিগের মধ্যে সভাটী দিন দিন লব্ধপ্রসর হইয়া পড়িতেছে। আবদুর রহিম সাহেব বাঙ্গালা দেশের মুসলমান, তিনি এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ও উচ্চ পদে সমাসীন হইয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণকে ভুলিয়া কতিপয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছেন। আর আমাদের বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট উহার উন্নতিকল্পে সাহায্য ও সহানুভূতির প্রার্থী হইয়াছেন।

সেদিন মি. আবদুর রহিম সাহেবের গৃহে উক্ত সভার একটী অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মি. আমীর আলি সি.আই.ই. সাহেব উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।...প্রিন্সিপাল মি. রস সাহেবও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একটি আদর্শ মক্তব স্থাপন করা হইবে। মক্তবে মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য এই সভা হইতে দেওয়া হইবে।...

এখন কি নিয়মে মক্তবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। মাননীয় মি. আমীর আলি ধর্মহীন শিক্ষার ঘোর বিদ্বেষী, যাহাতে মক্তবে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে পার্থিব অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় তাহার অনুকূলে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন, সর্বসম্মতিক্রমে জজ বাহাদুরের প্রস্তাব গৃহীত হইল। তৎপরে মি. রস সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেননা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুলমানদের জাতীয়তা অর্দ্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা মুলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলে।

রস সাহেবের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে উক্ত আদর্শ মক্তবে মাসে মাসে ধর্মনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম মাসে রস সাহেব ইসলাম নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। তৎপর মাসে খান বাহাদুর মৌলবী দেলওয়ার হোসেন আহমদ বি.এ., তৎপর মাসে মৌলবী শামস-উল-হোদা এম.এ., বি.এল. সাহেব বক্তৃতা করিবেন।...এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রস সাহেব যে বাঙ্গালা ভাষার অপকারিতার বিষয় সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন, আর উপস্থিত সভ্যগণ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিলেন, পরে তাঁহার মতে মত দিয়া একজন ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিলেন, ইহা কি তাহারা স্বতঃপ্রমত্ত হইয়া করিয়াছেন, না স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিয়াছেন ?

বঙ্গীয় মুসলমানগণ যদি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা না করে, তাহা হইলে অন্যভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা কি আমাদের কথিত সমাজপতিগণ বিচার করিয়া দেখেন নাই ? কলিকাতা মাদ্রাসার শেষ পীরক্ষোত্তীর্ণ মৌলভীগণ বাঙ্গালা শিক্ষার অভাবে দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণে কিরূপ নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহা কি তাহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না ? ...গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতে হইলে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলে, চাষবাদ করিতে হইলে বাঙ্গালার মুসলমান-দিগকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে হইবে। ...পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, কলিকাতাস্থ কথিত সমাজ নেতাগণ বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষ হইতে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাহাদের স্বার্থ বিজড়িত, তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণের উপকারের আশা কিছুমাত্র নাই।[১]

(ট)

Anjumani-Islam (Faridpore)

(A petition to the Magistrate by the Secretary of the Anjuman)

"I have been directed by the members of the Anjuman-i-Islam, Faridpore to bring to your kind notice that the fact that cow-killing question has been the source of constant disputes between the Hindus and Muhammedans of Behar and other provinces of upper India. But fortunately the Eastern Bengal was quite free from those riots upto this time........Recently placards are being circulated by one Jogendra Chandra Ghosh,

১ মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ, ১৩০৯

Secretary to the Branch Gorakhini Sava of Faridpore inciting the people to exert their best to stop cow-killing any how they can. The result of the circulation and notification has been that the powerful Hindu Zamindars are combining themselves to prevent the sale of cows to butchers and the killing of their them in their Zamindary mohallas. If the Hindus combine to prevent cow-killing Muhammedans are not likely to yield : that the result will be a constant dispute to ill-feeling between two communities so long living in peace and amily in Eastern Bengal.

I, therefore, request you on behalf of the members of the Anjuman to take early step to prevent the circulation of those objectionable placards."[1]

1 *The Moslem Chronicle*, 4 April, 1895

পরিশিষ্ট-৪

(ক)

'বিষাদ-সিন্ধুর' সমালোচনা

"গ্রন্থকর্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত জীবন 'আজীজন নাহার' সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য নির্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নতুন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদ-সিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ করিয়া বিষাদসিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠ-কালে চোখের জল রাখা যায় না।...মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।"

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

"প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডও (উদ্ধারপর্ব) উপন্যাসের মত লিখিত। সুতরাং বড়ই সুখপাঠ্য। তবে প্রথম খণ্ডের ভাষা দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষাও বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।"

ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৫

"এই গ্রন্থখানি (মহরমপর্ব) পাঠ করিলে কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুগণেরও বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিতে পারে।" ঢাকা প্রকাশ, ৪ আশ্বিন ১২৯৩

"ইহা (বিষাদ-সিন্ধু) একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গালা যেমন পরিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পরিস্ফুট, নায়ক নায়িকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দর রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানের এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।" ভারতী, ফালগুন ১২৯৩

(খ)

অশ্রুমালা (১৮৯৪) কাব্যের সমালোচনা

অশ্রুমালা (১৮৯৪)—কবি কায়কোবাদের অশ্রুজল অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রতি বিন্দুতেই শোকাচ্ছাস দেদীপ্যমান।...কবি কায়কোবাদ কাঁদিতে জানেন, স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া বিচ্ছেদ গীত গাহিতে জানেন, তাই তাঁহার কান্নায় বিরহীর বিরহ বেদনা ঘুচে, প্রাণের জ্বালা উপশমিত হয়। কবি মুসলমান হইয়াও 'বিরোহিনী ধারা'র দুঃখে ম্রিয়মান হইয়াও নির্বাণের মন্ত্রে বিমোহিত, মুসলমান হইয়াও বিধবার বৈধব্যে সমবেদী। কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথিতে জানেন,

কাব্য সাজাইতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন, তাঁহার কবিতা কষ্টকল্পনার জিনিষ নহে, তোতাপাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ—সহজ স্বাভাবিক, প্রাণস্পর্শী। আমাদের বিশ্বাস, রীতিমত উপাসনা করিতে পারিলে কবি কোবাদ নিশ্চয়ই কাব্যজগতে কোবিদ পদবী লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

ঢাকা গেজেট, ১৮ চৈত্র ১৩০২

আমরা এ কবিতা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না। সুকবি মুসলমান বাঙ্গালা দেশে বিরল। কায়কোবাদ সাহেব সুকবি, সুরসিক এবং ভাবুক। ...কালে তিনি যশস্বী হইবেন, আমাদের এমন ভরসা আছে। বঙ্গবাসী, ২১ ভাদ্র ১৩০৩

আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও মর্ম্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, মনোহর। ...সমালোচ্য কাব্যের বহুল কবিতাতেই কবির রচনানৈপুণ্য, কবিত্ব, মাধুর্য্য ও ভাবসৌন্দর্য স্পষ্ট প্রতিভাসিত। কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মন্দকতাপূর্ণ ও করুণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ। ...তাঁহার হৃদয় আছে, সে হৃদয় প্রকাশের ক্ষমতাও আছে। নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১

(গ)

'তৃষ্ণা' কাব্যের উপহারপত্র

অশেষ গুণালঙ্কৃত, সমাজগতপ্রাণ, উদার-হৃদয় মাননীয় মৌলবী ডাক্তার ফয়েজউদ্দীন আহমদ "প্রচারক" সম্পাদক মহোদয় করকমলে—মহাত্মন।

যে মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনি পতিত সামাজকে জড়তাশূন্য করিবার নিমিত্ত, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না, আমি তাঁহারই একজন ভক্ত উপাসক। বিশেষতঃ সেই দুই দিনের আকস্মিক আনন্দ মিলনে আপনার হৃদয়স্থিত যে স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার তেজপুঞ্জ এই অল্পকালের মধ্যে আমার হৃদয়ে দিব্য-জ্ঞানের মহা-মিলনাশা জাগাইয়া দিয়াছে। তাই আপনাকেই ইহা উৎসর্গ করিবার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়াছি; অপিচ আপনি আমার কবিতাগুচ্ছ পাঠ করিতে ভালবাসেন সুতরাং আপনি কি আমার এই মানস কানন-জাত কোমল বন-ফুলগুলি পায়ে ঠেলিবেন?

একান্ত অনুগত
সেখ ফজলল করিম।

(ঘ)

'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১) গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত

Bangio Mussalmen by Moulvi Nowshte Ali Khan Yousufzai of Tangail, Mymensingh. It is a well written pamphelet on the political and social disintegration of the Mussalmen of Bengal. In a very impressive language the author has shown the decaying process of the aristocratic class of Muhammedans and has statistically proceed the gradial decline of cultivating classes into ignorance and imporerished circumstances. The general want of culture among our landlords. The want of education among our cultivating classes are to-day eating away the life blood of our Society. The book is on the whole thoughtfully got up, and would amply repay perusal in the hands of every behind of any position :

[The Moslem Chronicle, 7 Dec., 1895.]

I have gone through the book with sincere pleasure, your appeal to the Bengal Mussalmans to effect their own improvement and progress by social and moral reforms by education and earnest work has ring of true patriotism and enlists my sympathy and admiration I have been employed in different districts in Bengal for 20 years and more than half that period has been passed in districts where the majority of the population was Mussalman. I have always tried to in calculate the principle of self-help to those among whom I have worked and I have rejoined wherever I had opportunities to help those who knew how to help themselves. I am glad therefore to find that you preach the same noble doctrine so you co-religionists that you are urging them to effect social and moral reforms and to improve their own position by education and hard steady work. These I believe to be the only means of a

nations progress—it is idle and useless to look to other means for improvement and advancement.

[Opinion of R.C. Dutt, Dinajpur, 23 March 1891.]

It is significant sign of the time that the Muhammedan gentleman in this part of the country have been successful in writing works in the Bengali language in a style that would not suffer in the least in comparison with the compposition of those who are 'so the manner born'. It is also a matter of rejoining that our Muhammedan fellow countrymen have bestirred themselves into activity and taken to discussing their short comings and wants in spirit that cannot fail so benefit them in the long run. In the treasive before in the writer examples the conditions of his countrymen in Bengal in their social and political and religious aspects and ascribes much of their drawbacks to want of proper education. His suggestions for their ametiration breath a true spirit of patriotism and eminently worthy of being considered by his co-religionist. To others the book is also interesting in as much as it gives them a good insight into the present condition of a section of the Indian community among whom their lot is cast.

[The Indian Mirror, 3 May 1895.]

পরিশিষ্ট-৫

(ক)

'ইসলাম প্রচারকে'র প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ—'সূচনা'

পরম দয়াময় খোদাওন্দ করিমের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা 'ইসলান প্রচারক' প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইসলাম প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারকের ন্যায় কার্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে যত্ন-চেষ্টায় ক্রুটি হইবে না। বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের দ্বারা হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজে ধর্মপ্রচারক ও ধর্মগ্রন্থের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। 'ধর্মগ্রন্থের অভাব' বলিতে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মগ্রন্থের প্রভাবই বলিতে হইবে, নচেৎ আরবী, পারসী, উর্দু ভাষায় আমাদের ধর্মগ্রন্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে,...থাকিলে কি হইবে, বঙ্গভাষাপ্লাবিত বাঙ্গালা দেশে কয়জন লোক ঐ সকল মহাগ্রন্থের মর্ম বুঝিতে সক্ষম। একেত কালের বিপরীত স্রোত এদেশ হইতে আরবী, পারসী, উর্দু ভাষার চর্চা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে, এরূপ অবস্থায় মুসলিমদিগকেও সময়ের স্রোতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য করা উচিত। প্রচার ভিন্ন ধর্মের উন্নতি হইতে পারে না, একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য।...

বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারক মৌলবীর সংখ্যা মন্দ নহে, কিন্তু তাঁহারা বিধর্মীর নিকট ধর্ম-প্রচারের উপযুক্ত পাত্র নহেন। আবার তাঁহারা নিজের পেটের চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে সমাজের কল্যাণ চিন্তা তাঁহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না। ...আবার মৌলবী সাহেবগণ বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের 'ওয়াজ নছিহত' উর্দু ভাষায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রাম্য নিরক্ষর মুসলমানগণ উর্দু ভাষা কিরূপ বুঝিতে পারে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না, ...সুতরাং মৌলবী সাহেবদিগের সেই একঘেয়ে ওয়াজ নছিহত অতি অল্পমাত্র কার্যকরী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে একজন নাস্তিক, একজন হিন্দু, একজন খ্রীষ্টিয়ান বা একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া একটি যক্তিমুলক তর্ক উৎথাপন করিলে মৌলবী সাহেবের চক্ষুস্থির।...

আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। ছাত্রগণ শিক্ষা বিভ্রাটে পতিত হইয়া জাতীয় ধর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। ফাঁকা

ইংরাজী ও ছাঁকা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহারা স্বধর্মের উন্নত জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত হইতেছে। ...নিজের ধর্মতত্ত্ব মোটেই তাহারা জানে না। ...হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম অনেকের কণ্ঠস্থ। মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী অনেকে অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু হজরতের বংশাবলী চরিত্র প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা হা করিয়া থাকে। ...যে জাতি এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত, এইরূপ আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, এইরূপ বিজাতীয় ইতিহাসে পরিপক্ক তাহাদের দ্বারা ইসলাম ধর্মের পবিত্রতা নষ্ট না হইয়া যাইবে কোথায়?

এইরূপে আমাদের ধর্মের পথে কি অন্তরায় আছে, আর কিরূপে সেই সকল অন্তরায় দূরীভূত করিয়া ধর্ম প্রচারের পথ সুপ্রশস্ত করা যায়, একবার তাহারই আলোচনা করা যাউক। ...আমাদের ধর্মের শত্রু আজকাল প্রধানতঃ খ্রীষ্টিয়ান-গণ। ইহারা প্রচারে লাখে লাখে টাকা খরচ করিয়া স্ত্রী-পুরুষে নানা ভেক ধারণ করিয়া নানা উপায়ে ধর্ম প্রচার করিতেছে, ইহাদের অধ্যবসায় অটল, ইহারা ধর্ম প্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থ-বৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চলে আড্ডা করিয়া গরীব লোকদিগকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে। এই উপায়ে নদীয়া-যশোর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর গরীব মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। নদীয়া-কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই 'ইসাইদীন' কবুল করিয়াছে।...আমরা 'ইসলাম প্রচার'কে খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা বিশেষরূপে প্রদর্শন করিব।

দ্বিতীয়—ব্রাহ্মধর্ম। এই ধর্ম দিন দিন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ...স্বীয় ধর্মে অনভিজ্ঞ কোচ-বিহারবাসী কয়েকটি অজ্ঞ যুবা ইসলাম ধর্মের আশ্রয় ছায়া পরিত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করিয়াছে। অতএব ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য্য ও ব্রাহ্মণধর্মের অযৌক্তিকতা মধ্যে মধ্যে 'ইসলাম প্রচারকে' দেখান হইবে।

তৃতীয়—বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মুসলমান বালক ও যুবক এবং আপামর সর্ব সাধারণের মুসলমানী ধর্মে-কর্মে অনভিজ্ঞতা, ইহাও কম মারাত্মক নহে। বাঙ্গালা ভাষায় আবশ্যকীয় মসলা-মসায়েল শিক্ষার সুবিধা অতি অল্পই আছে, এজন্য আমরা 'ইসলাম প্রচারকে' নিয়মিতভাবে মসলা-মসায়েল বাহির করিব।

চতুর্থ—মুসলমানদিগের সামাজিক নিয়মাদিও যে ধর্মের প্রধান অঙ্গ, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আমাদের সমাজ বন্ধন শিথিল হওয়াতে ধর্মের বন্ধনীও শিথিল হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং সামাজিক রীতি পদ্ধতিরও সংখ্যাধিক পরিমাণে

আলোচনা করা অসাময়িক হইবে না।...সামাজিকতা রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন কখনও যুক্তিগত নহে।

পঞ্চম—জাতীয় ইতিহাস। মুসলমান জাতিই প্রকৃত ইতিহাসের স্থষ্টিকর্তা। ইতিহাস জাতীয় জীবন রক্ষায় প্রধান অবলম্বন। আমারা বঙ্গীয় মুসলমান—ইতিহাসের মর্যাদা ভুলিয়াই এরূপ দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস কিছুই নাই। মুসলমানদিগের অতীতকালের গৌরবান্বিত ইতিহাস বর্তমান সময়ের নির্জীব মুসলমানদিগের স্মরণপথে উপস্থিত করিলে তাহাদের ধর্মভাবও সজীব হইয়া উঠিত; সুতরাং আমরা মুসলমানদিগের গৌরবান্বিত ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে লিখিতে থাকিব।

ষষ্ঠ—ফকির মতাবলম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের ভীষণতম শত্রু। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান বা নাস্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধন না হইতেছে, মুসলমান নামধারী এই সকল ভণ্ড পাঠকের দ্বারা তাহার শতগুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে।... চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় এই শ্রেণীর নর-প্রেতের সংখ্যানুকল্পে ৪।৫ লক্ষ হইবে।...কতকগুলি ঐন্দ্রজালিক কার্য ও ভেল্কীভাজী দেখিয়া বর্ণজ্ঞানশূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানুকরণ করে। এই জঞ্জালগুলি সংস্কার করিতে না পারিলে ইহারা শীঘ্রই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে। ...অতএব ইহাদের দলবলের বিবরণও আমরা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিব।

সপ্তম—কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ, এইটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য।... যে মহাগ্রন্থ খোদাতালার পবিত্র বাক্যে পরিপূর্ণ, যাহা মুসলমানদিগের পার্থিব জীবনের আইন-কানুন ও পারলৌকিক জীবনের নিত্য সহচর, সেই মহা গ্রন্থের বাক্যাবলী ও উন্নত উপদেশাবলী মুসলমান মাত্রেই নানা একান্ত আবশ্যক। কোরানের অনুপম মহাত্ম্য ও অতুলনীয় সৌন্দর্য অবগত না থাকাতেই আমাদের অনেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বিপরীত পথে বিচরণ করিতেছে। ....ইসসলাম প্রচারকে মহাকোরানের সরল বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা মাসে মাসে নিয়মিত রূপে বাহির হইবে।

অষ্টম—মুসলমান সাধু অর্থাৎ ফকির দরবেশদিগের তত্ত্বকথা ও উপদেশাবলীও মধ্যে মধ্যে ইসলাম প্রচারকে স্থান পাইবে। প্রধান প্রধান তাপসদিগের জীবন চরিতও সময় সময় প্রকাশ করা যাইবে।...

নবম—ধর্ম বিষয় সভা সমিতির বিবরণ গত দুই বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি ধর্ম বিষয়ক সভা সমিতির স্থষ্টি হইয়াছে। ইহা যে আমাদের ভাবী

মঙ্গলের নিদর্শন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা এই সকল সভা সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিব।

আমরা অতীত ব্যয়ভার মস্তকে লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। ... মুসলমান ভ্রাতৃদিগকে যথোচিতভাবে অভিবাদন করিয়া আমরা এই কঠোর সাধনায় প্রবৃত হইলাম।[১]

(খ)

'মিহিরে'র প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ—'আভাস'

আজকাল কোন কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই লোকেরা সভা সমিতি করিয়া বড় বড় বক্তৃতা করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করেন, পরে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আর যাঁহাদের সেই উপায় নাই তাঁহারাও বড় বড় হ্যাণ্ডবিল, নোটিশ, বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দেশময় বিস্তার করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধারণ্যে সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে, কিন্তু আমরা এই উভয়বিধি উপায়েরই কোন সারবত্তা দেখিতে পাই না। এবং অনেক সময় ইহা বক্তৃতা না কাগজ-কলমেই বদ্ধ থাকে, কার্য স্বতন্ত্র পথে যায়। সুতরাং কার্য ও কল্পিত উদ্দেশ্যের মধ্যে ভিন্নতা আসিয়া পড়ে।—মিহিরের উদ্দেশ্য সমাজের নিকট মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি না থাকিলেও আমরা ইহার মূল ও স্থূল কয়টির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করি।

মাসিক পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য সচরাচর সাহিত্যচর্চা। কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, ভারতী প্রভৃতির পরেও যে এ দেশে আবার সাহিত্যচর্চার আবশ্যক আছে, এমন কথা যিনি মনে করেন তাঁহার বুদ্ধির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে লোকের মনে স্বতঃই নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। বাঙ্গালাকে একটা ভাষা বলিতে যাও, তাহাতেই অনেকের আপত্তি আছে। বিশেষ ও পাড়ার কয়েক জন নবাব বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, ডাক্তার, কবিরাজ ও অনেক বড় বড় x, y, z এরা পর্যন্ত ইহাকে এখনও ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং যাহার আবার সাহিত্য এবং তাহার আবার চর্চা, এ সম্পূর্ণ বাতুলতা।—তবে যদি আলালী ভাষায়, বঙ্কিম ভাবে ছোটখাট শব্দে এক কথা দশবার বলিয়া নাটক, উপন্যাস, নবন্যাস, রসোন্যাস বা আরও কোন ন্যাস প্রস্তুত করা যায়, তবে তাহা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য হইলেও হইতে পারে। নতুবা বিশুদ্ধ ইংরেজী পড়িলেও যে ভাষায় পারদর্শী হওয়া যায় না, বাচস্পত্য বিদ্যাসাগরীয়, বিদ্যাভূষণীয় অশ্রুত

১ ইসলাম-প্রচারক, ভাদ্র ১২৯৮

পূর্ব কটমট শব্দগুলি যে ভাষায় আধিপত্য করে, সেই অভিশাপ, ভাষায় সাহিত্য-চর্চা করিতে যাওয়া কেবল ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করা মাত্র। তবে ভারত গৌরব, আর্য্য-কীর্তি ও যবনদসন যত লেখা যাইতে পারে, দেশের ততই মঙ্গল, বরং ইহাতে দিন দিন ভাষার কান্তিপুষ্ট স্ফূর্তিমান দৃষ্ট হইতেছে। আমরা এইরূপ উন্নত সাহিত্য লিখিতে এখনও অভ্যস্ত হই নাই।...তবে আমাদের লেখাকে যদি পাঠকবর্গ অনুগ্রহপূর্বক সরল সাহিত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আর আমাদের সাহিত্য চর্চার স্পর্দ্ধা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

সাহিত্যের পর ইহাতে আমাদের মাসে মাসে বিজ্ঞানের চর্চা করার অভিলাষ ছিল। অভিলাষে কি হয়? এদেশীয় বিলাতি ভাষার বড় বড় পণ্ডিতেরা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, এ ভাষায় বৈজ্ঞানিক শব্দ পাওয়া যায় না, এ ভাষা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বাস্তবিকই এই বাংলা ভাষাটা যেমনি বিতিকাচ্ছ, তেমনই দুষ্ট, এ বরাবর হইতেই অবগত আছে যে, আমাদের মৌলিক নির্মাণ ক্ষমতা একেবারেই নাই, তাহা সত্ত্বেও সাহিত্য, অলঙ্কার বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে আবশ্যক শব্দে সুসমৃদ্ধ হইয়া ভস্ম গ্রহণ করিতে এ কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই। তবে যাঁহারা নিতান্ত ঠেকিয়া পড়েন, তাঁহারা বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের সহিত ইংরেজী শব্দের কর্তা, কর্ম দিয়া এক প্রকার কাজ চালাইয়া লইতেছেন, কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতাও নাই। তবু আমরা দেশী ভাষায় যতদূর পর্যন্ত পারি তাপ, তাড়িত, উষ্ণতা, আলোক, গতি, বল, রসায়ন, আকর্ষণ প্রভৃতি এবং তৎসহ অন্যান্য বিজ্ঞান সম্মত বিষয় সর্বদা প্রকাশে যত্নবান থাকিব। তবে আমাদের গবেষণাপরায়ণ পাঠকবর্গ ব্রাহ্মণের অন্ন যবনে স্পর্শ করিল, তাহাতে কি রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, বিবাহের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যুবক-যুবতীর শরীরের বৈজ্ঞানিক গঠন, নবমী তিথিতে অনাকুর গোমাংস প্রাপ্তি, সুতিকা গৃহস্থ কন্যার পরিণয় সংস্কারে, কি প্রকারে অক্ষয় স্বর্গফল লাভ হয়, সে সকল জাতি গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রত্যাশা করিবেন না।

পুরাবৃত্ত প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ মনোযোগ করিব, কারণ, ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক নাই, বরং প্রত্যেক শ্রেণীর সম্বন্ধেই ইহার উপযোগিতা আছে।

রাজনীতি বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিব। কারণ এ সম্বন্ধে আমাদের অপূর্ণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ যে দেশে বসিয়া আমরা রাজনীতির আলোচনা করিব, সে দেশের নীতিজ্ঞান অনেকদিন অজীর্ণতা ও দুর্বলতা ভোগ করিয়া অবশেষে মারা গিয়াছেন। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর

প্রভৃতি বড় বড় প্রবীণ চিকিৎসকগণ সে মহানিদ্রাকে মুর্চ্ছা মনে করিয়া নানা প্রকার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃতদেহ তেজ ঔষধ পতিত হইয়া কেবল পচন ও গলন কার্য্যে সত্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। শটিত নীতি এমন সহৃদয়গণের নিকটে দুর্নীতি বলিয়া পরিচিত। সুতরাং আমরা বরং নীতিবিহীন হইয়া আবার রাজার নীতির সমালোচনা করিতে যাইব, ইহা নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। তবে দেশে কখন কোন আবশ্যক বা গুরুতর পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে আমরা শাসন সমিতি। অভিপ্রায় বিশদরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহাতে আমাদের অভিমত খ্যাপন (কৃপণ) করিতে সর্বাদাই বিরত থাকিব।

সামাজিক কল্যাণসাধন অনেকের মতানুসারে মাসিক পত্রের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু সমাজ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব অনেক সময়ে ধ্যানেও পাওয়া যায় না। লৌকিক আচার ব্যবহার ও সমাজের উপর প্রকৃতপক্ষে ধর্মশাস্ত্র যতদূর প্রভুত্ব করেন, এতদ্দেশীয় লোকেরা উভয়ের মধ্যে তদপেক্ষা সমধিক ঘনিষ্ঠতা ও অনন্য সাক্ষেপতা স্থাপন করিয়াছেন।...ধর্ম-জগত ও জনসমাজ এ উভয়ের অবস্থাই আজকাল শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত, লৌকিকতা পাপগ্রস্ত, শাস্ত্র অবনমিত, আচার ব্যবহার আবিল ও ধর্ম কেবল কতিপয় সংসার বিরাগী লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু লৌকিকতাব এই স্বাতন্ত্র্য ও ধর্ম পবাবৃত্তি উভয় জনসাধারণের ক্ষতিকর ও অবনতি বিধানকারী। এই বিশ্বব্যাপী দুর্দ্দিনে মনীষীজ্ঞানী আর এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। ...তাঁহারা বলেন, মূল ধর্মশাস্ত্রানুসারে কেবল আধ্যাত্মিক কার্য্য করা উচিত বরং মানবের ইচ্ছা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে তাহাদের আচার ব্যবহারেব গতি নির্ণীত হওয়া শ্রেয়স্কর। ...বর্তমান শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপে পবীক্ষা চলিতেছে। ধর্মশাস্ত্র স্বভাবতঃ লৌকিকতার উপর আধিপত্য করিতে যতদূর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা তাহাতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি। কিন্তু তদুপরি টীকাটিপ্পনী করিয়া অগণ্য আচার ব্যবহারকে ধর্মের অধীনে স্থাপন করিতে আমরা অভিলাষী। এইরূপ ধর্মশাসনের বাহিরে লৌকিকতার যে অংশ অবস্থিত, আমরা অবসর পাইলেই তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। ইহাই আমাদের সমাজতত্ত্ব।

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বিষয়ের পরে আমরা মিহিরকে সম্পূর্ণরূপে সাময়িক করিতে অভিলাষ করিয়াছি। দেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যখন

যে পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, আমরা নিরপেক্ষভাবে তাহা প্রচার করিব। এবং যে সকল ঘটনার দ্বারা উত্তরকালে দেশের সাধারণ অবস্থায় এক প্রকার স্থূল জ্ঞান হইতে পারে বা ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাহায্য করিতে সক্ষম হয়, এমন ঘটনা অনুসন্ধান ও প্রচারে আমরা সর্বদা ব্যাপৃত থাকিব।

আমরা মিহিরের সম্বন্ধে এই প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্যের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সর্বদা ইহার গৌরব ও উন্নতির প্রতি যত্নবান থাকিব। ...উদারহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের এই প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে সার্থক করেন, এই বিনীত প্রার্থনা।[১]

(গ)
সুধাকরের অনুষ্ঠানপত্র

সংবাদপত্র জাতীয় উন্নতির প্রাণ-স্বরূপ। ইহা সভ্যতা বিস্তারের উৎকৃষ্ট পন্থা, সুতরাং সংবাদপত্র বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিস। বাংলাদেশের ভাষা বাঙ্গালা, আমরা বঙ্গীয় মোসলমান, অতএব আমাদের একখানা উপযুক্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্র নিতান্ত প্রয়োজন।

বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মোসলমানের সংখ্যা বড় কম নহে, হিন্দুদিগের ভাষায় মাসিক, পাক্ষিক, সপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রপত্রিকা সংবাদপত্র আছে। বঙ্গদেশে মুষ্টিমেয় পরিমাণ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও পত্রপত্রিকা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র চলিতেছে, বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞ সামান্য সংখ্যাক খৃষ্টানদিগের মধ্যেও বাঙ্গালা সংবাদপত্র আছে, দুঃখের বিষয়, মোসলমানদিগের একখানিও নাই।

সংবাদপত্র ভিন্ন স্বজাতির সুখদুঃখ কাহিনী গবর্ণমেণ্টকে স্বজাতীয় ভ্রাতাদিগকে এবং অপর সাধারণকে জানাইবার আর কোনও উপায় নাই, উপায় নাই বলিয়া তাহার প্রতিকার হওয়াও অসম্ভব।

মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে অন্যান্য সংবাদপত্রে কত কি লেখা হইতেছে, কত পুস্তকা পুস্তিকা বাহির হইতেছে, কত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চলিতেছে, কিন্তু প্রতিবাদ হইতেছে না, কেন? বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অভাবে।...

ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি সমস্তই থাকিবে। আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষার প্রধান প্রধান সংবাদপত্র হইতে উৎকৃষ্ট ও টাটকা সংবাদসকল সংগ্রহ করিয়া ইহার কলেবর গঠিত করা হইবে।...

১ মিহির, পৌষ ১২৯৮

পৃথিবীস্থ মোসলমান রাজ্যসমূহের অবস্থা ও প্রাত্যহিক ঘটনা এবং রাজকীয় সংবাদ হইতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবেন। মোসলমান জাতির বিগত শৌর্য বীর্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসূচক ইতিহাস সকল জ্বলন্তভাবে দেখান যাইবে। এতদ্ভিন্ন এসলাম ধর্ম্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ প্রতিমাসে এই কাগজে বাহির হইবে।

আমাদের যখন যে অভাব হইবে, তখনই তাহা সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের গোচরীভূত করিয়া তৎপ্রতীকারের চেষ্টা করা যাইবে। নতুন নতুন আইন কানুন যখন যাহা বিধিবদ্ধ হয়, তাহার মর্ম সমাজকে জানান যাইবে, এবং যাহার জাতীয় স্বার্থ ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতিকার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা যাইবে। ইহা রোগে—ঔষধ, শোকে—সান্ত্বনা, ক্ষুধায়—তৃপ্তি, পিপাসায়—শান্তি, চিন্তায়—প্রবোধ, নিরাশায়—ধৈর্য্য, ব্যবসায়ে—সহকারী, সাংসারিক ব্যাপারে—প্রিয় সুহৃদ এবং ভাষণে—সহচর-স্বরূপ কার্য্য করিবে। . .

আয়-ব্যয় পরিদর্শন : কলিকাতাস্থ ডভটন ও সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক বঙ্গের সর্বত্র পরিচিত জনাব মৌলবী মেযারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব এই সংবাদপত্রফণ্ডের আয়-ব্যয় পরিদর্শন নিযুক্ত হইলেন।

সম্পাদক ও লেখক : বঙ্গের প্রধান মোসলমান লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত এবং যাঁহাদের লেখা পাঠ করিয়া মোসলমান সকলেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেন, 'এসলামতত্ত্ব' যাঁহাদের সুপক্ক লেখনি-প্রসূত অর্থাৎ জনাব মৌলবী মেযারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্সী মহম্মদ রেযাজউদ্দীন আহমদ সাহেব ও শেখ আবদুর রহিম সাহেব দ্বারাই এই কাগজখানি সম্পাদিত হইবে।[১] . . .

১ সুধাকর, ২৩ কার্ত্তিক ১২৯৬

গ্রন্থপঞ্জী

মৌলিক গ্রন্থ ও নথি

আজিমদ্দিন মহাম্মদ চৌধুরী	জীবনচরিত, সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল, ১২৯৬
আবুল মাজালী মোহাম্মদ হামিদ আলী	কাসেমবধ কাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম, মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১২
	জয়নালোদ্ধার কাব্য, ভারতমিহির যন্ত্র, কলি., ১৯০৭
	ভ্রাতৃবিলাপ, কলিকাতা, ১৯০৩
আবদুর রশিদ খান	১৯০১ সনের নোয়াখালীর মোকদ্দমা। মহাত্মা পেনেলের বিচার, রামেন্দ্র যন্ত্র, নোয়াখালী, ১৯০০
আবদুর রহমান	অশ্রুহার, কলিকাতা, ১৯০৪
আবদুল আলা	কবিতাকুসুম মালা, ১ ভাগ, বরার্ট প্রেস, কলিকাতা, ১২৯০
আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ	বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি বিবরণ
	রাধিকার মানভঙ্গ
আবদুল হামিদ ইউসফজয়ী	উদাসী, টাঙ্গাইল, ১৩০৭
	প্রবোধ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৮
	বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত, ভারতমিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬
	বিরাগ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৭
	সারসংগ্রহ, ১ খণ্ড, ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ, ১৮৭৮
আলাউদ্দীন আহমদ	উপদেশ-সংগ্রহ, রোয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৮ (২সং)
কাজী ইমদাদুল হক	ওমর চরিত্র, সন্ধ্যা প্রেস, ফরিদপুর, ১৩১০
	আঁখি-জল, ভারতমিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬
	নবি কাহিনী, ১ ভাগ, স্টুডেন্স লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩২৪ (২সং)
	কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮

কাদের আলী	মোহিনী প্রেম-পাশ, গুপ্তপ্রেস, কলিকাতা, ১২৮৭
কায়কোবাদ	মহাশ্মাশান, ১৯১৭ (২সং)
	শিব মন্দির, ১৯২১
খোন্দকার গোলাম আহমদ	এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি, এডওয়ার্ড প্রেস, কাটোয়া, ১৯০৫
খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী	উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পরমার্থ লাভ, বিদ্যারত্ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৭৮২ শকাব্দ (১৮৬০ খ্রীঃ)
	ভাবলাভ, হানিফি প্রেস, কলিকাতা, ১৮৫৩
গোলাম কিবরিয়া	উচিত কথা, কলিকাতা, ১৮৯০
গোলাম মোহাম্মদ	তক্তে তাউস বা দিল্লীর ময়ূরাসন, ১ খণ্ড, শাহান শাঃ এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৮৯৭
গোলাম হোসেন	হাড় জ্বালানী, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৭১
জহিরুদ্দীন আহমদ	অস্ত্র চিকিৎসা বা সার্জ্জারি, রবার্ট প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৩ (২য় সং)
তজমুল আলী	তোওয়ারিখ-হেলিমী, সামন্তক প্রেস, ঢাকা, ১২৯৯
দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ	পুষ্পহার, ১৯০৩
দৌলত আহমদ	কক বরমা অং ত্রিপুরা ব্যাকরণ, অমর যন্ত্র, কুমিল্লা, ১৩০৭, ত্রিং
	কুসুমমঞ্জরী, সিংহ যন্ত্র, কুমিল্লা, ১২৯২
	জীবন মঙ্গল, উপেন প্রেস, কুমিল্লা, ১৯০৫
	পুরুষ প্রসঙ্গ, ,, ,, ,, ১৯০৪
	ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয়, অমর যন্ত্র, কুমিল্লা, ১৩০২
নওশের আলী খান ইউসুফজরী	উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি, ভারতমিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৯০১
	বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭
	শৈশব-কুসুম, আহমদী প্রেস, টাঙ্গাইল, ১৩০২
ফজলুর রহমান	বক্ষঃপীড়া, বিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬
ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী	তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালা প্রেস, ঢাকা, ১৮৮৭
	রূপ জালাল, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৭৬

বোরহানুদ্দীন আহমদ	সহজ পারসী-শিক্ষা, রেয়াজ-উল-ইসলাম, প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৭
ব্রজেন্দ্র কুমার ও মুন্সী মহম্মদী মকবুল আলী	চাহার দরবেশ, অধিরাজ যন্ত্র, বর্ধমান, ১২৯১
	মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ, ১৮৯৯
	রোজা, হিতৈষিণী যন্ত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৩০৮ (২সং)
ময়েজউদ্দীন আহমদ	শান্তিকর্তা বা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী, ৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩২২
মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	দুগ্ধ-সরোবর, বিনোদ প্রেস, বোয়ালিয়া, ১৯১৪ (২সং)
	সৌভাগ্য স্পর্শমণি, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩ ('বুক্স এণ্ড বুক্স' সংস্করণ)
মীর আশরাফ আলী	ধাত্রীবিদ্যা, দাস এণ্ড সন্স প্রেস, কলিকাতা, ১৮৬৯
	বালচিকিৎসা, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৭৫ (২সং)
মীর মশররফ হোসেন	আমার জীবনী, ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স, প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৭
	গো-জীবন
	বিবি খোদেজার বিবাহ, কলিকাতা, ১৩১২
	বিষাদ-সিন্ধু, আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত হরফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩
	মৌলুদ শরীফ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩২৪ (৫সং)
	হজরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ, কলিকাতা, ১৩১২
	মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ খণ্ড, ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬
	ঐ, ২খণ্ড, ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত (অপ্রকাশিত)
মুন্সী নামদার	নারীর ষোলকলা, কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ (১৮৬৩ খ্রীঃ)

মুন্সী মহম্মদী, গোলাম রব্বানী এবং দুর্গানন্দ কবিরত্ন — হাতেমের উপাখ্যান, সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, বর্ধমান, ১৮৭৩ (২সং)

মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহিম — ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার, মিলন প্রেস ডিপজিটরি, কলিকাতা, ১২৯৭

মোজাম্মেল হক — অপূর্ব দর্শন, মহম্মদীয় লাইব্রেরী, শান্তিপুর, ১২৯২
আল্লার শত নাম ও নামের মাহাত্ম্য, শান্তিপুর, ১৩১৭
কুসুমাঞ্জলি, কর প্রেস, কলিকাতা, ১২৮৮
জাতীয় ফোয়ারা, নাথ এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩১৯
জাতীয় সঙ্গীত, কলিকাতা, ১৩০৪
পদ্য-শিক্ষা, ১ ভাগ, নিউ মুন প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৯
প্রেম-হার, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮
ফেরদৌস চরিত, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮
মহর্ষি মনসুর, মিলন প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৩
হজরত মহম্মদ, হেরল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, ১৩১৭ (২সং)

মোসলেম উদ্দীন খান — হিতকাব্য, টাঙ্গাইল, ১৩০১

মোহাম্মদ আবেদিন — ধর্মপ্রচারণী, বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৮১

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ — সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত, মথুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালী, ১৯০১

মোহাম্মদ আবদুল করিম — এরশাদে খালেকীয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬ (২সং)

মোহাম্মদ আব্বাস আলী — মহরম উৎসব, পোস্ট-ডেসপ্যাচ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৪

মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী — প্রেম দর্পণ, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৫

মোহাম্মদ ইবরাহিম খাঁ — জ্ঞান-বৃক্ষ, ২ ভাগ, মিলন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৯৪

মোহাম্মদ ইয়াকুব	উদ্যান, গোবিন্দ যন্ত্র, নোয়াখালি, ১৩০২
মোহাম্মদ কাজেম আলী	মানব সুহৃদ বা চতুর্দ্দশ নীতিরত্ন, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮
মোহাম্মদ নইমদ্দীন	এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন
	এসবাতে আখেরজ্জোহর, টাঙ্গাইল, ১৮৯৭
	কোরান শরিফ, ১ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটীয়া, ১৮৯১
	কোরান শরিফ, শেষ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটীয়া, ১৩০০
	জোব্দাতল মসায়েল, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটীয়া, ১৯০১
	গো-কাণ্ড, করটীয়া, ১৮৮৯
	ফতওয়ায় মাহমুদীয়া অর্থাৎ ফতওয়ায় আলমগিরী ১-৪ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটীয়া, ১৮৮৪-১৮৯২
মোহাম্মদ ফসিহ	সমসামল মওয়াহেদিন, কলিকাতা, ১৮৮৭
	সয়ফুল মোমেনিন, কলিকাতা, ১২৮২
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী	তুরস্কের সুলতান, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬ (৩সং)
	বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভাণ্ডার, যশোহর, ১৩৭৫ (৭সং)
	মেহেরুল এসলাম, ১৩৩২ (৭সং)
	হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	এসলামতত্ত্ব, ১ খণ্ড, অমরযন্ত্র, কলিকাতা, ১২৯৫
	গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯)
	হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা, সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা, ১৩৫৫ (৪সং)
মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল	হায় রে সেদিন কোথায় গেল, দাস যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭

রহিম বক্স পেস্কার	ওয়াকফনামা, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪
রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী	প্রবন্ধ-কৌমুদী, ১৮৯৯
	সমাজ ও সংস্কারক, কলিকাতা, ১২৯৬
	সুরিয়া-বিজয়, মিলন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০২
	মাশহাদী রচনাবলী, ১ খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	মতীচুর, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০০
	রোকেয়া রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
শেখ আবদুল রহিম	প্রণয় যাত্রী, কলিকাতা, ১৩২৭ (২সং)
	শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২ খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭
	হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ (৬সং)
শেখ আবদুল লতিফ	মানব সংস্কারক, মেদিনীপুর, ১৮৭৮
শেখ ওসমান আলী	আলোকসভা, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪
	দেবলা, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১
শেখ ফজলুল করিম	আসবাত-উস-ছামী বা ছামাতত্ত্ব, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১০
	তৃষ্ণা, কাকিনা (রংপুর), ১৩০৭
	পরিত্রাণ, কালকাতা, ১৩১০
	ভগ্নবীণা, কলিকাতা, ১৯০৪
	মানসিংহ, বিকাশ মেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বরিশাল, ১৯০৩
	লায়লী-মজনু, নুর লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩২১ (২সং)
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন	আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত, অন্নপূর্ণা প্রেস, যশোহর, ১৩০৪
	ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য, ১৩০৭

	হজরত ইসা কে, ১৩০৬ শেখ জমিরুদ্দীন রচনাবলী, ডক্টর মুস্তাফা নরউল ইসলাম সম্পাদিত, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	আরব জাতির ইতিহাস, ২ খণ্ড, ব্রাহ্মনিশান প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯
সমিনউদ্দীন আহমদ	পঞ্চাইত বিধি, কৃপানন্দ যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭
সমিরউদ্দীন আহমদ	মোহাম্মদীয় ধর্ম-সোপান, নারায়ণ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১১
সলিমউদ্দীন মহম্মদ	প্রেমাবলী
শেখ আজিমদ্দী	কড়িব মাথায় বুড়োর বিয়ে, অজ্ঞানদীপক যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৭৫ (২ মুদ্রণ)
শেখ আবদোস সোবহান	হিন্দু মোসলমান, ভিক্টরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮
সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী	অনল-প্রবাহ, ১৯০১ স্বাজাতি প্রেম, কলিকাতা, ১৯৪৬ শিরাজী রচনাবলী, উপন্যাস খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭৬
সৈয়দ আবুল হোসেন	যমজভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা, কলিকাতা, ১৯০৫
সৈয়দ আবদুল আসফর	তরফের ইতিহাস, জাহ্নবী যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৯৪
সৈয়দ এমদাদ আলী	ডালি, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮
সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন	প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা, ১৯০৩
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী	ঈদুল আজহা, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯ হিজরী (১৯০০ খ্রীঃ) মৌলুদ শরিফ, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২২ হিজরী (১৯০৩ খ্রীঃ)
হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী	হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী, কবীর চৌধুরী ও সেলিনা বাহার চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

Abdool Lateef — **A Short Account of My Public Life,** Calcutta, 1885

Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, edited by Enamul Haque, Samudra Prakashani, Dacca, 1968.

Rev. Moulvi Zamiruddin — **Glory of Islam,** Garadob, Nadia, 1929.

Syed Ameer Ali — **The Spirit of Islam** (a history of the evolution and ideals of Islam with a life of the Prophet), London, 1955 (8th edition.)

Memoires and other Writings of Syed Ameer Ali, edited by Syed Razi Wasti, Peoples Publishing House, Lahore, 1968.

A brief history of the Mahomedan Literary Society of Calcutta, 10th Turner Street, Calcutta, 1922.

A quarter century of the Mahomedan Literary Society of Calcutta (A resume of its work from 1863 to 1889).

Abstract of Proceddings of the Mahomedan Literary Society of Calcutta at a meeting held...on Wednesday, the 23rd November, 1870 (Lecture by Moulvi Karamat Ali), Calcutta. 1871.

Abstract of the Proceedings of an Extraordinary Meeting of the Committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta held at No. 16 Taltollah, on 9th June, 1900, at 7-30 p.m. Calcutta, 1900.

Khan Bahadur Abdul Majid Chowdhury to Government of Bengal, 30 November, 1902 **Bengal Education Proceedings,** September, 1903.

Memorial of the National Muhammadan Association. Calcutta, 1882.

Proceedings of an Extraordinary General Meetings of the National Mahomedan Association held on Sunday the 16th February, 1879.

Report of the Committee of the Central National Muhammadan Association for the Past five years (Adopted

unanimously at a General Meeting of the Association held on the 15th April, 1883).

Report of the Committee of the Central National Muhammadan Association for the year 1838-84, Calcutta, 1885.

Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association and its Branch Association with thc quinouennial and Annual Reports and List of Members, Thomas S. Smith, City Press, Calcutta, 1885.

Selections from Bengal Government Records on Wahhabi Trials (1863-1870) by Muinuddin Ahmed Khan.

Selectiɔns from the Records of the Bengal Govermnent, Vol. XIV, 1854 (Papers Relatings to the Presidancy College).

Selections from the Records of the Government of India, Home Department, No. CCV, serial No. 2, (Correspondence of the subject of the Education of the Muhammedan Community in British India and the employment in the Public Servicc Generally), Calcutta, 1886.

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৮৩

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, ঢাকা, ১৮৮৭

সহায়ক গ্রন্থ ও নথি

অমলেন্দু দে	বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৪
আনিসুজ্জামান, ডক্টর	মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
	মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪
আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, ডক্টর	সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
আবদুল মওদুদ	মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯
আহমদ শরীফ, ডক্টর	জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৪ (২সং)
ইবরাহিম খাঁ	বাতায়ন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭

উইলিয়ম হান্টার — দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস (আবদুল মওদুদ অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪

উপাধ্যায় গৌর গোবিন্দ রায় — আচার্য কেশব চন্দ্র, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯০৮

কাজী আবদুল মান্নান, ডক্টর — আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা, স্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯ (২ সং)

কাজী মোহাম্মদ মিছের — রাজশাহীর ইতিহাস, কাজী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৬৫

কামরুদ্দীন আহমদ — পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি, স্টুডেণ্টস পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬

বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ঢাকা, ১৩৮২

খোন্দকার ফজলে রাব্বি — বাংলার মুসলমান (মুহম্মদ আবদুর রাজ্জাক অনূদিত) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

খোন্দকার রফিউদ্দীন — ভাব সঙ্গীত

গোপাল হালদার — বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২ খণ্ড, এ. মুখ্যার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা, ১৩৭২(২ সং)

সংস্কৃতির রূপান্তর, ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫

ত্রিপুরা শঙ্কর সেন — সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতনা, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৫৬

নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী — শ্রীহট্ট-প্রতিভা, ১৯৬১

পার্থ চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর — বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ (১৮১৮-১৮৭৮), সাক্ষরতা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭

বদরুদ্দীন উমর — পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৯

বিনয় ঘোষ — বাংলার বিদ্বৎ সমাজ, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), ৫ খণ্ড, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৮

বাঙ্গালীর নবজাগৃতি, ১ খণ্ড, ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৫৫

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪ খণ্ড, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৬

বিপিনচন্দ্র পাল — সত্তর বছর, কলিকাতা, ১৯৬২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাময়িকপত্র, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৯ (২ সং), ১৩৭৯ (৪ সং)
সাহিত্য সাধক চরিতমালা-২৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৫

মনিরুদ্দীন ইউসুফ — উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৮

মুনীর চৌধুরী — মীর মানস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

মুস্তাফা নুরউল ইসলাম, ডক্টর — সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৮৯ (৪ সং)

মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর — বঙ্গে সূফী প্রভাব, কলিকাতা, ১৯৩৫
মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৫ (২ সং)

মুহম্মদ এনামুল হক, ডক্টর ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত — আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন — বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২ খণ্ড, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৩৭১

মোতাহার হোসেন সুফী — সাহিত্যসেবী তসলিমুদ্দীন আহমদ, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭২

মোশফেকা মাহমুদ — পত্রে রোকেয়া পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৬৫

মোহাম্মদ আজিজুল হক — বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (ডক্টর মুস্তাফা নুরউল ইসলাম অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল — মীর মশাররফের গদ্যরচনা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫

মোহাম্মদ ইদরিস আলী — মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ঢাকা, ১৩৬৫

মোহাম্মদ সেরাজুল হক — সিরাজীচরিত, হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৯৩৫

যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য — বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬১ (২ সং)

যোগেশচন্দ্র বাগল	ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৬৩ (২ সং)
	বেথুন সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা ১৩৬৭
রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডক্টর	বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩ খণ্ড, জেনারেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৮
রেজাউল করিম	বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ, ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসি-য়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, কলিকাতা, ১৩৬১ (২ সং)
শামসুন নাহার	রোকেয়া জীবনী, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫৮
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন	মেহের চরিত, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৫
শেখ হাবিবর রহমান	কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা, মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪
সতীশচন্দ্র মিত্র	যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫ (২ সং)
সুধীরকুমার মিত্র	হুগলী জেলার ইতিহাস, মিত্রাণী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৬২
সৈয়দ মর্তুজা আলী	মুজতবা-কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, এ.বি. বুক স্টোর্স, ঢাকা, ১৯৭৬
হুমায়ুন আবদুল হাই	মুসলিম সংস্কারক ও সাধক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬
A.F. SalahuddinAhmed	**Social Ideas and Social Change in Bengal** (1818-1835), Calcutta, 1976 (2nd edt).
Abdul Karim, B.A.	**Muhammedan Education in Bengal.** Metcalfe Press, Calcutta, 1900.
Abdus Salam	**Riyarus Salatin, or A History of Bengal** by Ghulam Husain Salim, Asiatic Society, Calcutta, 1904.

Abdul Khair Nazmul Karim — **The Modern Muslim Political Elite in Bengal** (unpublished Doctoral Thesis), University of London, 1964.

Anil Seal — **The Emergence of Indian Nationalism,** Cambridge, 1971.

Aparna Basu — **The Growth of Education and Political Development in India** (১৮৯৮-1920), Oxford University Press, Delhi, 1974.

Arther Mayhew — **The Education of India,** London, 1921.

Azizur Rahman Mallick — **British Policy and the Muslims in Bengal** (1757-1856), Dacca, 1961.

Bipin Chandra Pal — **Memories of My Life and Times** (1857-1884), Calcutta, 1932.

B.B. Misra, Doctor — **The Indian Middle Classes their in Modern Times,** Oxford University Press, London, 1961.

Bimanbehari Majumdar — **Indian Political Associations and Reform of Legislature** (1818-1917), Firma, K.L. Mukhopadhyaya, Calcutta, 1956.

C.E. Buckland — **Bengal Under the Lieutenant Governors** (1854-98), Vol. I, S.K. Lahiri and Co., Culcutta, 1901.

Dictionary of Indian Biography, London, 1906.

Colesworthy Grant — **Rural Life in Bengal,** London, 1860.

F.B. Bradley-Birt — **Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century,** Calcutta, 1910.

H.J.S. Cotton — **India in Transition,** London, 1885.

H.Sharp (ed) — **Selection from Educational Report,** Part I, 1771-1839, Calcutta, 1920.

Hellingbery — **The Bengal Administration Report of 1872-73.** Vol. I.

Henry Bereridge — **The District of Bakerganj—its History and Statistics,** Calcutta, 1876.

Herbert Alick Stark — **Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912.** The Calcutta General Publishing Co., Calcutta, 1916.

Hossainur Rahman, Doctor — **Hindu-Muslim Relations in Bengal,** (1905-1947), Nachiketa Publishing Limited, Bombay, 1974.

J.D. Cunningham — **A History of the Sikhs,** 1903.

Jagadish Narayan Sarkar, Doctor — **Islam in Bengal** (Thirteenth to Nineteenth Century), Ratna Prakashan, Calcutta, 1972.

James Long, Rev. — **An Introduction to the Sociology of Islam,** 1931-33.
Five hundred questions on the Social Condition of the Natives, London, 1865.

James Wise — **Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal,** London, 1883.

Jogendra Chandra Bagal — **History of the Indian Association** (1874-1951), Calcutta, 1953.

K.K. Aziz — **Amir Ali : His Life and Work,** Karachi, 1963.

K. Zacharia (ed) — **History of Hooghly College,** Bengal Government Press, Calcutta, 1936.

Kamruddin Ahmed — **A Political History of Bengal,** Dacca, 1975 (4th Edn.)

Khandker Fuzli Rubbee — **The Origin of the Muslmans of Bengal,** Translation of Haqiqate Musalman-i-Bangalah, Calcutta Thacker, Spink and Co., Calcutta, 1895.

L.F. Rushbrook William — **Great Men of India,** the Home Library Club (Year not mentioned).

Leonard A. Gordon — **Bengal : The Nationalist Movement** (1871-1940). Manohar Book Service, Delhi, 1974.

Lokenath Ghosh — **The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zaminders etc.,** Part II, Calcutta, 1879.

M. Fazlur Rahman — **The Bengali Muslims and English Education** (1765-1835), Bengali Academy, Dacca, 1973.

M.K.A. Siddiqui — **Muslims of Calcutta,** Calcutta, 1974.

N.T. Titus — **Islam in India and Pakistan,** London, 1930.

Mehdi Husain, Doctor (ed) — **The Rehla of the Ibn Battuta.** Oriental Institute, Baroda, 1953.

Muhammad Abdur Rahim, Doctor — **Social and Cultural History of Bengal,** Vol. I, (1200-1576) : Vol. II, (1576-1757), Karachi, 1961.

Muhammad Ali Azam — **Life of Moulvi Abdul Karim,** Calcutta, 1939.

Muhammad Azizul Haq — **History and Politics of Moslem Education in Bengal,** Calcutta, 1917.

Muhammad Mohar Ali, Doctor — **The Bengal Reaction to Christian Missionary Activities** (1833-1857). The Mehrub Publications, Dacca, 1965.

Muinuddin Ahmed Khan — **History of the Faraidi Movement,** 1963.

Mustafa Nurul Islam, Doctor — **Bengali Muslim Public Opinion As Reflected in the Bengali Press,** (1901-1930), Bangla Academy, Dacca, 1973.

N.K. Sinha — **History of Bengal** (1757-1905).

Nirmal Sinha — **Freedom Movement in Bengal** (1818-1905).

Peter Hardy — **Moslems of British India,** London, 1973.

Ram Gopal — **Indian Muslims, A Political History** (1858-1947). Asia Publishing House, Calcutta, 1964 (Reprinted).

S.M. Jamil — **The Muslim Year Book of India and Who's Who** (1948-49), Bombay, 1948.

W. Adam — **Third Report on the State of Education in Bengal,** 1838.

Shila Sen — **Muslim Politics in Bengal** (1937-1947), New Delhi, 1976.

Sukumar Sen Doctor (ed) — **Seka Subhodaya,** The Asiatic Society, Calcutta, 1963.

Sufia Ahmed, Doctor — **Muslim Community in Bengal** (1884-1912), Oxford University Press, Bangladesh, Dacca, 1974.

Syed Ameer Ali — **Muhammadan Education and Muhammadan Society,** (Presidential address delivered at the Muhammadan Educational Conference of 1899), Calcutta, 1900.

Syed Ameer Hossain — **A Pamphlet on Mohammedan Education in Bengal.** Bose Press, Calcutta, 1880.

Syed Mahmood — **History of English Education in India** (1781-1893), Aligarh, 1895.

Syed Murtaza Ali — **Personal Profiles,** National Institute of Public Administration, Dacca, 1965.

Syed Nawab Ali Chowdhury — **Vernacular Education in Bengal,** Calcutta 1900.

Syed Sajjad Hussain(ed) — **Pakistan : An Anthology,** The Society for Pakistan Studies, Dacca, 1964.

Thomas M. Arnold — **The Preaching of Islam,** Lahore, 1956.

Wilfred Scawen Blunt — **India Under Ripon—A Private Diary, London,** 1909.

W.W. Hunter — **Report of the Indian Education Commission,** 1883.

The Indian Mussalmans, London, 1871.

Yusuf Hussain (ed) — **Selected Documents from the Aligarh Archives,** Asia Publishing House, Calcutta, 1967.

বিনয় সরকারের বৈঠকে, ১ ভাগ, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৪৪ (২ সং)

মওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতিবার্ষিকী, ঢাকা, ১৯৬৬

মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র, পাকিস্তান পাবলিকেশনাস, ঢাকা, ১৯৬৬

শত বার্ষিকী স্মরণিকা, কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কুমিল্লা, ১৯৭৫

Consolidated Alphabetical Index to the Proceedings of the Government of Bengal, Political Department (1859-1908), Calcutta.

General Report of Public Instruction in Bengal, 1872-73.

Imperial Gazetteer of India, Provincial Series (Eastern Bengal and Assam), Calcutta, 1909.

List of Associations recognized by Government (corrected upto lst April, 1923). Government of Bengal, Political Department, September. 1923, Proceedings Nos. 143-158B.

Nowab Bahadur Abdul Latif C.I.E., Published by Thacker, Spink and Co., Calcutta.

New Calcutta Directory, 1856.

Proceedings of Asiatic Society of Bengal, 1892-93 to 1896-97.

Report of the Moslem Institute, Calcutta, 1922-23.

Report on the Sensus of Bengal, 1872 (General Statement I.B) Calcutta, 1872.

Report of the Sensus of Bengal. 1818, Calcutta, 1883.

Report of the Sensus of India, 1891. Vol. V. (Lower Provinces of Bengal and their Feudatories), Calcutta, 1893.

Struggle for Independence 1857-1947, Pakistan Publications, Karachi, 1958.

Supplementary Note on Mohammedan Education (Director of Public Instruction, 1883-84.

The Calendar for the year 1929, Part II, Vol I, Calcutta University, Calcutta, 1932.

The Proceedings of the Government of India in the Home Department (Education), No. 300, dated Simla the 7th August, 1871.

অভিধান, বিশ্বকোষ, গ্রন্থপঞ্জী ও অন্যান্য

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত	বিশ্বকোষ, ১৪শ ভাগ, কলিকাতা
পূর্ণেন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত	ভারতকোষ, ১-৫ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা
সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত	জীবনী অভিধান, কলিকাতা ১৩৭৩
১৯/খ-২	
সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত	সরল বাঙ্গালা অভিধান, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ, কলিকাতা, ১৯৭১ (৮ সং)।
যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও	১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা, সমসাময়িক

রাখাল রাজ রায় — ভারত কার্যালয়, বাঁকীপুর (বিহার), ১৩২৩
আলী আহমদ সংকলিত — গ্রন্থপঞ্জী (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)

C.E. Buckland — **Dictionary of Indian Biography,** Swan Comenschein and Co., Limited, London, 1909.

Edwin R.A. Seligman (ed.) — **Encyclopeadia of Social Sciences.** Vol 9, The Macmillan Company, New York,1950 (Reprinted).

F. Steingass (ed.) — **Persian-English Dictionary,** London, 1957 (4th Edn.)

J.C. Dasgupta — **National Biography of India,** Dacca.

Jagadish Saran Sharma — **The National Biographical, Dictionary of India,** Sterling Publications (P) Ltd., New Delhi, 1972.

James Long, Rev. — **Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets,** forwarded by the Government of India to **the** Paris University Exhibition of 1867.

S.P. Sen (ed.) — **Dictionary of National Biography,** Vol. I, Institute of Historical Studies, Calcutta, 1972.

Author Catalogue of Printed Books in Bengali Language. Vol I-IV, Nanational Library, Calcutta.

Bengal Library Catalogue. 1873-1905.

British Museum Library Catalogue, Vols. I and II.

Encyclopeadia Britannics, Vol. XXIII

Encyclopeadia of Islam, London, 1961.

Thacker's India Directory, 1900.

Who's Who of India, Newul Kishore Press, Lucknow, 1911.

প্রবন্ধাবলী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — মুসলমান শিক্ষা-সমিতি, সাহিত্য, চৈত্র ১৩১০

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — কবি কায়কোবাদ, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৭০ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, ১৩৭০

আনিসুজ্জামান, ডক্টর — মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'এর উপায় কি?' পাণ্ডুলিপি, চট্টগ্রাম, ১২৮০

আফতাবউদ্দীন অহমদ	বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা, ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ১৩১১
আবদুল করিম	বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
	যোগ কালন্দর, ইসলাম-প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩
আবদুল কাদির	নওশের আলী খাঁ ইউসফজয়ী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭
	বিষাঙ্কুর কাব্য, লেখক সংঘ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
	মতীয়ুর রহমান খানের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪
	মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ২৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩২৩
আবদুল লতিফ চৌধুরী	বাঙ্গালা মৌলুদ, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৬৭
আহমদ শরীফ, ডক্টর	বাঙ্গালায় সুফী প্রভাব, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬
ইব্রাহিম খাঁ	টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
	নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৬
এ. এম. তোরাব আলী	আশরাফ-আতরাফ, সওগাত, শ্রাবণ ১৩৩৫
এবনে মাঅীজ	মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস, ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮
	আমাদের কি করা উচিত, ইসলাম-প্রচারক, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩০৯
কাজী ইমদাদুল হক	আমাদের শিক্ষা, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯
খোন্দকার রেয়াজুল হক	লালনশাহী ভাবসঙ্গীতে বাংলাদেশের সমাজচিত্র, পূর্বাচল, কার্তিক ১৩৮৩

গোলাম সাকলায়েন	কবি দাদ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
	মোহাম্মদ নজিবর রহমান, ঐ, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজমত, বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ বর্ষ, ১৯৭৫
তাজুল ইসলাম হাসমী	কারামত আলী ও তারিকায়ে মুহাম্মদিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৬
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	দুই খানি নতুন পুস্তক, নবনূর, মাঘ ১৩১১
দেওয়ান আবদুল হামিদ	কবি সৈয়দ এমদাদ আলী, লেখক সংঘ পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	মানবতাবাদী কাজী আবদুল ওদুদ, পূর্বাচল, কার্তিক ১৩৮৩
ব্যোমকেশ মুস্তোফী	গত বর্ষের বাঙ্গালা সাহিত্য, সাহিত্য, ভাদ্র ১৩১০
মন্মথনাথ ঘোষ	মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর সি. আই. ই. মালঞ্চ, আশ্বিন ১৩২৪
মির্জা আবুল ফজল	প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, নবনূর, শ্রাবণ ১৩১০
মীর মশাররফ হোসেন	সৎ প্রসঙ্গ, কোহিনুর, ভাদ্র ১৩০৫
মীর্জা এম. এ. আজীজ	সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন, মাসিক মোহাম্মদী, চৈত্র ১৩৪০
মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	ভাষা সম্বন্ধে নূর-অল-ইমানের কৈফিয়ৎ, নূর-অল-ইমান, শ্রাবণ ১৩০৭
মুনতাসীর মামুন	বিবাহ-সম্মতি আইন ও পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৬
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	মুনশী জমিরুদ্দীন, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

মুহম্মদ আবু তালিব	মির্জা ইউসুফ আলী, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ, পাকিস্তানী খবর, ২৭ জুলাই ১৯৬৩
মোজাফফর আহমদ	উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মোসলমান, আল-এসলাম, শ্রাবণ ১৩২৪
মোসারত আলী খান	বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা, মিহির ও সুধাকর, ১ শ্রাবণ ১৩১০
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম	ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, মাহে-নও, বৈশাখ ১৩৭৪
মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	জেলার কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি, নকীব, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৫, কুমিল্লা
মোহাম্মদ কে চাঁদ	মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষায় অবনতির কারণ, ইসলাম-প্রচারক, ফাল্গুন ১৩১৩
	তালাক বা মোসলেম স্ত্রীবর্জন, ইসলাম-প্রচারক, ৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা ১৩১৪
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামবাদী	ইসলাম ও মিশন, ইসলাম-প্রচারক, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০
	বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাসমিতি, মিহির ও সুধাকর, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯
	আরবী বিশ্ববিদ্যালয়, আল-এসলাম, আষাঢ় ১৩২৭
	মুসলমান আমলে হিন্দুর অধিকার, আল-এসলাম, আশ্বিন ১৩২২
মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী	বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি, ইসলাম-প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	আমাদের দরিদ্রতা, আল-এসলাম, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস, ভারতী, শ্রাবণ ১৩০৫
হিন্দু ও মুসলমান, সাধনা, চৈত্র ১৩০১

শেখ আবদুর রহিম — বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ, মাসিক মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৩৬

শেখ ফজলল করিম — উন্নতির উপায় কি? ইসলাম-প্রচারক, ১৩১০
ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার, কোহিনুর, আষাঢ় ১৩১২

সুরেশচন্দ্র মৈত্র — উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান রাজনীতি, অনুশীলন, আশ্বিন ১৩৭২

সৈয়দ এমদাদ আলী — খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক, সওগাত, ভাদ্র ১৩৩৩
মাতৃভাষা এ বঙ্গীয় মুসলমান, নবনূর, পৌষ ১৩১০
বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব, ইসলাম-প্রচারক, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৯-১০
মোজাম্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন, মাসিক মোহাম্মদী চৈত্র ১৩৪০

সৈয়দ মর্তুজা আলী — উত্তর বঙ্গের সাহিত্যিক, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
কোহিনুর, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭
শ্রীহট্টের ইতিহাস, বাংলা একাডেমী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮
হজরত শাহ জালালের লেখকগণ, মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৪৮

হামেদ আলী — উত্তর বঙ্গের মুসলমান সহিত্য, বাসনা, বৈশাখ, ১৩১৬

এডুকেশন গেজেট, ২০ পৌষ ১৩০৭, ১০ শ্রাবণ ১২৮০

বান্ধব, আশ্বিন ১০৮২, অগ্রহায়ণ ১২৮৯

বাসনা, বৈশাখ ১৩১৮

Jafar-ul-Islam, Doctor — The Aligarh Political Activities, **The Journal of the Pakistan Historical Society**, Vol. XII, Part I, January, 1964.

James Wise — The Muhammedan in Eastern Bengal, **Journal of Asiatic Society of Bengal**, Vol. LXIII, No. I, 1894.

Obaidullah Al Obaidi — Muhammedan Education, **The Bengal Magazine**, February 1873

Eastern Bengal and Assam Gazettee, 10 March 1905 (Supplement).

Notes on Early Commerce in Bengal, **Calcutta Review**, Vol. LXXII, 1881

পত্র-পত্রিকা

অনুসন্ধান, ১৫ বৈশাখ, ১৫ ফাল্গুন ১২৯৬

আখবারে এসলামিয়া, ১৩০২

ইসলাম-প্রচারক, ১২৯০, ১৩০৬-১৩১২

কোহিনুর, ১৩০৫ ১৩১২-১৩১৩

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

ঢাকা গেজেট, ১৮ চৈত্র ১৩০২

ঢাকা প্রকাশ, ১২ পৌষ ১২৭৬, ৫ মাঘ ১২৮৯, ২৭ পৌষ ১২৯২, আশ্বিন ১২৯৩, ১ আষাঢ় ১২৯৮, ১১ বৈশাখ ১৩০৬, ১৮ ভাদ্র ১৩০৬, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১২

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১২৯৬

দুরবীন (ফারসী), ১৮৫৫

ধূমকেতু, আষাঢ় ১৩১০, বৈশাখ ১৩১২

নবনূর, ১৩০৯-১৩১৩

নব্যভারত, চৈত্র ১৩০৮

নুর-অল-ইমান, ১৩০৭

প্রচারক, ১৩০৬-১৩০৮

প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮

প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৫

বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, পৌষ ১২৮০, শ্রাবণ ১২৮৫

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৬

বসুধা, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮

বসুমতী, ২৬ মাঘ ১৩০৬
বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
ভারতী, ফাল্গুন ১২৯৩, কার্তিক ১৩০৭, শ্রাবণ ১৩১০
ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৫, বৈশাখ ১২৯৮
ভিক্ষুক দর্পণ, ১৮৯৪
মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৩৪, চৈত্র ১৩৪০
মিহির, ১৮৯২
মিহির ও সুধাকর, ১৩০২-১৩০৯
সুধাকর, ১২৯৬, ১২৯৮-১৩০০
সুরভি, ১৫ ফল্গুন ১২৮৯
হাফেজ, ১৮৯৭
হিতকরী, ১২৯৭

The Culcutta Review, 1870.
The Journal of the Moslem Institute, 1906.
The Moslem Cronicle, 1895-1905.

নির্ঘণ্ট

ও

ক

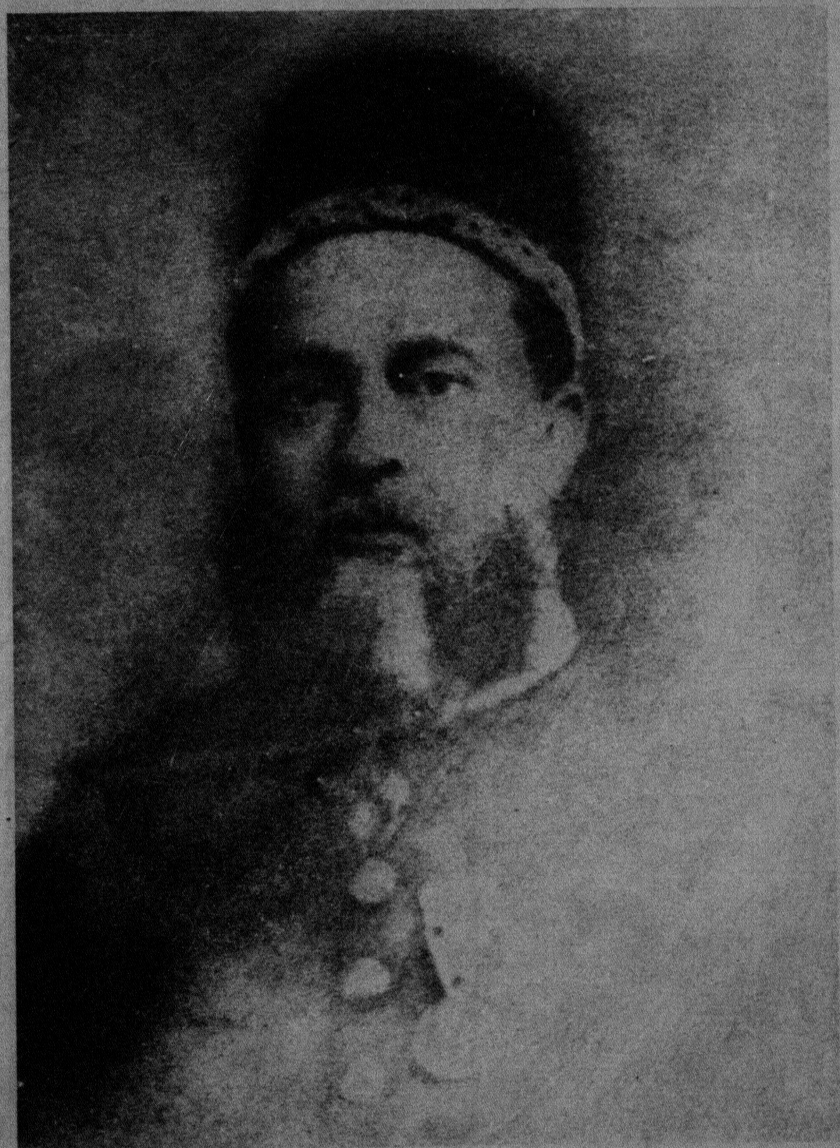
খ

গ

ফ

ভ

হ



সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)



আলী নওয়াব চৌধুরী



হাফিজ মাহমুদ আলী খান পন্নী





ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৬)



খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৮–১৯১৭)



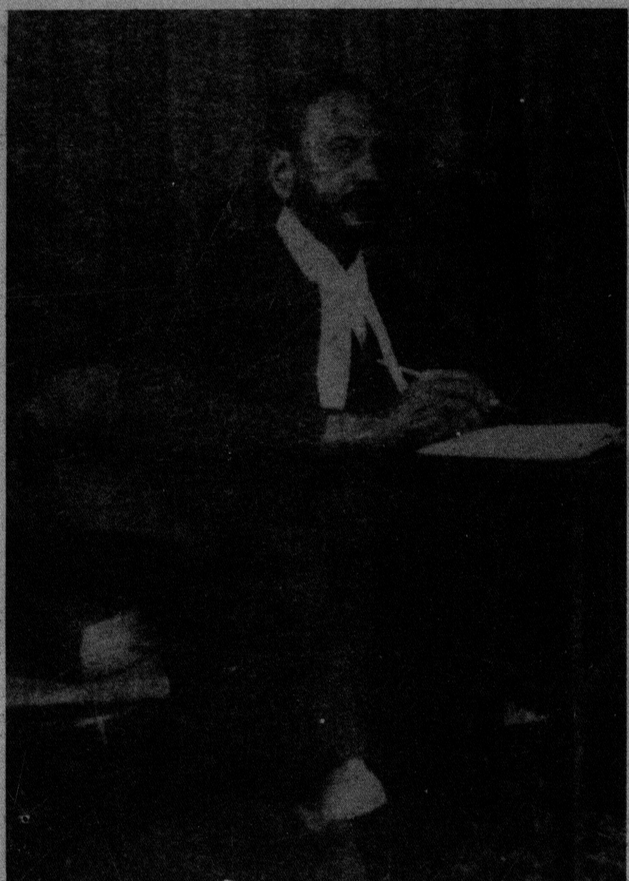
সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)



হেমায়েতউদ্দীন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১)



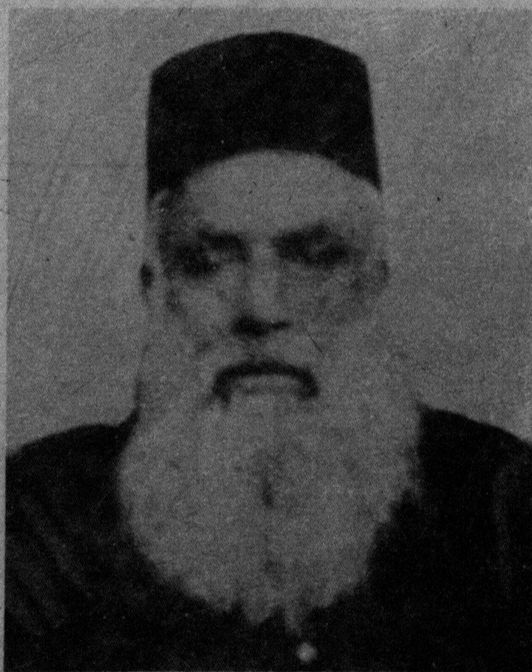
আবদুস সালাম (১৮৬১-১৯৪১)



সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪)



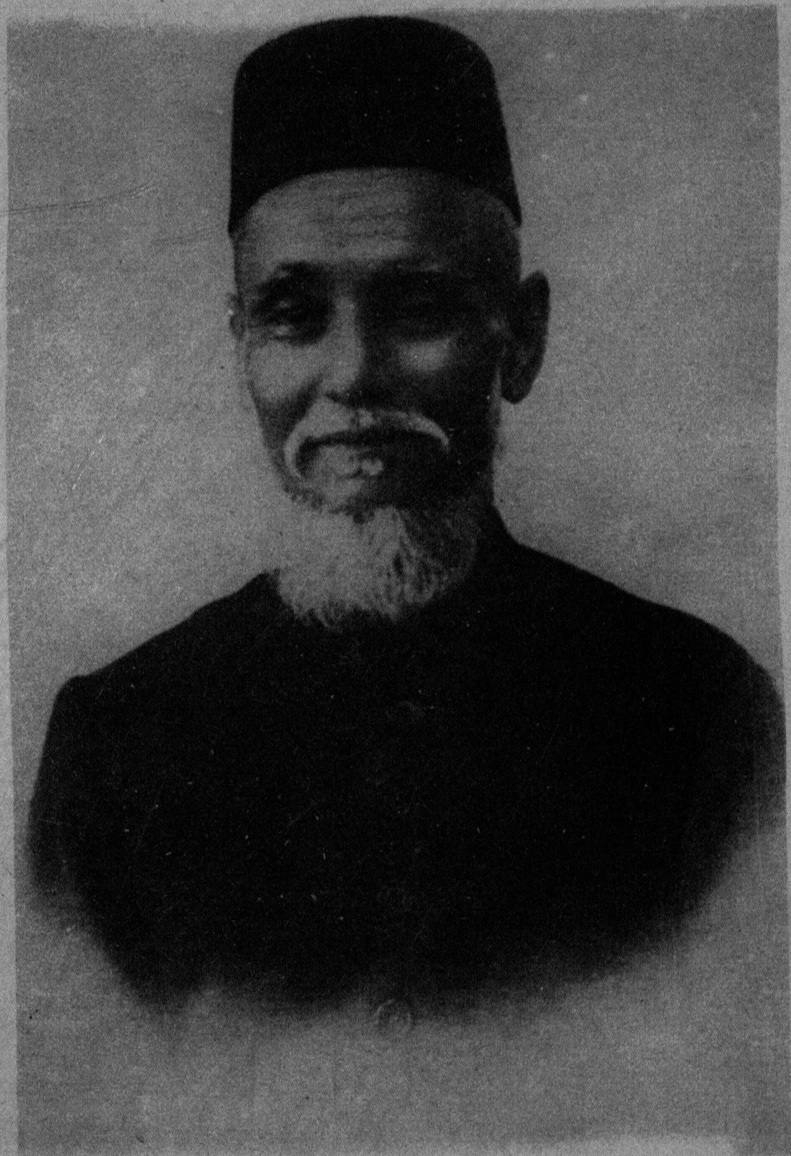
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)



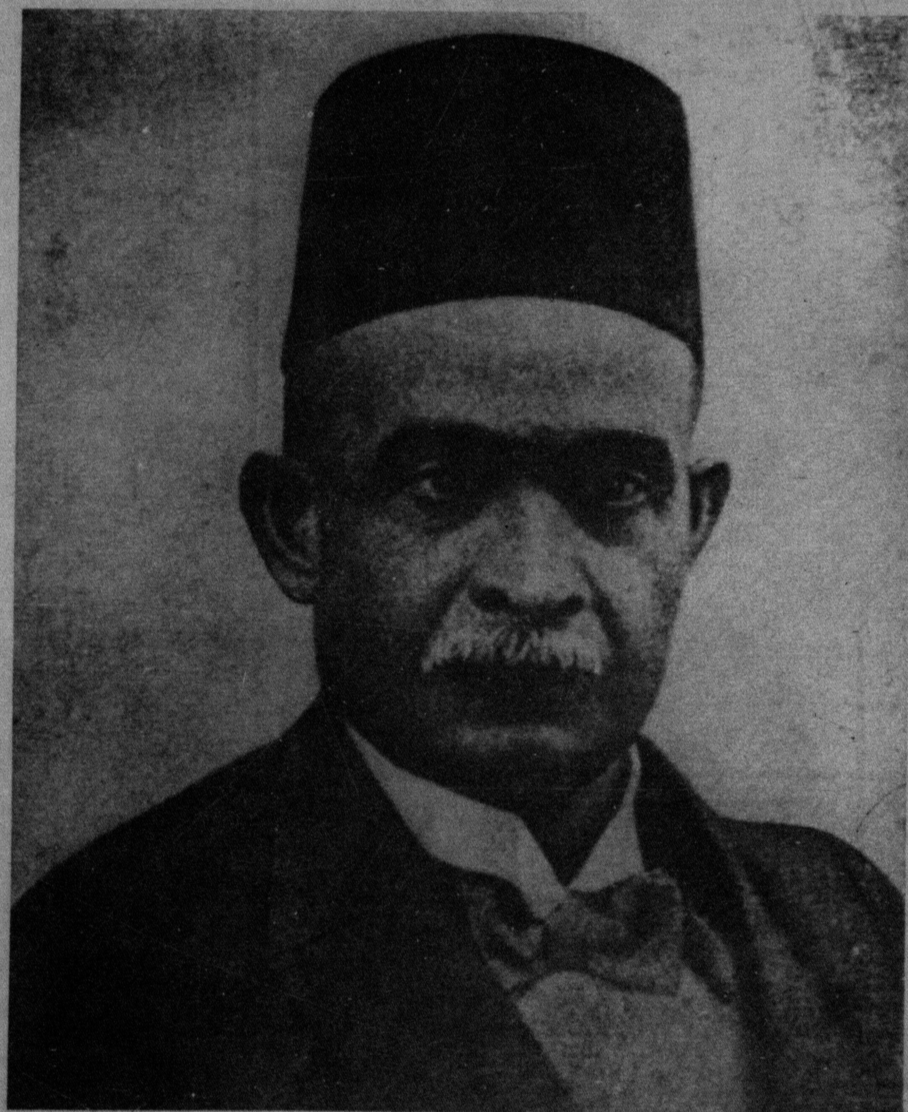
আবদুল আজিজ (১৮৬৩-১৯২৬)



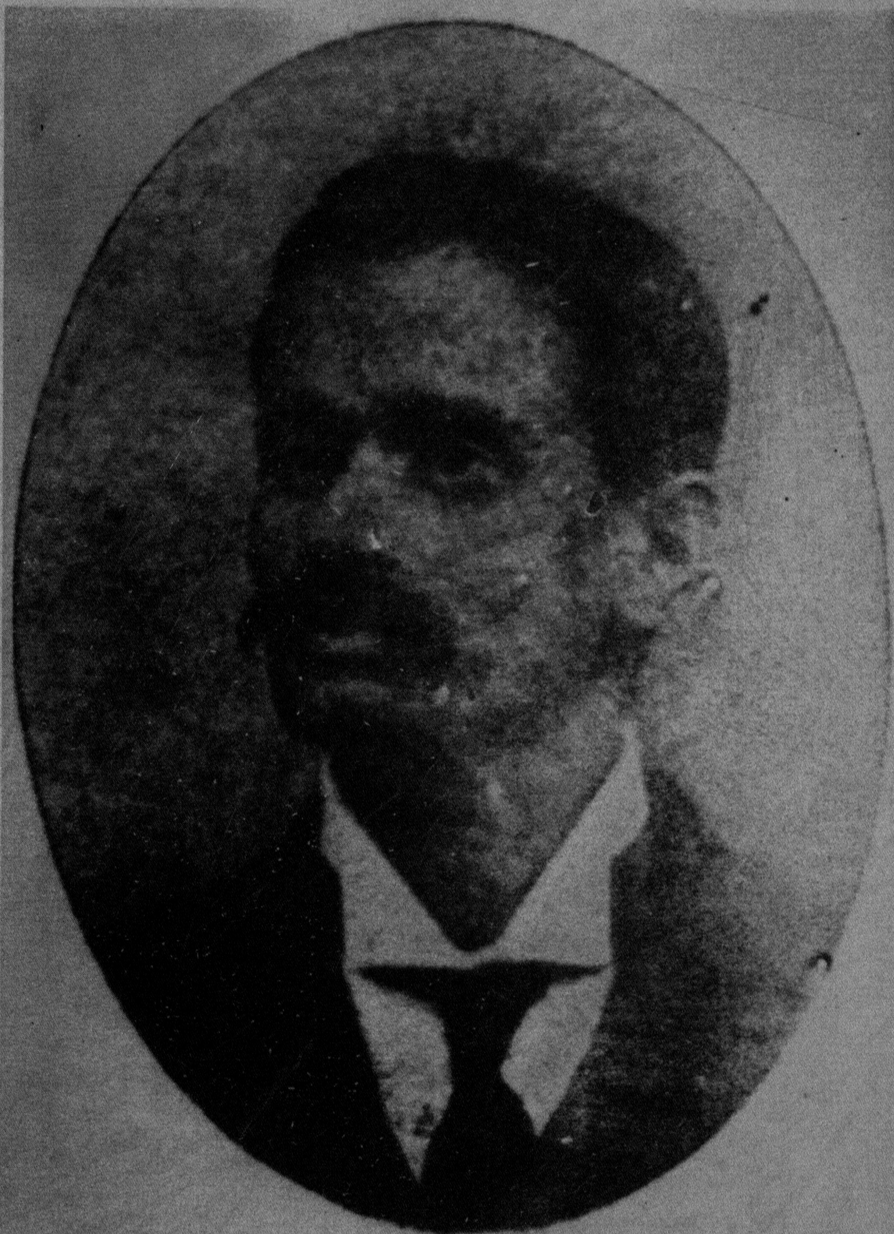
সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২)



আবদুল করিম বিএ (১৮৬৩-১৯৪৩)



আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২)

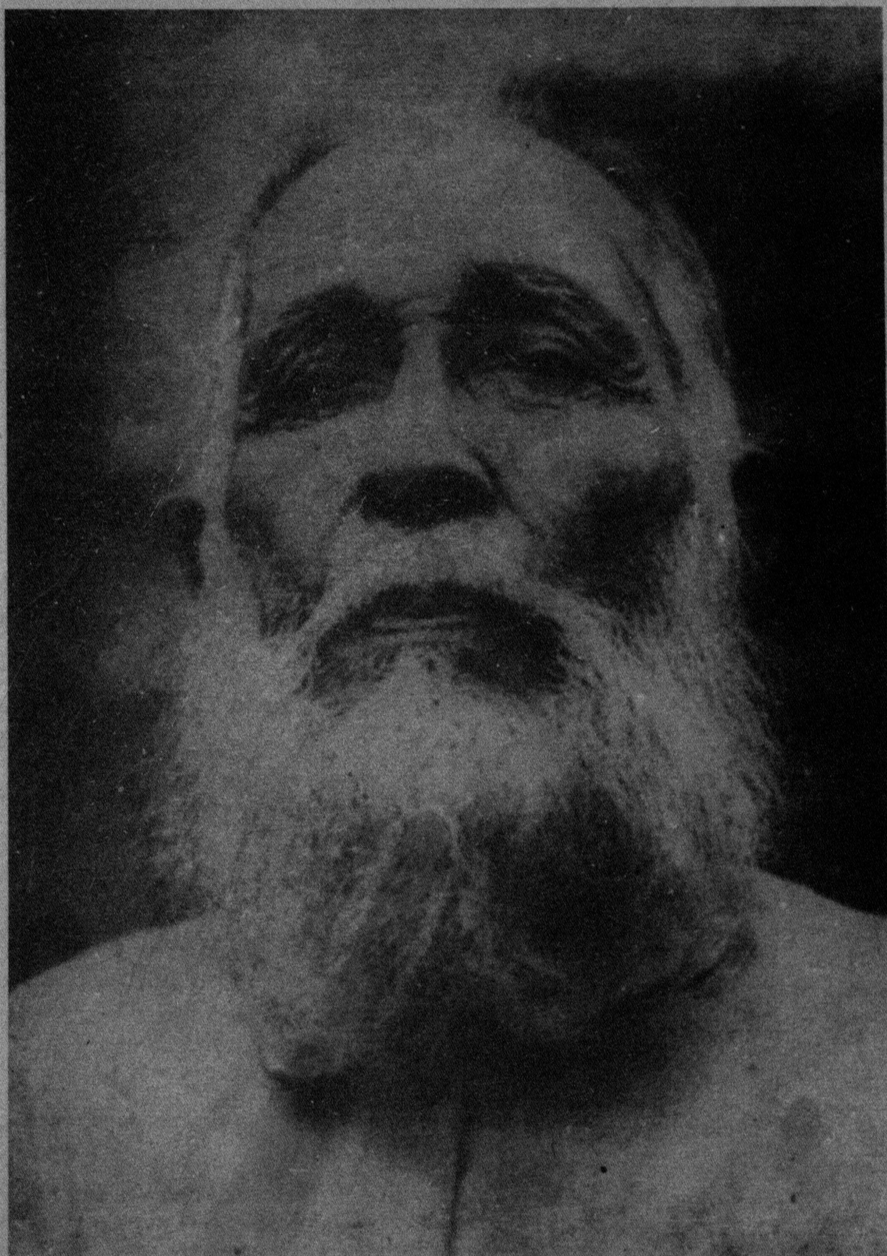


আবদুর রসুল (১৮৭৬-১৯১৭)

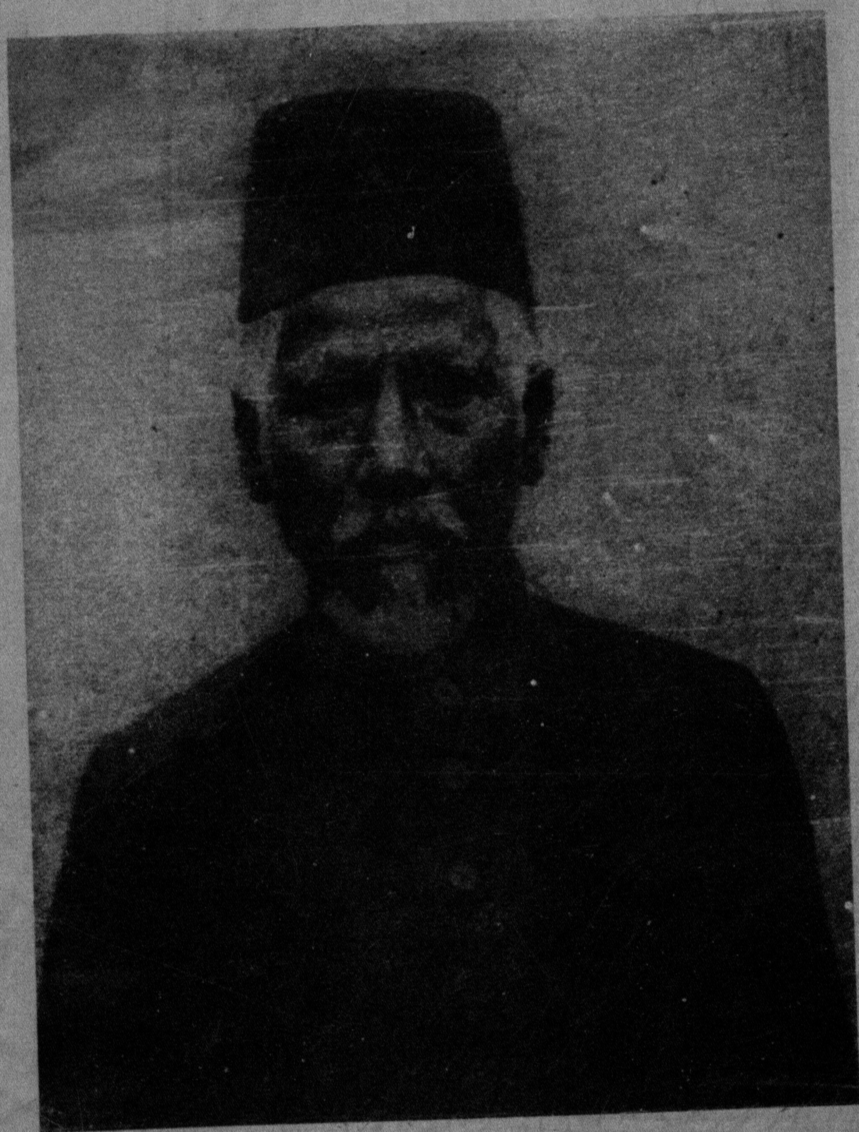


(ফটো—১০।৩।১৩১৫)

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)



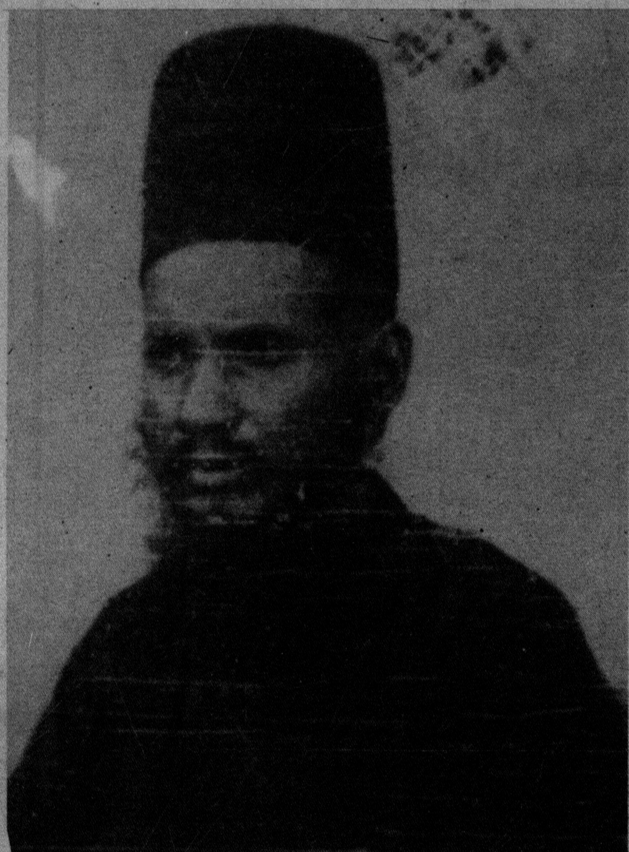
কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)



শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)

শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩)



শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০)



কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)

মোহিনী

প্রেম-পাশ নাটক।

শ্রীকাদের আলী র. স. কর্ত্তৃক
বিরচিত ও প্রকাশিত।

" মেরা দেল্ তুজকো দিয়া
তু লে কে বরবাদ কিয়া
তেরা দেল মুজকো দিয়া
মাই লেকে তাবিজ কিয়া।"

শ্রীনন্দলাল মণ্ডল কর্ত্তৃক গুপ্তপ্রেশে মুদ্রিত।
২২১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রিট ;—কলিকাতা।

১২৮৭ সাল।

মোহনী প্রেম-পাশ নাটক

প্রেম-হার।

শ্রীমোজাম্মেল হক্ কর্ত্তৃক
বিরচিত।

CALCUTTA:
PRINTED BY S C. CHAKRABURTY,
AT THE KALIKA PRESS.
17, Nunda Coomar Chaudhury's 2nd Lane,
AND
PUBLISHED BY M. R. ALI.

1898.

প্রেম-হার

আঁখি-জল।



প্রকাশক

শ্রীমৌলবী আবদুল গণি।

মাটিয়া বুরুজ।

কলিকাতা,

২৬ নং স্কটস্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০৬

আঁখি-জল

Registered under act XXV of 1867.

16.1.07

কাসেমবধ কাব্য।

বা

শাহাদতে ইমাম কাসেম। (আঃ)

37

নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক,

ভ্রাতৃবিলাপ কাব্য প্রভৃতি প্রণেতা,

আবুল্‌মাআলী মহাম্মদ হামিদ আলী-প্রণীত।

কলিকাতা—মেট্‌কাফ্‌ প্রেস্‌।

১৩১২।

কাসেমবধ কাব্য

THE ORIGIN

OF THE

MUSALMANS OF BENGAL:

BEING A TRANSLATION OF

"*HAQIQATE MUSALMAN-I-BENGALAH.*

BY

KHONDKAR FUZLI RUBBEE,

DEWAN TO H. H. THE NAWAB BAHADUR OF MURSHIDABAD, G.C.I.E.

Calcutta;

THACKER, SPINK AND CO.

1895.

The Origin of the Musalmans of Bengal

VERNACULAR EDUCATION

IN

BENGAL

(Being a speech delivered at the Thirteenth Session of the Mahommedan Educational Conference)

BY

SYED NAWAB ALI CHOWDHRY,

Zemindar, Dhanbari, Mymensingh,

President of the Mahommedan Society for Vernacular Literature,

a Secretary to Sir Syed Ahmad Memorial Fund Committee.



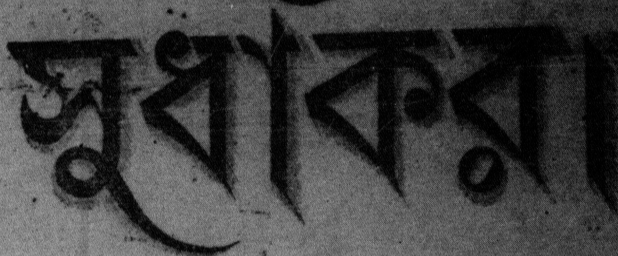
CALCUTTA:

PRINTED BY W. NEWMAN & CO., CAXTON PRESS,

1, MISSION ROW.

1900.

Vernacular Educatoin in Bengal



সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

১ম খণ্ড। ২৩শে কার্ত্তিক, শুক্রবার ১২৯৬ সাল। ১৩ই রবিঅল আওয়ল। ৮ই নবেম্বর, ১৮৮৯। ১ম সংখ্যা।

ফাতেহায়ে দোআজ দহোম্।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

[illegible] মহা-শয়গণ আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাম ক্রমশঃ সুধাকরে প্রকাশিত হইবে। এতন্মধ্যে মোমনাবাদাধিবাসী শ্রীশ্রীযুক্ত নওয়াব করেজন্নেছা চৌধুরাণী সাহেবা ২৫০, আড়াই শত টাকা, ময়মনসিংহের অন্তর্গত আটিয়ার জমিদার শ্রীলশ্রীযুক্ত হাফেজ মাহমুদ আলি খাঁন সাহেব ৫০০, পাঁচ শত টাকা, ত্রিপুরার প্রধান মুসলমান জমিদার আব্দুল কমর সৈয়দ গোলাম কাদের সাহেব ৫০, পঞ্চাশ টাকা, দান করিয়াছেন। ইঁহাদের নিকট আমরা চির জীবন কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ থাকিব। নওয়াব সাহেবা জমিদারের মনা ও আমাদিগকে বিশেষ আশান্বিত করিয়াছেন।

সৈয়দ সোমের পদ বৃদ্ধি—

সুধাকর

পাক্ষিক পত্রিকা।

১ম ভাগ।

বিজ্ঞাপন।

বিষাদ-সিন্ধু !!

তৃতীয় ভাগ।

(এজিদ বধ পর্ব্ব।)

হিতকরীর গ্রাহক হইয়া অগ্রিম মূল্য ২৲ দুই টাকা আমার নিকট পাঠাইলে বৎসর-কাল হিতকরী পাঠ করিবেন এবং বিনা মূল্যে "এজিদবধ" (প্রকাশ হওয়ার পর ১৫ দিন মধ্যে) প্রাপ্ত হইবেন। তাহার গ্রাহক পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিজ্ঞাপন আর পরিবর্ত্তন হইবে না।

সন ১২৯১ ৭ই শ্রাবণ পাজিকুণ্ড টাঙ্গাইল (ব্রহ্মমন্দির)	বিষাদ-সিন্ধু লিখক এবং হিতকরীর টাঙ্গাইলের এজেন্ট মীরমুশাররফ হোসেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

হিতকরী

১ম বর্ষ; ভাদ্র, ১২৯৮। ১ম সংখ্যা।



মুসলমানদিগের ধর্ম্ম ও সামাজিক বিষয়ক
মাসিক পত্রিকা।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
... ...	১
কিমিয়ায়ে সাআ।	৮
খড়পির সাহেবের জীবন চরিত	১৭
কোরাণ শরিফের বঙ্গানুবাদ	২১
হজরত আলি	২৩
নুরল ইমান জামায়াত	২৬
ধর্ম্ম সংবাদ	৩১

কড়েয়া—১নং গোরস্থান রোড্ হইতে ম্যানেজার কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

৪নং সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট—মিলন যন্ত্রে,
শ্রীসুনীন্দ্রমোহন বসু দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৮

মিহির ও সুধাকর